একালের প্রবন্ধ ও সমালোচনা-সাহিত্য

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৬০

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ
অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর
সুকুমার দে
বাসন্তী প্রেস
১৯/এ ঘোষ লেন
কলকাতা-৬

অধ্যাপিকা বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাভাজনাসু

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

কবিতা

শতাব্দী তোমার দস্তানা খোলো
অভিপ্রেত শব্দের নাম
উপত্যকায় রক্তবৃষ্টি
অন্তিম গোধূলি
মহাচীনের কবিতা (অনু.)
চীন ভিয়েতনাম ইন্দোনেশিয়া
ও অন্যান্য দেশের কবিতা (অনু.)

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা
প্রসঙ্গ : অলংকার
বাংলা কবিতার আধুনিকতা ও শব্দানুষঙ্গ
আধুনিক বাংলা কবিতা (পাঠ / প্রসঙ্গ/প্রকরণ)
একালের বাংলা কবিতা : নিবিড় পাঠ
নজরুল ইসলাম : কবিমানস ও কবিতা
ইন্দোনেশিয়ার শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্য

সম্পাদিত

শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নরনারায়ণ'
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার পতন'
শাক্ত পদাবলী
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : জীবন ও সাহিত্য
বিষ্ণু দে : জীবন ও সাহিত্য

প্রস্তাবনা

শুচনাতেই বলে নেওয়া ভালো যে 'একালের প্রবন্ধ ও সমালোচনা-সাহিত্য' গ্রন্থটি কোনো মৌলিক গ্রন্থ নয়। সাম্মানিক বাংলা পাঠক্রমের জন্য নির্দিষ্ট প্রবন্ধ ও সমালোচনার ভাষ্যরচনা। তবুও গ্রন্থটির প্রয়োজন ছিল। কেন না, কোনো বিষয় পড়তে গেলে তার স্বরূপ নির্ণয় করা প্রয়োজন। প্রবন্ধ আর সমালোচনার মধ্যে পার্থক্যটা জানা দরকার। এক অর্থে প্রবন্ধ আর সমালোচনা একই গোত্রীয়; কিন্তু বোধের অর্থে পার্থক্য থেকে যাবেই। কেননা প্রবন্ধ মাত্রই সমালোচনা নয়-এ বিষয়ে কারোর সন্দেহ না থাকাই উচিত। এ সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্যাদির জন্য গ্রন্থটিকে কয়েকটি ভাগে বিন্যস্ত করে প্রবন্ধ সাহিত্য পরিচিতি ও সমালোচনা সাহিত্য পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। প্রাবন্ধিক-লেখকগণ সকলেই আধুনিক বলে তাঁদের প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী অংশে প্রতিটি প্রবন্ধের উৎস-কাল নির্ণয় করা হয়েছে এবং প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু প্রদানের পর প্রত্যেকটি প্রবন্ধের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মৌলিকত্বের দাবী আলোচক নিশ্চয়ই করছেন না, তবুও বলা যায় যে, বাংলা প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যে এমন বস্তু ও ভাবধর্মী বিশ্লেষণ করা হয়েছে কিনা তা সংশয়ের। প্রত্যেকটি প্রবন্ধের পৃথকভাবে বিশ্লেষণকালে প্রবন্ধগুলির অপূর্ণতা, সংযোজিত তথ্যের ত্রুটি ইত্যাদি দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় তত্ত্ব-তথ্য সংযোজনের চেষ্টাও করা হয়েছে। অবশ্য এ ব্যাপারে অপূর্ণতা থাকতেও পারে। প্রবন্ধ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমার মতামতের সঙ্গে অন্যের মতামতগত পার্থক্য থাকতে পারে। তার জন্য কিন্তু প্রবন্ধ পাঠের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হবে না; এখানে কোনো আলোচনাকেই উপর উপর ছুঁয়ে দেখা হয় নি—ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করা হয়েছে; প্রবন্ধের আলোকে লেখকের মনোজগতকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। একে প্রবন্ধের নিবিড় পাঠ বললে অসুবিধে কোথায়!

'একালের প্রবন্ধ ও সমালোচনা-সাহিত্য' সমকালীন প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যের নিবিড় পাঠমূলক বা অন্তরঙ্গ পাঠমূলক গ্রন্থ। এরকম একটি গ্রন্থ প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা অনেকদিনের 'পুস্তক বিপণি'র কর্ণধার শ্রীঅরুণকুমার মাহিন্দারের। তার চেষ্টা আর অধ্যবসায়েই এ গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হলো। তাকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। আমার ছাত্র শ্রীনিমাই পোড়েল প্রেসে কপি নিয়ে যাওয়া-আসার ব্যাপারে অপরিসীম কষ্ট সহ্য করেছে। তাকে আমার আশীর্বাদ জানাই। সহকর্মী অধ্যাপক ডঃ বিশ্বনাথ রায়, ডঃ বীরেন্দ্র দত্তর নিরন্তর জিজ্ঞাসা গ্রন্থের প্রকাশকে ত্বরান্বিত করেছে। তাঁদের দুজনের প্রতি রইলো আমার অকৃত্রিম শুভেচ্ছা। আমার পূজনীয় অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বেশ কয়েকটি বই আমার ব্যবহারের জন্য

দিয়েছেন। তাঁকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই। নরসিংহ দত্ত কলেজের উপাধ্যক্ষ শ্রীমুকুল চক্রবর্তী ও নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক দীপক মুখোপাধ্যায় নৃবিজ্ঞার সম্পর্কে আমাকে আলোকিত করেছেন এবং নৃবিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থাদি দিয়ে আমায় সাহায্য করেছেন। তাঁদের জানাই আমার ধন্যবাদ। আমার কন্যা নবনীতা প্রেসকপি তৈরির ব্যাপারে ও প্রুফ সংশোধনে সীমাহীন সাহায্য করেছে। তাকে আমার আশীর্বাদ, সহধর্মিনী শ্রীমতী শোভনার সক্রিয়তা আমাকে উদ্যমী করেছে। কন্যা নিবেদিতার সাহায্যও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আমার অনেক রচনায় প্রেরণা দিয়েছেন যিনি এবং যিনি আমার একান্ত গুণগ্রাহিণী সেই বিনীতাদিকে গ্রন্থটি উৎসর্গ করতে পেরে আমি ধন্য।

বহু চেষ্টা সত্বেও মুদ্রণ-প্রমাদের জন্য দুঃখিত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই। গ্রন্থটি সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য মুদ্রণ ও বাঁধাই কর্মীবৃন্দকে ধন্যবাদ। ছাত্রছাত্রী ও প্রবন্ধপাঠে আগ্রহী পাঠকদের ভালোলাগাতেই গ্রন্থটির সার্থকতা নিহিত।

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

বিষয়সূচী

1. 'Literature is a record of best thoughts'—Emerson.

2. 'Critics are sentinels in the grand army of letters, stationed at the corners of newspapers and reviews to challange every new author'—H. W. Longfellow.

3. 'The function of the aesthetic critic is to distinguish, to analyse. and seperate from its adjuncts the virtue by which a picture, a landscape, a fair personality in life or in a book produces their special impression of beauty, or pleasure, to indicate what the source of that impression is and under what condition it is experienced.'—Walter Pater.

4. The ultimate aim of criticism is much more to establish the principles of writing than to furnish rules how to pass judgement on what has been written by other; if indeed, it were possible that the two could be seperated'.—S. T. Colridge.

5. Criticism, carried to height worthy of it, is a majestic office, perhaps an art perhaps even a church'.—Walt Whitman.

১. (ক) প্রবন্ধ-সাহিত্য পরিচিতি ঃ

বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ শব্দটি ইংরেজি Essay শব্দের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হলেও, প্রবন্ধ শব্দটি Essay শব্দের সমার্থবাচক নয়। প্রবন্ধ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত [প্র+√ বন্ধ্ +অ ঘঞ্ —ভা] অর্থ হলো প্রকৃষ্ট বন্ধন, সম্বন্ধ, সংযোগ। সুতরাং প্রকৃষ্ট বন্ধনযুক্ত রচনাকেই প্রবন্ধ বলা উচিত। প্রবন্ধ নামে বর্তমানে যা প্রচলিত তা আধুনিক সাহিত্যের দান এবং ইংরেজি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে সৃষ্ট। অবশ্য এ কথা সত্য যে, প্রবন্ধ শব্দটি অত্যন্ত প্রাচীন এবং প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবন্ধ শব্দের বহুল ও ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। 'সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবন্ধ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বন্ধনযুক্ত রচনার পশ্চাতে বিবিধ অর্থ উপলক্ষিত হইয়াছে। ছন্দোগত বন্ধন, বিষয়বস্তুর সুষ্ঠু সম্বন্ধ-রূপ বন্ধন, সর্গ-পর্ব-অধ্যায়াদির বন্ধন, রচনাক্রমের ধারাবাহিক পারম্পর্য-রূপ বন্ধন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের বন্ধনসমন্বিত গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই সংস্কৃতে প্রবন্ধ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে।'[১] প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, চৈতন্য-মঙ্গলে, মনসামঙ্গলে, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন, কাশীদাসী মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থে প্রবন্ধ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্যগোচর। সংস্কৃত ও প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ শব্দটি ব্যবহারের দ্বারা সাহিত্যের কোনো বিশিষ্ট লক্ষণ প্রকাশের চেষ্টা করা হয় নি। বর্তমানে তথ্য যুক্তি ও সিদ্ধান্তের পরস্পর অন্বয়ের দ্বারা প্রকৃষ্ট রূপবদ্ধ লেখাকেই প্রবন্ধ বলা হয়েছে। 'কোন রচনার সকল অংশ ও উপাদান যখন কোনও একটা প্রকৃষ্ট বন্ধনের ভিতর দিয়া পরস্পর অন্বিত হইয়াছে এবং একটা সমগ্রতা লাভ করিয়াছে তখনই তাহা প্রবন্ধ আখ্যা লাভ করিয়াছে। * * * তথ্যের সহিত তথ্যের পরস্পর অন্বয় এবং পারম্পর্য, যুক্তির সহিত যুক্তির অন্বয় এবং পারম্পর্য—এবং তথ্য ও যুক্তির পরস্পর অন্বয়—এবং সকল জুড়িয়া শেষ পর্যন্ত একটি সুসঙ্গত সিদ্ধান্তে গমন—ইহাই প্রবন্ধের বিশিষ্ট লক্ষণ।'[২] প্রবন্ধ বলতে মননশীল গদ্য রচনাকেই বোঝানো হয়ে থাকে। ইংরেজি Essay শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রয়াস, মূলে এটি ফরাসী শব্দ। ষোড়শ শতকের শেষার্ধে ফরাসী লেখক মনতেইন (Michel de Montaigne, 1533-1592) আত্মভাবপ্রধান গদ্য রচনাকে Essaies নামে প্রকাশ করেন। 'ফরাসী essai শব্দটির মূলবোধ হয় assay অর্থাৎ ধাতু প্রভৃতির গুণাগুণ নির্ণয় করার ক্রিয়াকৌশল। এর আর একটা অর্থ চেষ্টা করা, এর থেকেই Essay শব্দের

---

১. আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা। (ভূমিকা) ঃ অধীরকুমার দে।

২. বাঙলা সাহিত্যের একদিক ঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

উৎপত্তি।'[৩] ইংরেজিতে Essay শব্দটিকে Formal ও Informal—দু' ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। বাংলায় এদের বিষয়নিষ্ঠ ও আত্মভাবনিষ্ঠ রচনা বলা যেতে পারে। কিন্তু বাংলায় প্রবন্ধ ও রচনাসাহিত্য সম্পূর্ণ ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়। আত্মভাবনিষ্ঠ কল্পনা প্রধান ও অভিজ্ঞতা প্রধান রচনাকে ইংরেজিতে যেমন Essay বলা হয় তেমনি আবার যুক্তিতত্ত্ব সমন্বিত বিষয়নির্ভর সংহত রচনাকেও Essay বলা হয়। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে Essay শব্দটির সঙ্গে Treatise ও Discaurse শব্দেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

Essay, Treatise এবং Discourse বলতে কী বোঝানো হয় এবং তাদের মধ্যে পার্থক্যই বা কোথায় তা নিম্নোক্ত সংজ্ঞা থেকে বোঝা যাবে।

১. Essay—'A composition, usually in prose, which may be of only a few hundred words or of book length and which discusses, formally or informally, a topic or a variety of topics. It is one of the most flexible and adaptabee of all literary forms.'

২. Treatise—'A formal work containing a systematic examination of a subject and its principles. The commonest subjects are philosophical, religious, literary, political, scientific and mathematical.'

৩. Discourse—'Usually a learned discussion, spoken or written, on a philosophical, political, literary or religions topic. It is closely related to a treatise and a dissertation. In fact, the three terms are very nearly synonymous.'

[A Dictionary of Literary Terms : J. A. Cuddon. London. 1977]

বাংলায় সন্দর্ভ ও নিবন্ধ শব্দেরও ব্যবহার ও প্রয়োগ দেখা যায়। সন্দর্ভ শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ [সম্+√দৃভ্+অ (ঘঞ্)—ভা] গ্রন্থন, নিবন্ধ, রচনা। দৃভ্ ধাতুর অর্থ গ্রন্থন, রচনা, সংগ্রহ, পরস্পর অন্বিত করে সাজানো। সন্দর্ভ শব্দটি সম্যক্‌রূপে গ্রন্থন, রচনা বা গ্রহণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'শব্দের সহিত শব্দের, অর্থের সহিত অর্থের, এবং শব্দের সহিত অর্থের সম্যক্ প্রকারে গ্রথিত হওয়াকেই সন্দর্ভ বলা যায়।'[৪] নিবন্ধ শব্দটিও বন্ধনযুক্ত রচনা অর্থে গৃহীত হয়। প্রবন্ধ ও নিবন্ধ প্রায় সমার্থবাচক শব্দ। অবশ্য গ্রন্থের বৃত্তি বা টীকাবিশেষ অর্থেও নিবন্ধ শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। রচনা বলতে গদ্যপদ্যময় যে কোনো রচনাকে বোঝানো হয় এবং রচনা শব্দটি সৃষ্টি, নির্মাণ, গঠন, গ্রন্থন, স্থাপন, সন্নিবেশ, বিন্যাস ইত্যাদি অর্থে

৩. বিষয় : প্রবন্ধ (ভূমিকা) :. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪. বাংলা সাহিত্যের একদিক : শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

ব্যবহৃত হয়। নিবন্ধ, সন্দর্ভ, প্রবন্ধ প্রভৃতি শব্দাবলী সমার্থবাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হলেও সন্দর্ভ কথাটি সংগ্রহ অর্থেও ব্যবহৃত হয়; আর নিবন্ধ শব্দটি দীর্ঘ প্রস্তাব বা দীর্ঘ প্রবন্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'নিবন্ধমূলক গদ্য রচনাকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। একটি তত্ত্বাশ্রয়ী প্রবন্ধ-নিবন্ধ সন্দর্ভ। অর্থাৎ যে গদ্য রচনায় যুক্তির বিশেষ বন্ধন আছে তার মধ্যে তত্ত্ব ও তথ্য নিজগুণেই প্রাধান্য লাভ করে। আর একটি হল রসাশ্রয়ী গদ্যরচনা যা নিবন্ধ হলেও প্রবন্ধ নয়। এই জাতীয় গদ্যরচনায় লেখকের ব্যক্তিসত্তার প্রাধান্য। এখানে তিনি রসস্রষ্টা, রূপদক্ষ এবং কল্পনাপ্রবণ। বাংলায় আমরা তত্ত্বাশ্রয়ী গদ্যরচনাকে বলতে পারি প্রবন্ধ সাহিত্য এবং রসাশ্রয়ী গদ্যরচনাকে বলা যাবে রচনাসাহিত্য। * * * দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি চিন্তাগ্রাহ্য ব্যাপারকে তথ্য ও তত্ত্বের আধারে এবং যৌক্তিক পারম্পর্যের বাহনে ফুটিয়ে তোলাই যথার্থ প্রবন্ধের লক্ষণ। তত্ত্ববহুল প্রবন্ধও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যদি তাতে যুক্তির পরিচ্ছন্নতা থাকে এবং বক্তব্যটি দৃঢ়মূল সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু প্রবন্ধ হবে নৈর্ব্যক্তিক। বস্তুগত ও যৌক্তিক পারম্পর্যে রূপনির্মিতি প্রবন্ধের প্রধান চরিত্র।'[৫]

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ভাবসমৃদ্ধ মননশীল গদ্যরচনাকে প্রবন্ধ বলা হলেও, কেউ কেউ প্রবন্ধ শব্দের পরিবর্তে প্রস্তাব শব্দের ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের নাম করা যেতে পারে। সম্ভবত কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম ব্যক্তি যিনি সচেতনভাবে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'বাংলা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ' গ্রন্থে প্রবন্ধ শব্দটি ব্যবহার করেন। 'আমরা গদ্যময় সাহিত্যিক লেখা বুঝাইতে খুব ব্যাপকভাবে বাঙলায় প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সন্দর্ভ এবং রচনা শব্দ প্রায় সমার্থরূপেই ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহার ভিতরে সাহিত্যিক মহলে প্রবন্ধ এবং শিক্ষার্থী মহলে রচনা শব্দটির ব্যবহার বেশী। হিন্দীতে এই অর্থে প্রবন্ধ এবং সন্দর্ভ শব্দের ব্যবহার থাকিলেও নিবন্ধ এবং লেখ কথা দুটির ব্যবহার বেশী প্রচলিত। ওড়িশায় প্রবন্ধ এবং অসমীয়াতে রচনা শব্দের অধিক প্রচলন দৃষ্ট হয়। প্রবন্ধ জাতীয় লেখা বাঙলা সাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই জাতীয় লেখা বুঝাইতে প্রবন্ধ শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায় না, প্রথমে এই জাতীয় লেখা বুঝাইতে প্রস্তাব শব্দটির খুব প্রচলন ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে প্রবন্ধ কথাটির বহুল প্রচার আরম্ভ হয়। রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সেযুগের লেখকগণ নিজেদের ছোট বড় সকল লেখাকেই প্রস্তাব নামে অভিহিত করিতেন। * * * ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধ কথাটির ব্যবহার করিলেও প্রস্তাব কথাটিরও ব্যবহার করিয়াছেন; বঙ্কিমচন্দ্রও প্রবন্ধ ও প্রস্তাব দুইটি শব্দই ব্যবহার

৫ বিষয়: প্রবন্ধ (ভূমিকা): অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

করিয়াছেন।'[৬] উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধ শব্দটির ব্যবহার আরও সীমিত হলো। বিষয়বস্তুর প্রাধান্য, বিষয়নিষ্ঠা, তত্ত্ব ও তথ্যের নিপুণ সমাবেশে গঠিত চিন্তাশক্তিতে ঋদ্ধ সাহিত্যিক রচনাই প্রবন্ধ নামে অভিহিত হতে সুরু করলো। সাহিত্য, সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তই এর অন্তর্ভুক্ত হলো। প্রবন্ধ জাতীয় রচনায় লেখকের পাণ্ডিত্য, চিন্তা ও বিচারশক্তির প্রকাশ লক্ষিত হলো। যেকোনো বিষয় সম্পর্কে নৈয়ায়িক চিন্তাসঞ্জাত প্রতিপাদ্য বিষয়ই প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে পরিগণিত হলো। 'উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রবন্ধ শব্দটি সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা যোগরূঢ় অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ইহার ব্যবহার গদ্যের ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত হইল। তথ্যের অন্বয় এবং যুক্তি তর্কের ক্রমসংবদ্ধতার ভিতর দিয়া যে সকল গদ্য লেখা একটা প্রকৃষ্ট বন্ধন লাভ করিল তাহাকেই আমরা নাম দিলাম প্রবন্ধ। * * * বাঙলা প্রবন্ধ সাহিত্যে রসের পরিণতি অপ্রধান—সিদ্ধান্তের পরিণতিই মুখ্যবস্তু। সকল প্রবন্ধের ক্ষেত্রেই ছোট হোক বড় হোক আমাদের একটি প্রতিপাদ্য থাকে। তথ্য প্রমাণের যথাযথ সমাবেশে, ভাবে, ভাষায়, চিন্তার প্রাখর্যে, সমন্বয়ে এবং পরিচ্ছন্নতায় সেই প্রতিপাদ্যকে প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই প্রতিপাদ্য বস্তু প্রত্নতাত্ত্বিক হইতে পারে, ঐতিহাসিক হইতে পারে, ভৌগোলিক হইতে পারে, ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি কিছু হইতেই তাহার বাধা নাই। হৃদয়গ্রাহী ভাষা ও রীতিতে যিনি তাঁহার প্রতিপাদ্যকে যতখানি সুস্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন, তিনিই তত বড় প্রবন্ধ লেখক।'[৭]

যে কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রবন্ধ রচিত হলেও বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রবন্ধের নিম্নোক্ত শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে—বিবৃতিমুখ্য প্রবন্ধ, বর্ণনাত্মক প্রবন্ধ, তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ, সমালোচনামূলক প্রবন্ধ।

বিবৃতিমুখ্য প্রবন্ধে খ্যাতনামা ব্যক্তির জীবনী, সমসাময়িক বা ঐতিহাসিক ঘটনা স্থান লাভ করে। বর্ণনামূলক প্রবন্ধে প্রকৃতি, রাষ্ট্র, সমাজ সংস্কৃতি ইত্যাদি স্থান পায়। তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ দর্শন, বিজ্ঞান ভাবনা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। সমালোচনামূলক প্রবন্ধে সাধারণভাবে সাহিত্য বিষয়ক সমালোচনা করা হয়। অবশ্য এই শ্রেণীবিভাগ চূড়ান্ত নয় এবং এর কোনো স্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করা যায় না। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত—'The freedom allowed in style and method makes it hard to draw lines between the different kinds of essay, and it is perhaps unnecessary that rigid classification be made.'

৬. বাঙলা সাহিত্যের একদিক : শশিভূষণ দাশগুপ্ত।
৭. পূর্বোক্ত : শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

(খ) বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য :

উনিশ শতকের সূচনায় বাংলা গদ্যসাহিত্য গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য সৃষ্টির পর্বও আরম্ভ হয়েছে, এমন বলা চলে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (১৮০০) প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বাংলা গদ্যসাহিত্যের জন্মসম্ভাবনা ও প্রসারের অবিচ্ছেদ্য রূপে যুক্ত হলেও এই পর্বের অধিকাংশ রচনা, ভাষা, পদ্ধতি, পারিপাট্য, যুক্তির সূক্ষ্মতা ইত্যাদি কোনো দিক থেকেই প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিশেষ সম্মান লাভের যোগ্য না হলেও, ঐতিহাসিকতার দিক থেকে এই পর্বের লেখাগুলি স্মরণীয়। বিতর্কের জন্য লিখিত প্রবন্ধাবলী ব্যতীত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পর্বে রচিত গদ্যগ্রন্থে প্রবন্ধ সাহিত্যের আংশিক আভাস লক্ষ্য করা যায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে সম্ভবত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের (১৭৬২—১৮১৯) রচনাতেই প্রবন্ধসাহিত্যের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। যে উপদেশমূলক ও নীতিমূলক জ্ঞানগর্ভ লেখা থেকে প্রবন্ধসাহিত্য গড়ে ওঠে, সেই প্রবন্ধসাহিত্যের প্রাক্‌রূপ লক্ষ্য করা যায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮১৩-তে রচিত, ১৮৩৩-এ প্রকাশিত) গ্রন্থে। তাঁর 'বেদান্তচন্দ্রিকা'কেও (১৮১৭) বাংলা সাহিত্যের আদি প্রবন্ধগ্রন্থ বলা যেতে পারে। অবশ্য এই জাতীয় প্রবন্ধ গ্রন্থের লেখকরূপে রামমোহন রায় মৃত্যুঞ্জয় পূর্ববর্তী ; কেননা রামমোহনের, বেদান্তসার', মৃত্যুঞ্জয়ের 'বেদান্তচন্দ্রিকার' পূর্ববর্তী। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকাতেও নানা জ্ঞানগর্ভ নীতিমূলক কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো ; তবে সেগুলি সাহিত্য গুণান্বিত ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে রামমোহন রায়ের (১৭৭৪—১৮৩৩) প্রতিভাতেই বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে যথাযথ সূচনা। তিনিই বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে একটি বিশেষ রূপ ও বিশেষ শক্তি দান করেছেন। এই সময় থেকেই তথ্যের যথাযথ সমাবেশে ও যুক্তির দৃঢ়বন্ধনে যুক্ত লেখাগুলি প্রবন্ধ নামে অভিহিত সুরু করে। চিন্তার বলিষ্ঠতা, নৈয়ায়িক সুস্পষ্টতা ও দৃঢ়বদ্ধতা—প্রবন্ধের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রামমোহনের রচনাতেই প্রথম লক্ষ্য করা যায়। রামমোহনের প্রবন্ধগুলি ধর্ম-তত্ত্বমূলক আলোচনা এবং সামাজিক আচার বিষয়ক রচনা এই দু'ভাগে বিভক্ত হতে পারে। 'বেদান্তসার' ও 'বেদান্তগ্রন্থ' ইত্যাদি প্রথম ভাগের এবং 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের সম্বাদ' ইত্যাদি দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত। রামমোহনের প্রবন্ধ বিবৃতপ্রধান, সাহিত্য রসসিক্ত নয়। তাঁর প্রবন্ধে যুক্তি, তথ্য, সুরুচি, শালীনতা, সংযম, তার্কিকতা ইত্যাদি যেমন অনুপস্থিত ছিল না, তেমনি 'রামমোহন শিল্পীজনোচিত প্রতিভারও অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তিনি যে জাতীয় প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সাহিত্যগুণ বিকাশের ক্ষেত্র ছিল না। সুতরাং তাঁহার প্রবন্ধ পর্যালোচনা করিয়া তাঁহাকে সাহিত্যশিল্পী আখ্যায় ভূষিত করা সম্ভব হয় না। কিন্তু রামমোহন যে বিচার-বিতর্কমূলক প্রবন্ধের আদি গুরু একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায়। সাহিত্য রসার্দ্র না হলেও প্রকাশভঙ্গির গুরুত্ব,

দৃঢ়তা ও মননশীলতায় রামমোহনের প্রবন্ধ ঐশ্বর্যময়'।[৮] রামমোহনের প্রভাব পরিমণ্ডলে পরিবর্ধিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, ব্রজমোহন মজুমদার, গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য, গৌরী-মোহন বিদ্যালংকার প্রমুখ প্রাবন্ধিকগণের নামও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রামমোহন পরবর্তীকাল ব্যাপকার্থে তত্ত্ববোধিনীর যুগ আর সংকীর্ণ অর্থে অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্ব। তত্ত্ববোধিনীর যুগ অধিকতর সঙ্গত বলে মনে হয়; কেননা এই পর্বে অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ প্রাবন্ধিকবৃন্দ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্যতীত বিবিধার্থ সংগ্রহ, এডুকেশন গেজেট, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি পত্রিকাকেও কেন্দ্র করে বহু প্রাবন্ধিকের আবির্ভাব ঘটেছিল।

নানা ভাষাবিদ জ্ঞানসাধক চিন্তাশীল পণ্ডিত অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০—১৮৮৬) রসব্যঞ্জনাপেক্ষা তথ্যযুক্তির উপর যে গুরুত্বারোপ করতেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত 'চারুপাঠ' (তিন খণ্ড), ধর্মনীতি, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রভৃতি গ্রন্থে। চারুপাঠে প্রকাশিত ছোট ছোট লেখাকে তিনি প্রস্তাব নামে অভিহিত করেছেন। অক্ষয়কুমার বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রতত্ত্ব, সমাজদর্শন ইত্যাদি নানা বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য সাধন করেন। তাঁর প্রবন্ধে চিন্তাশীলতা, যুক্তিনিষ্ঠা, বিজ্ঞানমনস্কতার উপস্থিতি উজ্জ্বলভাবে লক্ষ্যগোচর। অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ রচনার অন্যতম বিশিষ্টতা তাঁর ভাষাগত ওজস্বিতা, প্রাঞ্জলতা, ভাবপ্রকাশগত সংযম এবং বিষয়োপযোগী ভাষা প্রয়োগ।

রামমোহন উনিশ শতকের অনড় সমাজে যুক্তিজ্ঞানের অস্ত্রাঘাতের দ্বারা যে বহ্নিশিখা নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন বিদ্যাসাগর সেই জ্ঞানবর্তিকাবাহীর উত্তর-পুরুষ। নির্মোহ জ্ঞানবাদের সঙ্গে অকুণ্ঠ মানবপ্রেম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০—'৯১) ব্যক্তিচেতনা ও সমাজচৈতন্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলো। বিদ্যাসাগর সৃষ্টির যৌক্তিকতা ও মূল্য সম্বন্ধে যুক্তিনিষ্ঠ অতন্দ্র বুদ্ধির প্রখর জিজ্ঞাসায় জিজ্ঞাসু ছিলেন। মানুষের প্রতি অপরিসীম প্রীতি বিদ্যাসাগরের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য। এই মানবপ্রেমই তাঁর সমগ্র সত্তা, যুক্তি, দার্শনিকতা ও সমাজবোধকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রাচীন সংস্কার বিরোধিতা, প্রবলপৌরুষ, ক্ষত্রবীর্য, জীবন সম্পর্কে উদার সহানুভূতিশীল আস্তিক্যানুভূতি সমস্ত কিছুর মূলে ইহজীবনের প্রতি মমতাময় শ্রদ্ধা বিদ্যাসাগরের মনোজীবনের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য। বিদ্যাসাগরের রচনাবলী তাঁর প্রাণের বাণী ও আত্মার সংকটকে প্রতিফলিত এবং প্রসারিত করেছে। প্রাবন্ধিক রূপে বিদ্যাসাগরের মৌলিক কৃতিত্ব এই যে, তিনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ ও মৌলিক প্রবন্ধ রচনার ভাষাগত পার্থক্য বিলুপ্ত করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত মৌলিক প্রবন্ধগ্রন্থগুলি যথাক্রমে—সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব, বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া

---

৮. আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা: অধীরকুমার দে।

উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার ইত্যাদি। বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধ সাহিত্যকে সাহিত্যসমালোচনামূলক প্রবন্ধ সাহিত্য, সমাজসংস্কারমূলক প্রবন্ধ সাহিত্য, বিতর্কবহুল প্রবন্ধ সাহিত্য ইত্যাদি নানা পর্যায়ে ভাগ করা চলে। বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করে বিদ্যাসাগর কয়েকটি নীতিমূলক প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন। অবশ্য এই জাতীয় প্রবন্ধাবলী তাঁর বিভিন্ন শিশুপাঠ্য গ্রন্থে (যেমন —জীবনচরিত, বোধোদয়, চরিতাবলী) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধে যুক্তির সঙ্গে হৃদয়াবেগের সংমিশ্রণ ঘটায় তাঁর প্রবন্ধগুলি নীরস বিতর্কমাত্রে পর্যবসিত হয় নি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধাবলীর আলোচনার সমাপ্তিতে এমন বক্তব্য করা সম্ভবত অসঙ্গত নয় যে, 'বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধকাররূপেও তাঁহার একটি স্বতন্ত্র পরিচয় আছে এবং বাংলা বিতর্কমূলক প্রবন্ধের ভাষারূপের মধ্যে যে বলিষ্ঠ সাহিত্যিক সম্ভাবনা রহিয়াছে, বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধ হইতেই তাহা সর্বপ্রথম প্রমাণিত হইয়াছে।'[৯]

বিদ্যাসাগরের প্রায় সমকালে আবির্ভূত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৫) 'স্বীয় জীবনসাধনায় জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন এবং নির্দ্বন্দ্ব অনুভূতির তুঙ্গশীর্ষে সমাসীন হইয়াও মর্ত্য জীবনের সহিত নিবিড়তর যোগসূত্র রক্ষা করিয়াছিলেন।'[১০] আত্মজীবনচরিত বাদ দিলে দেবেন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত রচনাই ব্রাহ্মধর্মের বিবিধ প্রসঙ্গকে অবলম্বন করে লিখিত। তাঁর আত্মতত্ত্ববিদ্যা, ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান, পরলোক ও মুক্তি ইত্যাদি প্রবন্ধগ্রন্থগুলি ধর্ম বা তত্ত্বমূলক হলেও এখানে নীরস তত্ত্বালোচনাই মুখ্য হয়ে ওঠে নি; দেবেন্দ্রনাথের সহজাত সৌন্দর্যবোধ, শিল্পিসুলভ রসচেতনা তাঁর প্রবন্ধগুলিকে সাহিত্য পদবাচ্য করে তুলেছে। তাঁর প্রবন্ধসমূহে হৃদয়ানুভূতিজাত ভাবাবেগের সঙ্গে যুক্তিতর্কের তীক্ষ্ণতা, পরমতখণ্ডনের প্রবণতাও লক্ষ্যগোচর। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিগত প্রবন্ধগ্রন্থরূপে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দেবেন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্যের ভাষাগত সরলতা, সরসতা, ঋজুতা, স্বতস্ফূর্ততা, গভীর শিল্পবোধ, সর্বোপরি সহজাত ধর্মানুভূতির এমন নির্বাধ প্রকাশ তাঁকে অন্যতম প্রাবন্ধিকের মর্যাদা দান করেছে।

বাংলা গদ্যসাহিত্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫—৯৪) ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রবন্ধের রচয়িতারূপেই খ্যাতিমান। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইতিহাসকেন্দ্রিক, নাট্য-সমালোচনাকেন্দ্রিক, সমাজচিন্তামূলক প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর পুরাবৃত্ত সার, বাঙ্গালার ইতিহাস, ইংলণ্ডের ইতিহাস ও রোমের ইতিহাস ইতিহাসকেন্দ্রিক রচনা; বিবিধপ্রবন্ধ সংস্কৃত নাট্য সমালোচনামূলক গ্রন্থ, পারিবারিক, সামাজিক আর আচার প্রবন্ধ তাঁর সমাজচিন্তামূলক প্রবন্ধ। তাঁর স্বভাবগত যুক্তিনিষ্ঠা পৌরুষ

---

৯. আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা : অধীরকুমার দে।

১০. ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভাষাভঙ্গিতেও প্রতিফলিত। বিষয়গৌরবী প্রবন্ধের ভাষারূপে তাঁর গুরুগম্ভীর সংস্কৃতানুসারী ভাষাপ্রয়োগ লক্ষ্যগোচর। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টিকারী এবং অভিনব বিষয়াবলম্বনে প্রবন্ধরচনা করে ভূদেব মুখোপাধ্যায় বিশেষ মর্যাদার আসনে যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮—৯৪) প্রাক্ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য বিষয় ও ভাষারীতিতে অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ লেখকগণের দ্বারা সমৃদ্ধ ও সহজবোধ্য হলেও, বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাংলা প্রবন্ধের কলাসৌষ্ঠব ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এক অনমনীয় দৃঢ়তা ও সুসংবদ্ধ সাহিত্যিক সরলতা দান করে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে প্রথম শ্রেণীর শিল্পকলার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণতম রূপের সার্থক স্রষ্টা বলা চলে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন "এতদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মত এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম সংকীর্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক একটি তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) প্রকাশের কাল থেকে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ভাষার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পর থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র ভাষাকে অধিকতর প্রাণবন্ত ও সাধারণের নিকট সহজ এবং বোধগম্য করতে প্রয়াসী হন। তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট, সহজ ও যুক্তিধর্মী ভাষা যে সমস্ত প্রবন্ধ রচনার প্রাণস্বরূপ একথা বঙ্কিম পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে প্রায় অজানা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম সৌন্দর্যময়ী, যুক্তিপূর্ণ অথচ রসসমৃদ্ধ ভাষার দ্বারা প্রবন্ধকে মহিমান্বিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার প্রবন্ধ সাহিত্যে এক ধ্রুপদীশিল্পী তিনি বিবিধ প্রসঙ্গ অবলম্বন করে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বিজ্ঞান সাহিত্য, সমাজতন্ত্র, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস কোন বিষয়ই তাঁর আলোচনা বহির্ভূত ছিল না। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য, অলঙ্কার, সমাজ, রসতত্ত্ব, অর্থনীতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয় সাঙ্গীকরণ করে তাঁর প্রতিভার দীপ্তিতে বাংলা প্রবন্ধকে প্রথম শ্রেণীর গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন।

প্রবন্ধ যে নিছক উচ্ছ্বাসধর্মী গদ্যরচনা নয়, প্রবন্ধের মধ্যে যে প্রসারিত দৃষ্টি, দুর্লভ মনীষা ও তেজোদীপ্ত ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটিত হওয়া উচিত একথা বঙ্কিমচন্দ্রের অজ্ঞাত ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ যুক্তিনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী বলে তাঁর প্রবন্ধের ভিত্তিভূমি জাতীয় সংস্কৃতি ও সমাজজীবন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত প্রবন্ধ গ্রন্থসমূহ যথাক্রমে— বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫), বিবিধ সমালোচনা (১৮৭৬), রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী (১৮৭৭), সাম্য, (১৮৭৯), প্রবন্ধপুস্তক (১৮৭৯), কৃষ্ণচরিত্র (১ম ভাগ ১৮৮৬, সম্পূর্ণ ১৮৯২), বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ভাগ-১৮৮৭, দ্বিতীয় ভাগ-১৮৯২) ধর্মতত্ত্ব (১৮৮৮)।

তবে এর মধ্যে 'লোকরহস্য' এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রহণীয় নয়। কেননা এই গ্রন্থটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আছে। 'লোকরহস্য' সাময়িক

বিষয় ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে অতি লঘু সুরের আলোচনায় ব্যঙ্গ রসপিপাসাকে চরিতার্থ করেছে। আর 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বঙ্কিমচন্দ্র কৌতুকরসের আবরণে রূপকধর্মী উপাখ্যানের মাধ্যমে তৎকালীন দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি ও সাহিত্যের পর্যালোচনা করেছেন।

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্রের যে প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত হয় তারই সংকলন' বিজ্ঞানরহস্য'। বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ জীব ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়কে অবলম্বন করে প্রবন্ধ রচনায় নিরত হয়েছেন। বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুসন্ধান তাঁর তত্ত্ব এবং তথ্য সমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নিবিড় সাহিত্যরসে নিষিক্ত হয়ে সাধারণ পাঠকের কাছে উপাদেয় বস্তুরূপে পরিগণিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কয়েকজন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকের জীবনী এবং তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে কয়েকটি সারগর্ভ আলোচনাপূর্ণ প্রবন্ধের সংকলন 'বিবিধ সমালোচন'।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে জীবনী লেখার সূচনা হলেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী' গ্রন্থে 'নীলদর্পণ'কে অবলম্বন করে দীনবন্ধুর ব্যক্তিচরিত্র ও সাহিত্যিক মানসের নিখুঁত পরিচয় প্রকাশ করেছেন। নীলদর্পণের নাট্যগুণ সম্পর্কে বাংলাদেশে যখন প্রবল বাদপ্রতিবাদ ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল তখন বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত নাটকের শিল্পসম্মত নাট্যগুণ নির্দেশ করে তাঁর প্রবন্ধে যে মূল্যবান মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

'সাম্য' বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনার ফলশ্রুতি। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনীতি বা রাষ্ট্রবিষয়ক আলোচ্য প্রবন্ধ গ্রন্থে তিনি বর্ণবৈষম্য ও অর্থ বৈষম্যের বিষময় পরিণতির এক সুস্পষ্ট চিত্রাঙ্কন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলাদেশে প্রথম সাহিত্যিক রচনার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মূলমন্ত্র প্রচার করেছেন। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচ্য প্রবন্ধ গ্রন্থের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। সুস্থ কল্যাণকর যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা বঙ্কিমচন্দ্রের মানসনেত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল আলোচ্য প্রবন্ধ গ্রন্থে তারই প্রকাশ সংলক্ষ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থটি পরবর্তীকালে একত্রে প্রকাশিত হয় এবং উক্ত গ্রন্থে তিনি বাংলাদেশের কৃষক, বাঙালী জাতি, বাংলাদেশের ইতিহাস, লোকবৃত্ত ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত এবং বিশ্লেষণ নিপুণ আলোচনা করেছেন। জাতি, সমাজ, অর্থনীতি ব্যতীত তাঁর সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলিও আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 'বঙ্গদেশের কৃষক' চারিটি পরিচ্ছেদ সম্বলিত। প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞানচর্চার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। বঙ্গদেশের কৃষকদের দুরবস্থা, জমিদারদের অমানবিক নিষ্ঠুরতা, রাষ্ট্রীয় আইন, কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রীতি প্রভৃতির ফলে কৃষকদের জীবনে যে কী ভয়ানক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে তারই যুক্তিগর্ভ সুবিস্তৃত আলোচনা এখানে লক্ষ্যগোচর, 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি তথ্যবহুল

হলেও এর প্রতি পরিচ্ছেদে দেশের নিপীড়িত কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগপূর্ণ প্রাণাবেগ ও প্রীতি-বিগলিত হৃদয়ের সহানুভূতি, উদাত্ত বলিষ্ঠভাবে সর্বত্র প্রকাশ পেয়েছে। স্বাদেশিকতা, জাতীয়তাবোধ, চিন্তাশক্তির মৌলিকতার অভিনবত্বে ও অখণ্ড মনুষ্যত্বের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধটি মহিমা সমুজ্জ্বল।

বাংলাদেশ, বাঙালী জাতি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে যে কত প্রিয় ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার', 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' প্রভৃতি প্রবন্ধের মধ্যে। এই জাতীয় প্রবন্ধগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তি নিষ্ঠা, আদর্শবাদ ও স্বজাতি প্রেমের গভীর আবেগ উদ্বেলিত হয়েছে। বাঙালিকে ঐতিহ্য সচেতন, স্বধর্মে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য 'বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে জাতিকে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন—"বাঙালীর ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙালী কখনও মানুষ হইবে না।" তিনি ইংরাজ প্রদত্ত ইতিহাস তথ্যের নিন্দা করেছেন এবং প্রকৃত তথ্যবাহী ইতিবৃত্ত রচনার জন্য বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অনুসরণে জাতিকে উদ্বোধিত করতে চেয়েছেন। স্বজাতির প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ তাঁকে বাংলার ঐতিহ্য উদ্ধারে অনুপ্রাণিত করেছিল। বাংলাদেশে অখণ্ড ইতিহাস রচনার জন্য প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র সেকথা অস্বীকার করেননি। 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, বাঙ্গালীর উৎপত্তি' প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে তাঁর বিস্তৃত অধ্যয়ন, গবেষণা ও ইতিহাসনিষ্ঠ আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি তাঁর গভীর রসবোধ ও কবিপ্রবণতার সার্থক নিদর্শন। এই জাতীয় প্রবন্ধের ভাষারীতি ও উপস্থাপনার পদ্ধতি স্বতন্ত্রধর্মী। তাঁর সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—সাহিত্য রূপকল্প ও সাহিত্য সমালোচনা। 'গীতিকাব্য', 'প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত', 'সঙ্গীত' প্রভৃতি প্রবন্ধ সাধারণত সাহিত্যের রূপকল্প ও বস্তুসামগ্রীর আলোচনা। পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শে প্রভাবিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম সাহিত্যের উপাদান ও প্রকৃতিকে অবলম্বন করে বাঙলা সাহিত্যে প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত করেন। 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে তিনি গীতিকাব্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন সেখানে তাঁর সূক্ষ্ম চিন্তা ও গভীর মননধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মতে—"গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য, কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দ বিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক ও সম্পূর্ণ চিত্ত ভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।" আলোচ্য সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র মহাকাব্য, নাটক ও গীতকাব্যের পারস্পরিক পার্থক্য নির্দেশের মধ্যে সাহিত্যচিন্তার মৌলিক প্রমাণ দিয়েছেন।

বঙ্কিম-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখিত হলেও, তা

অপূর্ণাঙ্গ ও অপরিণত ছিল। তিনিই প্রথম নৈয়ায়িক মনীষাবৃত্তির সঙ্গে উদার উন্মুক্ত অনুভূতির, হৃদয়বৃত্তির সুষ্ঠু সম্মিলনে সাহিত্য সমালোচনার পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশ করেন। সংস্কৃত রসশাস্ত্র ও সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের বোদ্ধা বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য সমালোচনা রীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে, তিনি তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। 'উত্তরচরিত', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যে গভীর রসদৃষ্টি বহুশ্রুতি এবং তীক্ষ্ণ বিচার বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তা সমালোচনা সাহিত্যের সামগ্রিক ঐশ্বর্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে।

'উত্তরচরিত' বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। সরল বিশ্লেষণ ও গভীর রসবোধের সার্থক সম্মিলনে প্রবন্ধটি উজ্জ্বল। 'শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তিনটি নাট্যগ্রন্থের তিনজন নায়িকার বৈশিষ্ট্য তুলনামূলক বিশ্লেষণী শক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বহিঃপ্রকৃতি এবং অন্তঃপ্রকৃতি প্রধান দুই গোত্রের কাব্যকে মুখ্য বিষয়রূপে ধরে নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। বঙ্কিমের মতে, জয়দেবে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য এবং বিদ্যাপতিতে অন্তঃপ্রকৃতির প্রাধান্য।

'কৃষ্ণ চরিত্র' ও 'ধর্মতত্ত্ব' তাঁর ধর্মবিষয়ক দুটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধগ্রন্থ। 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে কৃষ্ণকে তিনি সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বর অবতাররূপে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, কৃষ্ণ মনুষ্য চরিত্রের আদর্শগত দিকের প্রতিভূস্বরূপ। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে তিনি নৈয়ায়িক দৃষ্টিতে পাশ্চাত্যে religion এবং প্রাচ্যের ধর্ম এই উভয়বিধ অর্থের স্বরূপ ও প্রকৃতি আলোচনায় প্রবৃত্ত। বঙ্কিমচন্দ্র সত্যান্বেষী আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন বলে তিনি তাঁর জীবনদর্শনকেই প্রবন্ধে ব্যক্ত করতে প্রয়াসী।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগত প্রতিপাদ্য বিষয় ও ভাবধারার মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য ও গভীরতা পরিলক্ষিত হয়, তেমনি বিষয়ের গুরুত্বানুসারে তাঁর রচনারীতি সৌষ্ঠব সৌকর্যে উজ্জ্বল ও প্রসাদগুণে স্বচ্ছ সুন্দর হয়েছে, তাঁর ভাষার ও চিন্তার এমন সাবলীল গতিপ্রবাহ ও হরগৌরী মিলন বাংলা সাহিত্যের অন্যত্র বিরলদৃষ্ট। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, প্রকাশভঙ্গীর অভিনবত্বে, গভীর আন্তরিকতায়, স্নিগ্ধ মধুর লালিত্যে, স্নিগ্ধ সচেতনতায়, ভাষার নমনীয়তায়, অসাধারণ প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে, ওজস্বী ও দীপ্তিময় ব্যক্তিত্বে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।

বঙ্কিম-সমকালীন প্রবন্ধসাহিত্যে বঙ্কিমের তুল্য প্রাবন্ধিক দুর্লভ। তাঁর লেখনীতে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য পরিপুষ্টি ও বৈচিত্র্য অর্জন করেছে। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে তিনি একদিকে যেমন প্রবন্ধ রচনার সার্থক আয়োজন করেছেন, অন্যদিকে তেমনি, বাঙালী পাঠকের বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রুচিবোধ এবং বিচার বুদ্ধি জাগ্রত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি সমকালীন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবির্ভূত হন, এবং তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুকরণ করলেও নিজস্ব

কৃতিত্বের স্বাক্ষর তাঁদের রচনায় দুর্লভ নয়। এই পর্বের খ্যাতকীর্তি প্রাবন্ধিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামগতি ন্যায়রত্ন, রামদাস সেন, চন্দ্রশেখর বসু, রজনীকান্ত গুপ্ত, অক্ষয় সরকার, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র সেন, বীরেশ্বর পাঁড়ে, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মীর মশাররফ হোসেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ। তবে শিবনাথ শাস্ত্রী এবং কেশবচন্দ্র সেন বাংলা গদ্যের প্রবন্ধ কায়া নির্মাণে যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, অন্যান্যরা ততখানি নয়। স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে একটি পৃথক অধ্যায় এবং যুগের সূচনা করেছেন; তিনি আপন স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত।

রামগতি ন্যায়রত্ন বিশিষ্ট সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশে'র একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁর সাহিত্য সমালোচনামূলক একমাত্র গদ্যগ্রন্থ 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব'। গ্রন্থের প্রথমভাগ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সূচনা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সমকালীন লেখকবর্গের বিচিত্র সাহিত্যচর্চার ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত এর পূর্বে লিখিত হয়নি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমোন্নতি ও বিবিধ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যুগবিভাগ করে রামগতি বিভিন্ন লেখক ও তাঁদের রচনাসমূহের যে অনুধ্যান এবং অনুশীলন করেছেন তার দ্বারা তাঁর তথ্যনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রয়াস পাওয়া যায়। সংযম ও শালীনতা রামগতির প্রবন্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বাঙালী মনীষীদের মধ্যে রামদাস সেন (১৮৪৫—৮৭) সর্বপ্রথম ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং অনুশীলনে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি পুরাতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তরূপে গ্রহণ করেননি। রামদাস প্রণীত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি যথাক্রমে—(১) ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন (১৮৭২) (২) মহাকবি কালিদাস (১৮৭২) (৩) ঐতিহাসিক রহস্য (৪) রত্নরহস্য (১৮৮৪) (৫) ভারতরহস্য (৬) বুদ্ধদেব (১৮৯১)। রামদাস অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে প্রাচীন ভারতবর্ষের শাস্ত্রচর্চা, জীবনপদ্ধতি, ধর্ম, সমাজনীতি ও দর্শনাদির গভীর পর্যালোচনা করেছেন। রামদাসের রচনার বিশিষ্ট গুণ সহজ, সাবলীল ভাষা। তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধেই যুক্তিনিষ্ঠা, তথ্যবাহুল্য এবং বিজ্ঞান সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলা ভাষায় ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের একনিষ্ঠ চর্চা করে এবং ভারতবর্ষের দার্শনিক মনীষীদের প্রচারিত নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ অতি সহজ ও সরলবোধ্য ভাষায় পরিবেশন করে যাঁরা কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে চন্দ্রশেখর বসু অন্যতম। দার্শনিক, তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধ থেকে চন্দ্রশেখরের গভীর চিন্তাশীলতা, মনস্বিতা ও পাণ্ডিত্যের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি যথাক্রমে—অধিকার তত্ত্ব (১৮৭২), বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি (১৮৭৫), বেদান্ত প্রবেশ (১৮৭৫), সৃষ্টি (১৮৭৫), হিন্দুধর্মের উপদেশ (১৮৮৪), বেদান্ত দর্শন (১৮৮৫), পরলোক তত্ত্ব (১৮৮৫), প্রলয় তত্ত্ব (১৮৮৬)।

চন্দ্রশেখরের দার্শনিক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে তাঁর মৌলিক ও বিশিষ্ট রচনা হিসেবে 'অধিকার তত্ত্ব'র উল্লেখ করা যায়। গ্রন্থখানিতে তাঁর গভীর মননশীলতা, অপূর্ব বিশ্লেষণ নৈপুণ্যের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। চন্দ্রশেখরের 'বেদান্ত দর্শন' গ্রন্থটিও গভীর দার্শনিক চিন্তা উদ্রেকে সহায়তা করে। চন্দ্রশেখরের সর্ববিধ দার্শনিক প্রবন্ধ যেমন ভাবগম্ভীর তেমনি ভাষা ও রচনারীতির স্বাতন্ত্র্যে এবং ঔজ্জ্বল্যে বৈশিষ্ট্যময়।

বাংলাদেশে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব প্রসঙ্গে যে ক'জন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি গভীর গবেষণায় নিয়োজিত হয়ে প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে নতুন আলোকপাত করেছেন, তাঁর মধ্যে রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯—১৯০০) অন্যতম। তাঁর প্রণীত প্রবন্ধ গ্রন্থসমূহ যথাক্রমে 'জয়দেব চরিত', 'পানিণি', প্রবন্ধমালা, প্রবন্ধকুসুম, নবচরিত, ভারতকাহিনী, বীর-মহিমা, হিন্দুর আশ্রম চতুষ্টয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিভা ইত্যাদি। রজনীকান্তের সাহিত্যজীবনের প্রারম্ভ পুরাতত্ত্ব আলোচনায় ব্যাপৃত থাকলেও, শেষপর্যন্ত তিনি ঐতিহাসিক ও জীবনবৃত্ত বিষয়ক রচনায় মনোনিবেশ করেন। বঙ্কিমপর্বে আবির্ভূত প্রবন্ধকারদিগের মধ্যে রজনীকান্ত বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। তাঁর লিখিত ৫ ভাগে সম্পূর্ণ সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যরুচি ও আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তরূপে এবং তাঁর প্রত্যক্ষ ভাবশিষ্যরূপে অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬—১৯১৭) স্মরণীয় হয়ে আছেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থাকার ফলে তিনি তাঁর ভাষা ও রচনারীতি এমন গভীরভাবে অনুশীলন করেছিলেন যে অনেকক্ষেত্রে তাঁর প্রবন্ধকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ বলে মনে হয়। অক্ষয়চন্দ্র সমাজ-সাহিত্য-ধর্ম-দর্শন-রাজনীতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। অক্ষয়চন্দ্র প্রণীত প্রবন্ধ গ্রন্থসমূহ যথাক্রমে—সমাজ সমালোচনা, আলোচনা, সনাতনী, কবি হেমচন্দ্র এবং মহাপূজা। অক্ষয়চন্দ্র একজন কৃতি সাংবাদিকরূপেও খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি স্বদেশের সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং দেশের উচ্চতম সনাতন ভাবাদর্শ তাঁর মনন ও চিন্তারাজ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বঙ্কিম-সমকালীন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫—৮৬) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবন্ধ লেখক ছিলেন। তিনি ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ব্যতীত অসমীয়া, ওড়িয়া, পার্শী, উর্দু, হিন্দী, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি ভাষাসমূহে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর এই মনীষা বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে, ফলে তাঁর প্রবন্ধগুলি মূল্যবান তথ্যে পরিপূর্ণ, সারগর্ভ এবং বহুদর্শী পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বহুখ্যাত রচনা 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৭৪) গ্রন্থে জ্ঞানগর্ভ মননশীল প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। তাঁর একমাত্র মৌলিক প্রবন্ধের সংকলন 'নানাপ্রবন্ধ' (১৮৮৪) খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের মহান আদর্শ ও গভীর ভাবদৃষ্টি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস গবেষণায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান সহায়ক ছিলেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে

সামাজিক ও লোকজীবনের প্রসঙ্গকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদান করেছেন। রাজকৃষ্ণ প্রণীত 'নানাপ্রবন্ধ' তাঁর বিবিধ প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তাঁর সমস্ত প্রবন্ধ রচনার পশ্চাতে সত্যসন্ধ যুক্তিবাদী মননচিন্তা বর্তমান ছিল। ভাষার অনাড়ম্বর ঋজুতা তাঁর প্রবন্ধগুলির মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪—৮৯) 'পালামৌ' নামক উপন্যাসধর্মী ভ্রমণকাহিনী রচনা করে অবিস্মরণীয় হলেও তাঁর আলোচ্য গ্রন্থটিতে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের উৎকৃষ্ট গুণসমূহ পরিলক্ষিত হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বাংলা প্রবন্ধগ্রন্থ যথাক্রমে—যাত্রা সমালোচনা, সংকার ও বাল্যবিবাহ। প্রতিটি প্রবন্ধেই তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, বিশ্লেষণ-পটুতা ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মুখ্যতঃ সাহিত্য ও সমাজমূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বক্তব্যবিষয় সহজভাবে পরিবেশন করার এক দুর্লভ শিল্পক্ষমতা সঞ্জীবচন্দ্রের ছিল। কবিত্বসুলভ সরল অনাড়ম্বর ভাষাও তাঁর সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক প্রবন্ধের অন্যতম গুণ।

ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম বিশিষ্ট ধর্মাচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭—১৯১৯) কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি মৌলিক সৃষ্টিধর্মী রচনা ব্যতীত বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ রচয়িতারূপেও খ্যাতিমান হয়ে আছেন। শিবনাথের প্রবন্ধের রচনারীতি সহজ ও সরল এবং সেখানে কোনরূপ কৃত্রিম অলঙ্কার প্রয়োগের প্রয়াস নেই। বক্তব্য বিষয়ের সরসতা ও ভাষার প্রসাদগুণের জন্য শিবনাথের প্রবন্ধগুলি চিত্তাকর্ষক ও সমাদৃত হয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর অধিকাংশ প্রবন্ধই ধর্ম, সাহিত্য, সমাজ ও চরিত বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত। শিবনাথ প্রণীত প্রবন্ধ গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রামমোহন রায় (১৮৮৬), মাঘোৎসবের উপদেশ (১৯০২), রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯০৪), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র (১৯১০), আত্মচরিত (১৯১৮)।

শিবনাথের সাহিত্যজীবনের সর্বাপেক্ষা দুটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' এবং 'আত্মচরিত'। এই গ্রন্থ দুটি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। রামতনুর ন্যায় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আদর্শ পুরুষকে কেন্দ্র করে শিবনাথ উনিশ শতকের বঙ্গসমাজের গৌরবোজ্জ্বল ঘটনাসমূহ আলোচ্য গ্রন্থে নিরপেক্ষভাবে বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থটি তথ্যনিষ্ঠা, সরসবর্ণনা, প্রাঞ্জল ভাষা, ইতিহাস ও সাহিত্যের যুগল সম্মিলনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'আত্মচরিতে' শিবনাথের কর্মবহুল জীবনের বিচিত্র ঘটনা বর্ণিত হলেও, আত্মকাহিনী আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে সমগ্র বাংলাদেশের এক গৌরবময় যুগের স্বরূপ প্রকাশের ইতিবৃত্ত হয়ে উঠেছে। শিবনাথের রচনাভঙ্গী, অকুণ্ঠ সত্যভাষণ এবং উনিশ শতকের বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ সামাজিক চিত্র গ্রন্থটিকে বিরল সৌন্দর্য দান করেছে।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮—১৯০৯) 'বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য' এবং 'মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র' নামক দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতিমান হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রে যে আধুনিক বাঙালীর চিন্তা, কল্পনা, উত্তম বাংলা ভাষায় প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করেছেন, প্রথম প্রবন্ধটিতে রমেশচন্দ্র তাই বিবৃত করেছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের তুলনামূলক আলোচনা করে মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে প্রাবন্ধিক ব্রতী হয়েছেন। কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮—৮৪) মূলতঃ ধর্মমূলক প্রবন্ধের রচয়িতা। তিনি বাংলা ভাষায় এক অভিনব ভঙ্গী ও বাক্যগ্রন্থনের সরল কৌশল প্রবর্তন করেছেন। বঙ্কিম-পর্বে কেশবচন্দ্রের এই স্বাতন্ত্র্য সাহিত্যিক গদ্যরীতি উপেক্ষণীয় নয়। কেশবচন্দ্রের গদ্যরীতি ও ভাষার ক্ষেত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব কিয়ৎ পরিমাণে অনুভূত হয়। তৎকালে বাংলা গদ্যভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও কেশবচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে অযথা কৃত্রিম অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটাননি। তিনি সহজ সরল বাক্যবিন্যাস পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। কেশবচন্দ্রের প্রবন্ধ গ্রন্থসমূহ যথাক্রমে—'সেবকের নিবেদন', 'জীবনবেদ', 'মাঘোৎসব', 'ব্রহ্মোপাসনা', 'আচার্যের উপদেশ' ইত্যাদি। কেশবচন্দ্রের প্রতিটি রচনাই গভীর ধর্মচিন্তার পরিচায়ক। ভাবের গাম্ভীর্য, ভাষার সারল্য ও ভক্ত হৃদয়ের অন্তর্গূঢ় মাধুর্য তাঁর প্রত্যেকটি রচনায় লক্ষ্য করা যায়। কেশবচন্দ্রের আত্মজীবনাশ্রিত প্রবন্ধ গ্রন্থ 'জীবনবেদ' প্রথাসিদ্ধ জীবনীগ্রন্থ নয়। ভাষার সৌষ্ঠব, ভাবের গাম্ভীর্য এবং আদর্শের সার্বভৌমিকতা কেশবচন্দ্রের প্রবন্ধগুলিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

ধর্মমূলক প্রবন্ধের অপর একজন কৃতি প্রাবন্ধিক রূপে স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩—১৯০২) নাম উল্লেখযোগ্য। কাল পরিধির বিচারে তিনিও বঙ্কিম বলয়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু গদ্যের অন্তর্নিহিত ভাবরসের বা গদ্যবাহিত সত্যের মূল্যায়নের দৃষ্টিতে তিনি যথেষ্ট সচেতন। ধর্মের অভ্যুত্থান চিরদিনই সাহিত্যের পরিপোষক। বাংলায় উনিশ শতকের ধর্মচিন্তা পরমহংসদেবের সেবা ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কারণ সেবাধর্ম প্রধানতঃ কর্মের পথটিকেই কেন্দ্র করে চলেছিল এবং চিন্তা অপেক্ষা কর্মকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। বিবেকানন্দের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি হল—'বর্তমান ভারত', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পরিব্রাজক', 'ভাববার কথা' 'কর্মযোগ,' 'জ্ঞানযোগ' ইত্যাদি। স্বামী বিবেকানন্দের গদ্য ভাষার মধ্যে চিন্তার বলিষ্ঠতা ও আত্মপ্রত্যয় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গদ্যভাষার একদিকে যে প্রাণশক্তি এবং অন্যদিকে যে সহজ সরলতার প্রকাশ ঘটেছে তাও বাংলা গদ্য রচনায় আদর্শ বলে গৃহীত হওয়ার যোগ্য।

বঙ্কিমপর্বের অন্যতম কৃতি প্রবন্ধকার পূর্ণচন্দ্র বসু ভারতীয় হিন্দু সমাজ, ধর্ম ও দর্শন প্রসঙ্গে বিবিধ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থসমূহ যথাক্রমে 'কাব্য সুন্দরী,' 'সমাজচিন্তা', 'সাহিত্য চিন্তা', 'কাব্যচিন্তা', 'সমাজতত্ত্ব' ইত্যাদি। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে পূর্ণচন্দ্র পাশ্চাত্য সমালোচনা রীতি অনুসরণ করলেও তার স্বাধীন রসবোধ ও বিচার বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য কোথাও ম্লান হয়নি। পূর্ণচন্দ্রের প্রবন্ধের ভাষা সরল ও সহজবোধ্য। দুরূহ শব্দ ও বাক্য যোজনা অথবা কৃত্রিম অলঙ্কার তাঁর প্রবন্ধকে কোথাও আড়ষ্ট করেনি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০—১৯২৬) বাংলা সাহিত্যে স্বপ্নপ্রয়াণের কবিরূপে বিখ্যাত হলেও তিনি বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট প্রবন্ধকাররূপেও পরিচিত। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধই দর্শন বিষয়ক—'তত্ত্ববিদ্যা', 'ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধন', 'গীতাপাঠ', 'নানাচিন্তা', 'প্রবন্ধমালা', 'চিন্তামণি' ইত্যাদি। প্রবন্ধ রচনায় তিনি যে রীতি ও ভাষা অবলম্বন করেছিলেন তা যেমন যুক্তিনিষ্ঠ সুশৃঙ্খল তেমনি প্রাঞ্জলতা গুণে সমৃদ্ধ। তাঁর গদ্যরীতি অপেক্ষাকৃত চলিত আদর্শ অনুসরণ করলেও কথ্যভাষা ব্যবহৃত হয়নি।

এই পর্বের আর একজন প্রবন্ধশিল্পী কালীপ্রসন্ন ঘোষ। (১৮৪৩—১৯১০) তিনি কাব্য, ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ রচনাতেই দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি যথাক্রমে 'প্রভাতচিন্তা', 'নিশীথচিন্তা', 'ছায়াদর্শন' ইত্যাদি। তাঁর প্রবন্ধে দুরূহ তত্ত্বের সঙ্গে কাব্যানুভূতি লক্ষ্য করা যায়। বিবৃতির পরিবেশন মাধুর্য, ভাষার বিশুদ্ধ কলাচাতুর্য ও উপযোগী দৃষ্টান্তের প্রাচুর্যে তাঁর সর্ববিধ প্রবন্ধই সমুজ্জ্বল।

বঙ্কিম বলয়ের অন্যতম খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩—১৯৩১) একজন নিষ্ঠাবান গবেষক ও অন্যতম শক্তিশালী প্রাবন্ধিকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। হরপ্রসাদ ধীমান নৈয়ায়িকের ন্যায় তীক্ষ্ণ যুক্তিপ্রবন্ধ ও সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিকের ন্যায় বিশ্লেষণপরায়ণ মনের অধিকারী ছিলেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, ধর্মনীতি, শিক্ষা ও বাঙালী সমাজের বিচিত্র জীবন পদ্ধতি অবলম্বনে লিখিত হরপ্রসাদের আলোচনা তাঁর অনন্যসাধারণ মনীষা ও বহুপ্রসারী অভিজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। হরপ্রসাদের প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থসমূহ যথাক্রমে—'ভারতমহিলা', 'প্রাচীন বাংলার গৌরব', 'বৌদ্ধধর্ম' প্রভৃতি তাঁর প্রবন্ধের অন্যতম আকর্ষণ হল প্রসাদ গুণান্বিত স্বচ্ছ সাবলীল ভাষা। হরপ্রসাদের প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নীরস, গুরুগম্ভীর বিষয় হলেও, প্রকাশভঙ্গীর সহজ রসিকতা সেগুলি আস্বাদ্যমান হয়ে উঠেছে। এই জাতীয় স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক ভাবশিষ্য।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা সহোদরা স্বর্ণকুমারী (১৮৫৫—১৯৩২) বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভ্রমণ ও আত্মকথা প্রসঙ্গে কিছু সংখ্যক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বঙ্কিম সমকালীন বিশিষ্ট প্রবন্ধকাররূপে বীরেশ্বর পাঁড়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে অধিকাংশ প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তাঁর 'উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ। তবে তাঁর প্রবন্ধে উদার সাহিত্য দৃষ্টি অপেক্ষা হিন্দুধর্মীয় রক্ষণশীল মনোভাবের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করলেও পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর শ্রম ও সাধনার বিস্ময়কর স্বাক্ষর মুদ্রিত করেছেন। তাঁর সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধের মধ্যে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের বিশেষত্ব এবং কাব্য সমালোচনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে 'সিরাজদৌল্লা' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও প্রামাণ্য রচনারূপে স্বীকৃতি

লাভ করেছে।

বঙ্কিমপর্বে আর একজন উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১—১৯০৩)। তাঁর একমাত্র প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থ 'সাহিত্যমঙ্গল'। ঠাকুরদাসের নিরপেক্ষ স্বভাব সুলভ সংযত বুদ্ধি, বিচার বিশ্লেষণপ্রবণ মনোভাব ও উদার সৌন্দর্যবোধ তাঁর প্রবন্ধগুলিকে বিশেষ মহিমা দান করেছে। এই কালের অন্যতম কৃতবিদ্য প্রাবন্ধিক ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থসমূহ যথাক্রমে—'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস', 'কবি বিদ্যাপতি' এবং 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালা'। প্রবন্ধগুলিতে ত্রৈলোক্যনাথের গভীর গবেষণা ও মার্জিত শিল্পসুষমার পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বোম্বাইচিত্র', 'বৌদ্ধ ধর্ম', 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস'—এই তিনটি গ্রন্থের মধ্যে শেষোক্তটি সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য। তাঁর রচনায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব আছে বলে মনে হয়। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বাংলা সাহিত্য ও সমালোচনার ক্ষেত্রে এক সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর সাহিত্য সমালোচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা এবং নির্ভীকতা। তিনি সংস্কৃতানুসারী সাধুভাষার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁর অধিকাংশ রচনায় বিদ্যাসাগরের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক গদ্যকাব্যোপন্যাস 'বিষাদসিন্ধু'র রচয়িতা মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭—১৯১২) বঙ্কিম-সমকালীন কৃতি লেখকদের অন্যতম। তাঁর প্রবন্ধ সাধারণতঃ ইতিহাস, ধর্ম, সমাজ ও জীবনচরিত অবলম্বনে লেখা হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধের ভাষা ও রচনারীতির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ প্রভাব অনুভূত হয়। তথাপি তাঁর রচনায় এক স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যও লক্ষ্য করা যায়। সহজ সাবলীল গতি ও তেজস্বিতা মশাররফের রচনাকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। তাঁর প্রণীত প্রবন্ধগুলি হল 'গো-জীবন', 'আমার জীবনী', 'হজরত বেলালের জীবনী'।

বঙ্কিম বলয়ের অন্তর্ভুক্ত প্রাবন্ধিকদের আলোচনা করে বোঝা যায়, বাংলা গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রাণময়তা ও রসপ্রবাহের গতি এনে দিয়েছিলেন, তা তাঁর বলয় অন্তর্ভুক্ত প্রাবন্ধিকরা শিল্পগত ও ভাবগত সমৃদ্ধির পথে ত্বরান্বিত করতে পেরেছিলেন। এক্ষেত্রে বঙ্কিম বলয়ের প্রাবন্ধিকরা বঙ্কিম-নির্দেশিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-ধর্মতত্ত্বভিত্তিক ও ইতিহাসচেতনা বিষয়ক রচনাদির অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বঙ্কিম বলয়ের অন্তর্ভুক্ত শিল্পীদের মধ্যে মৌলিক স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের নিজস্ব প্রতিভার প্রকাশের ক্ষেত্রেও সহায়তা করেছেন। অর্থাৎ এঁদের সামগ্রিক প্রয়াসের মধ্য দিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে যেমন আত্মস্থ হয়েছিলেন, অপরদিকে তেমনি ব্যাপ্ত হয়েছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রাবন্ধিকরূপে রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১—১৯৪১) নাম অবশ্যই স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী বিষয়গৌরবী ও আত্মগৌরবী এই দুইভাগে ভাগ করা চলে। বিষয়গৌরবী প্রবন্ধের মধ্যে আবার শ্রেণী বিভাগ লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালে 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায়।

তাঁর সমালোচনামূলক দীর্ঘ প্রবন্ধগুলি হল - ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী। উক্ত সমালোচনামূলক প্রবন্ধ তিনটিতে রবীন্দ্রনাথের যুক্তিধর্মী সমালোচনা ও রসবোধ সত্যই উল্লেখের দাবী রাখে। রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সমালোচনা। সমালোচনাটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৪ সালের শ্রাবণ থেকে ফাল্গুন সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ১২৯৪ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি পুনরায় 'মেঘনাদবধকাব্যে'র সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধ দুটিতে সাহিত্যতত্ত্বমূলক মহাকাব্য সম্বন্ধে তাঁর স্বচ্ছ ও যুক্তিপূর্ণ চিন্তাপদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মননধর্মিতা, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণশক্তি ও প্রাবন্ধিক সত্তার পরিচয় লক্ষ্য করা যায়।

১৮৭৬ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে রচিত প্রবন্ধ সংগ্রহে যে মননশীলতা, গভীরতা, তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও যৌক্তিকতার পরিচয় লক্ষ্য করা যায়, তা যে কোনো গীতিকবির পক্ষে ঈর্ষার বিষয়রূপে পরিগণিত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্য সম্পর্কে মন্তব্যকালে শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের একদিক' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন—'রবীন্দ্রনাথের গদ্য লেখার ভিতরে এক রকমের লেখা রহিয়াছে, তাহা ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা, শিক্ষা, সমাজ ও তৎকালীন রাজনীতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ-নিবন্ধ। এ জাতীয় লেখার পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। দ্বিতীয় প্রকারের লেখা সাহিত্য-সমালোচনা এবং সাহিত্য ও শিল্পের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। তৃতীয় তাঁহার জীবনস্মৃতি ও আত্মবিষয়ক অন্যান্য লেখা। চতুর্থ প্রকারের লেখা 'শান্তিনিকেতন' প্রকাশিত ধর্মের ব্যাখ্যান, ধর্মোপলব্ধি সম্বন্ধে ছোট ছোট অসংখ্য লেখা। পঞ্চম তাঁহার পঞ্চভূত। ইহা মুলতঃ রচনাসাহিত্য, তবে এইটি অভিনব কৌশলে রচিত। ষষ্ঠ তাঁহার খাঁটি সাহিত্যিক রচনা। 'বিচিত্র প্রবন্ধের' প্রায় সবগুলি লেখা এবং 'শান্তিনিকেতনে' প্রকাশিত কয়েকটি লেখা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সপ্তম তাঁহার কতকগুলি গদ্য রচনা যাহা তাঁহার গদ্য কবিতারই প্রাক্ রূপ। অষ্টম রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য। ইহার ভিতরে দেশবিদেশের ভ্রমণকাহিনী অবলম্বনে পত্রই বেশী। তবে বিবিধ বিষয়ক পত্রাবলীও কম নহে।"

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যের নিম্নোক্ত শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে—সাহিত্য সমালোচনা, রাজনীতি-সমাজনীতি শিক্ষা, ধর্ম-দর্শন আধ্যাত্মিকতা, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, ভ্রমণ কাহিনী ও ডায়েরী।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রসঙ্গ ও সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থগুলি যথাক্রমে প্রাচীন সাহিত্য (১৯০৮), সাহিত্য (১৯০৭), আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭),সাহিত্যের পথে (১৯৩৬), সাহিত্যের স্বরূপ (১৩৫০)। এই পুস্তকগুলিতে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন, আধুনিক ও বিদেশী সাহিত্য, সাহিত্যবস্তু, সাহিত্যতত্ত্ব সংক্রান্ত অনেক মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনায় ব্রতী হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় ভারতীয় সাহিত্যের তুলনায় পাশ্চাত্ত্য

সাহিত্যের গৌরব স্বীকার না করে প্রাচ্য সাহিত্যের মূল রহস্যের উৎস সন্ধানে অগ্রসর হয়েছেন। 'সাহিত্য' গ্রন্থে তিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও সৌন্দর্য দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

'সাহিত্যের পথে' সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ হলেও এখানে দার্শনিক তত্ত্বকথা ও উপনিষদিক তত্ত্ববাদ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচারকে অনেকখানি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের বাংলা ও বিগত যুগের পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যের বিশ্লেষণ করেছেন। 'লোকসাহিত্যে' আছে ছড়া ও কবিগান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক আলোচনা।

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি, সমাজনীতি ও শিক্ষা বিষয়ক আলোচনাগুলি সংকলিত হয়েছে তাঁর আত্মশক্তি (১৯০৫), ভারতবর্ষ (১৯০৬), শিক্ষা (১৯০৮), রাজাপ্রজা (১৯০৮), স্বদেশ (১৯০৮), কালান্তর (১৯৩৭), সভ্যতার সংকট (১৯৪১) প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে। রাষ্ট্র, শিক্ষা ও সমাজ সর্বক্ষেত্রেই তিনি মহৎ মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় যে কর্মপ্রবণতা, রাষ্ট্রনীতি ও স্বদেশচেতনা, শিক্ষাচিন্তা ছিল তা আলোচ্য গ্রন্থগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ কোনো বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের আচার-আচরণগত সীমাবদ্ধ তত্ত্বকে জীবনে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি। তিনি ঔপনিষদিক, বৈষ্ণব ও বাউলসাধনার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল জাতি-সম্প্রদায়হীন মানবধর্মে। তাঁর ধর্ম-দর্শনগত চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে ধর্ম (১৯০৯), শান্তিনিকেতন (১৯০৯-১৬), মানুষের ধর্ম (১৯৩৩) গ্রন্থে। শান্তিনিকেতন গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের গভীর, বিপুল প্রসারী চিন্তাধারা ও আত্মোপলব্ধি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব ও দার্শনিকতা শুধু মননের ক্ষেত্রেই সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, তাঁর জীবনের সঙ্গে চিন্তা ও দর্শন যেন এক হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বা আত্মগৌরবী প্রবন্ধের উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করতে হয় পঞ্চভূত, বিচিত্র প্রবন্ধ, লিপিকা প্রভৃতি গ্রন্থের। পঞ্চভূত (১৮৯৭), বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯০৭), লিপিকা (১৯২২) প্রভৃতি গ্রন্থে ক্ষণে ক্ষণে কবির ব্যক্তিসত্তার উদ্বোধন ঘটেছে। লিপিকার কিছু রচনা ছোটগল্পের অনুরূপ হলেও প্রবন্ধটির মূল সুর ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সমধর্মী। অবশ্য পঞ্চভূত ও বিচিত্র প্রবন্ধকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সমধর্মীরূপে গণ্য করতে হয়। পঞ্চভূত গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ পঞ্চভূতকে অবলম্বন করে জগৎ, জীবন, সৌন্দর্য, শিল্পতত্ত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

বিচিত্র প্রবন্ধ পাশ্চাত্ত্য জগতের স্টীল, অ্যাডিসন, গোল্ডস্মিথ, চার্লস ল্যাম্বের আদর্শে রচিত হলেও গ্রন্থটিতে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি, আবেগ ও দার্শনিক চিন্তাই প্রধান। রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের পটে, মনের বীণায় যে সুর বেজেছে তার অনেকাংশ যেন বিচিত্র প্রবন্ধে নানাভাবে ব্যক্ত। য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (১৮৮১), য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী (১৮৯১-৯৩), জীবনস্মৃতি (১৯১২), জাপানযাত্রী (১৯১৯), রাশিয়ার চিঠি (১৯৩১), পথের সঞ্চয় (১৯৩৯), ছেলেবেলা (১৯৪০), ছিন্নপত্র (১৯১২), চিঠিপত্র প্রভৃতি গ্রন্থে

রবীন্দ্রনাথের জীবনকথা ও ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। জীবনস্মৃতি কবির ব্যক্তিগত বাস্তব জীবন নহে, কবির জীবন-উপলব্ধির জন্য যে তত্ত্বের প্রয়োজন তাই এখানে বর্ণিত হয়েছে। ছিন্নপত্র রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন ও অন্তর্জীবনের উৎস। রাশিয়ার চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ রুশদেশে নবপ্রবর্তিত সমাজব্যবস্থার আলোচনা করেছেন। জাপানযাত্রী ও পথের সঞ্চয় গ্রন্থে ভ্রমণের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও জাতির নবপরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সুবিপুল প্রবন্ধ-সাহিত্য তাঁর মনীষা, প্রজ্ঞা-প্রতিভার ব্যাপকতা ও সুদূরপ্রসারী চিন্তাশক্তির পরিচয় প্রদান করে। তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্য সম্পর্কে শ্রীঅতুল গুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্য সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ। সাহিত্যের সমালোচনায়, কি রাষ্ট্র ও সামাজিক সমস্যার আলোচনায়, বাংলা কবিতার ছন্দবিচারে, কি বাংলা ব্যাকরণের রীতি ও বাংলা শব্দতত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে—সর্বত্র পড়েছে মহাকবির মনের ছাপ, সর্বত্র মহাকবির বাগ্‌বৈভব। বিচারে যুক্তির মধ্যে হঠাৎ এল উপমা। বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ান্তরের স্পর্শে অদ্ভুত ঐক্যের আলোর চমক পথ আলো করে দিল। * * * ভাষা ও প্রকাশকে অনুদ্বেজিত রেখে শ্রোতার মনে আবেগ সঞ্চারের যে কৌশল মহাকবির আয়ত্ত, তার দোলা এসব প্রসঙ্গে লেগেছে। * * * মহাকবির গদ্য, সুতরাং ভুলে কোথায় গদ্যগন্ধী নয়। ভাষা প্রয়োগের কলাকৌশল হয়েছে প্রচ্ছন্ন। কিন্তু ব্যক্ত হয়েছে এমন গদ্যে যা গদ্য লেখকের অসাধ্য। এরকম প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর সাহিত্যে দুর্লভ। যেমন দুর্লভ মহাকবির আবির্ভাব, তার চেয়েও দুর্লভ মহাকবির প্রবন্ধ রচনার প্রেরণা।"

রবীন্দ্র সমকালে রবীন্দ্রোত্তর পর্বে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিকরা হলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯), প্রিয়নাথ সেন (১৮৫৪), বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮), জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮), প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১), ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪), দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬), পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮), ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৮), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০), চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১), শশাঙ্কমোহন সেন (১৮৭২), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮), বিনয়চন্দ্র সরকার (১৮৮৭), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮) প্রমুখ।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা ভাষা, ভাষান্তরে বিড়ম্বনা প্রভৃতি প্রবন্ধে বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়সূচক আলোচনা করেছেন। প্রিয়নাথ সেন মূলত রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচক—তাঁর উল্লেখ্য প্রবন্ধগুলি হলো চিত্রাঙ্গদা, সনেট পঞ্চাশৎ ইত্যাদি। বিপিনচন্দ্র পাল ধর্ম-দর্শন-ইতিহাস-সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পকলা-সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র মূলত বিজ্ঞানী লেখক। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা ব্যতীত চরিতকথা, শব্দকথা, কর্মকথা, লক্ষ্মীর ব্রতকথা প্রভৃতি রচনা

করে বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। দীনেশচন্দ্র সেন মূলত বাংলা সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ রচনার জন্য বিখ্যাত। তাঁর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, রামায়ণী কথা, বৃহৎ বঙ্গ, ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালীর প্রত্নতত্ত্ব, বাঙ্গালীর জাতি পরিচয়, বাঙ্গালার উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থে বাঙালীচেতনার প্রকাশ লক্ষ্য-গোচর। 'বীরবল' নামে অধিক পরিচিত প্রমথ চৌধুরী চলিত ভাষার ব্যবহার, বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত বাগ্‌ভঙ্গির জন্য স্মরণীয়। তাঁর নানাকথা, রায়তের কথা, বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যবিষয়ক উত্তরচরিত, কাব্যে প্রকৃতি, জয়দেব প্রভৃতি গ্রন্থ ব্যতীত কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা, রবি বর্মা প্রভৃতি চিত্রবিষয়ক প্রবন্ধের রচয়িতা। চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ভারতশিল্প, বাংলার ব্রত, বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ, ভারতশিল্পে মূর্তি প্রভৃতি প্রবন্ধের রচয়িতারূপে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রাবন্ধিক। মোহিতলাল সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ রচনার জন্য স্মরণীয়। মোহিতলালের আধুনিক বাংলা সাহিত্য, সাহিত্য কথা, সাহিত্য বিচার, শ্রীমধুসূদন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'গভীর মর্মবোধ, বিশ্বসাহিত্যের নিগূঢ় জ্ঞান, বাঙালীর প্রাণরহস্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় এবং উপলব্ধির গভীরতা ও ব্যাপকতা মোহিতলালকে শৌখিন সমালোচক হইতে দেয় নাই; *** কিছু কিছু ব্যক্তিগত প্রবণতার গোঁড়ামি বাদ দিলে মোহিতলালকেই বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বিচারক বলিতে হইবে।'[১১] পরবর্তীকালে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুশীলকুমার দে, সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, নীহাররঞ্জন রায়, প্রমথনাথ বিশী, সুকুমার সেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রাবন্ধিকবৃন্দ কাব্যতত্ত্ব, ধর্মদর্শন, লোকসাহিত্য, সাহিত্যালোচনা, ইতিহাস, সংস্কৃতিমূলক প্রবন্ধ রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে নানাক্ষেত্রে বিকশিত করেছেন। আধুনিককালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অন্নদাশংকর রায়, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সাহিত্যের নানা বিষয় সম্পর্কে মননশীল আলোচনার সাহায্যে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের দিগন্ত উন্মোচিত ও প্রসারিত করেছেন। সাম্প্রতিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে কবিতার কথা, সাম্প্রতিক, জনসাধারণের রুচি, কালের পুতুল, রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য, এ আমির আবরণ, নিঃশব্দের তর্জনী, দ্বিতীয় ভুবন, দিকে দিগন্তরে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

২. (ক) সমালোচনা-সাহিত্য পরিচিতি:

1. 'The criticism of literature is often as entirely individual as the creation of literature, and as much the work of undeniable genius.'

—Abercrombie.

---

১১. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

2. 'They are the satelites which move round the poet, illuminating, transfiguring, distorting.'

—H. J. C. Grierson.

সাহিত্যবিচারের মূল কথা যদি মূল্যবিনিময় হয়, তাহলে সমালোচকের কাজ হলো সাহিত্যের ব্যাখ্যান, বিচার ও রসোপভোগের দ্বারা পাঠককে সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়া। সমালোচকের কাজ হলো সৃষ্টির তাৎপর্যকে পাঠকের গোচরীভূত করা। কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদির মূল তাৎপর্য, রস, শিল্পত্ব, স্রষ্টার ভাবনা ইত্যাদিকে পাঠকের কাছে প্রকাশিত করাই সমালোচকের কাজ। আর এই কাজ করতে গিয়ে সমালোচক তাঁর 'ব্যক্তিগত ভাললাগার ভাবোচ্ছ্বাস বা ভাল না লাগার নিরুচ্ছ্বাস নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন না; তিনি যথাসম্ভব নিঃস্পৃহ, নিরাসক্ত ও বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য বিচারে এমনভাবে প্রবৃত্ত হবেন যাতে পাঠকের সঙ্গে সাহিত্যের প্রাথমিক পরিচয় ঘটতে কোন বাধা, কোন আরোপিত নিয়মকানুনের বাঁধন না পড়ে।'[১২] সমালোচকের কাজ সাহিত্যের মূল্য বিচার করা হলেও, তিনি শুধুমাত্র বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন না, বিধানদাতার ভূমিকাতেও তাঁকে অবতীর্ণ হতে হবে। সেণ্ট বোভে মনে করেন, সাহিত্য সমালোচনা 'Should ameliorate Society by restoring morals, by promoting healthy tastes and by cultivating the best tradition.' সাহিত্যস্রষ্টার মূল্যবোধের বিচারও সমালোচকের কাজ। সমালোচকরা রচনাকারের উদ্দেশ্য আবিষ্কার করেন, পদ্ধতির আলোচনা করেন। সমালোচকগণ, Abercombie-এর ভাষায় 'discover the purpose; judge its worth, criticize the technique'. 'বিমুগ্ধ আত্মার শিল্পকাননে মানসাভিসারই হল সমালোচনার সারকথা'। সমালোচককে নিঃস্পৃহ, বস্তুর ইন্দ্রিয়ময় চেতনায় বিশ্বাসী, বস্তুচেতনার একতাবদ্ধকারী ও যৌক্তিক পারম্পর্যের আবিষ্কর্তা হতে হবে। যেকোনো বিচারপদ্ধতি মূলত বৈজ্ঞানিক বলে সমালোচনাও সেই অর্থে বৈজ্ঞানিক। সমালোচককে ব্যক্তিগত রুচি, প্রবণতা ও মানসিকতার ঊর্ধ্বে অবস্থান করতে হবে; তা না হলে সাহিত্যবিচার ব্যক্তিত্বের রঙে রঞ্জিত হবে। প্রত্যক্ষ সাহিত্যের দৃষ্টান্ত থেকে তাঁকে বিচারপ্রণালী নির্বাচন করতে হবে। সমালোচনার কালে দেশকাল ও যৌক্তিকতার প্রভাব মনে রাখতে হবে। কিন্তু তবুও মনে রাখতে হবে যে, সমালোচনা শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক বিচার পদ্ধতি নয়; সেখানে হৃদয়ের যোগ চাই। কেননা, সাহিত্য বিচার মূলত শিল্পবস্তু। সমালোচককে যুগে যুগে পুরাতনের মধ্যে নতুন নতুন রসরূপের সন্ধান করতে হয়। আসলে সমালোচনা বিজ্ঞান ও শিল্পের মিলিত রূপ। সেখানে আছে বিজ্ঞানের যুক্তিপারম্পর্য, আবেগ-শূন্যতা, বস্তুজ্ঞান আর শিল্পের সৃষ্টিক্রম, রসসৌন্দর্যের পরিচয়। সমালোচনা

১২. সমালোচনার কথা: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

মূল রসবস্তুর ব্যাখ্যা বলে মৌলিক সৃষ্টি নয়; তবে দ্বিতীয় সৃষ্টি। তবে কখনো কখনো এই দ্বিতীয় সৃষ্টি সৃষ্টিশীল রচনার পর্যায়ে উপনীত হয়। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের আর্নল্ড, ক্রোচে, কার্লাইল, এলিয়ট. প্রমুখের রচনার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ মোহিতলাল প্রমুখের রচনা সংগ্রহের উল্লেখ করা যেতে পারে। 'তাঁদের মত ও মন্তব্যের বৈশিষ্ট্য দার্শনিকতা, মানসিক উচ্চতা, বিস্ময়কর মনীষা,—সর্বোপরি রচনার শিল্পলক্ষণ এই সমস্ত সমালোচনাকে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেছে।'[১৩]

সমালোচককে দেশকালের মধ্যে যেমন থাকতে হবে, তেমনি আবার দেশকালের সীমার ঊর্ধ্বে উঠে ব্যক্তিগত বাসনা ও সংস্কারের পথ পরিত্যাগ করতে হবে। বিশেষ মানবিকতার জন্য সাহিত্যবিচার অনেক সময় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই সমালোচকদের গ্রীয়ার্সনের প্রবাদপ্রতিম সাবধান বাণীটি মনে রাখা উচিত—'Two tendencies the critic should fight against, though they are invincible, prejudice and dogmatism, the wish to pontificate. The first is that to which we older readers are disposed; our test is formed and a new phenomenon makes us not only uncomfortable but to often angry,' সুসমালোচকের গুণাবলী নির্দেশ করতে গিয়ে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সমালোচনার কথা' গ্রন্থে বলেছেন -'অন্ততঃ দশটি গুণ থাকলে সমালোচক সাহিত্য বিচারের দুরূহ ব্রতে বহুলাংশে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন: ১. ভূয়োদর্শন ২. আত্মসমালোচনা ৩. সতর্কতা ও পরমতসহিষ্ণুতা ৪. লেখকের প্রতি সহানুভূতি ৫. মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান ৬. দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি ৭. বিশ্লেষণ নৈপুণ্য ৮. যৌক্তিকতার প্রতি নিষ্ঠা ৯. নিঃস্পৃহতা ১০. লেখকের চিত্তভূমিতে অধিষ্ঠিত হবার স্বাভাবিক সামর্থ্য'।

সমালোচককে জগৎ, জীবন, দেশীয়, বিদেশীয় সাহিত্য সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। বিশ্বের সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডারের চাবিকাঠি আয়ত্তে থাকলেই সার্থক সমালোচক হওয়া যায়। অপরের সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমালোচনা ও আত্মবিশ্লেষণ না করলে অনেক সময় চিন্তার জড়তা দেখা দেয়। পরমতসহিষ্ণুতা রুচিসম্পন্ন সংস্কৃতিবান মানুষের বৈশিষ্ট্য বলে সমালোচকের মানসিক ঔদার্য সমালোচনাকে শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান করে তোলে। লেখকের প্রতি সমালোচকের সহানুভূতি অর্থাৎ সমপ্রাণতা না থাকলে সমালোচনা যথার্থ হতে পারে না। মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান সমালোচনার অন্যতম মানদণ্ড, কেননা, মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের দ্বারা সমালোচক লেখকের মনের সংবাদ সংগ্রহ করে রচনার পশ্চাদপেট ব্যাখ্যা করতে পারেন। সমালোচক যদি গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হন, তবেই তিনি 'কবিদৃষ্টির গভীরে সন্ধানী আলো নিক্ষেপ করে স্রষ্টার অন্তঃপুরে' গমন করতে পারেন। বিশ্লেষণ শক্তির আনুগত্য সমালোচকের

[১৩] সমালোচনার কথা : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্যতম গুণ। এই গুণের অভাব ঘটলে সমালোচক দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে গ্রন্থের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবেন না। যুক্তিনিষ্ঠা সাহিত্যবিচারের অন্যতম মানদণ্ড। যুক্তিনিষ্ঠা থাকলে মানসিক সংকীর্ণতা বা ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাবে না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্মরণীয়—'কাব্যে বা সাহিত্যে লেখক কি কথাটি বলতে চেয়েছেন তা সম্পূর্ণ করে শোনবার ক্ষমতা কোনও বিশেষ একজন সমালোচকের হাতে নেই। তাই একই কাব্য কত লোকে আপন মনে কত রকম করে বুঝেছে; সেই বোঝার সম্পূর্ণতা কোথাও বেশি কোথাও কম কোথাও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ, কোথাও অশুদ্ধ। প্রকাশের উৎকর্ষে যেমন তারতম্য উপলব্ধির স্পষ্টতাতেও তেমনি।' নিঃস্পৃহতা, নিরাসক্তচিত্ততা, নৈর্ব্যক্তিকতা থাকলে সমালোচক ব্যক্তিগত ভালোলাগা, মন্দলাগার ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ হতে পারেন এবং নিরাসক্ত ভাবদৃষ্টিতে অপক্ষপাত চিত্তের পরিচয় দিতে পারেন। নিরাসক্তচিত্তে বিচার বলতে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন, 'পূর্ব হইতে একটি অমূলক প্রত্যাশা ফাঁদিয়া রাখিয়া তাহা পূর্ণ হইল না বলিয়া লেখকের প্রতি দোষারোপ করা বিবেচনা সঙ্গত নহে।' সমালোচকের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য লেখকের চিত্তভূমির উপর সমালোচকের অধিকার স্থাপন করা। লেখকের অনুরূপ কল্পনাশক্তি ও দিব্যদৃষ্টি থাকা চাই। সমালোচক যদি প্রকৃত রসদৃষ্টির ও কল্পনাশক্তির অধিকারী হন, তবে সাহিত্যের মর্মস্পন্দন অনুভব করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে। সর্বোপরি চাই, রসজ্ঞান, রসাত্মক বাক্যকেই কবিতা বলা হয়েছে এবং কবিতার রস কবি সমালোচকের উপলব্ধি করা সম্ভব—'কবিতা রস মাধুর্যং কবির্বেত্তি ন তৎ কবি'। একথা শুধু কবিতা বিচারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। সাহিত্যের যে কোনো শাখার বিচারের ক্ষেত্রে সমালোচককে রসজ্ঞানী হতে হবে—নাহলে সমালোচনার উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

সমালোচনার রীতি, পদ্ধতি, প্রকৃতি ও প্রকরণ অনুযায়ী সমালোচনা নানা রকমের হতে পারে। সেই নানা প্রকারের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো—

১. ব্যক্তিপন্থী সমালোচনা—এখানে সমালোচকের ব্যক্তিগত অনুভূতির কথাই প্রধান। গ্রন্থপাঠের পর সমালোচকের মনের অভ্যন্তরে উত্থিত নানা ভাবানুষঙ্গের উপর ব্যক্তিপন্থী সমালোচক গুরুত্ব আরোপ করেন।

২. আপেক্ষিক সমালোচনা—সাহিত্যের চিরজীবী আদর্শের পরিবর্তে এখানে যুগ ও ব্যক্তিভেদে সাহিত্যের মূল্য নিরূপণের চেষ্টা করা হয়।

৩. বৈধী সমালোচনা—যে সমালোচনায় নিয়মানুগত্য অধিক এবং সমালোচক নীতি-নিয়মের অনড়তাকে মুখ্য বলে মনে করেন সেখানে সমালোচনা বৈধী সমালোচনা।

৪. ভাষ্যমূলক সমালোচনা—এই জাতীয় সমালোচনায় সমালোচক ব্যাখ্যার প্রদীপে সাহিত্যশিল্পের আরতি করেন। 'বৃহৎ শিল্প কর্মের সামনে দাঁড়িয়ে সমালোচক মুগ্ধ বিস্ময়ে তার বিরাট স্বরূপ বুঝবার চেষ্টা করেন, তার কলাকৃতি ও বক্তব্যবিষয়ের বিচিত্র ঐশ্বর্য ব্যাখ্যা করে ধন্য হন, পাঠকের সঙ্গে মহৎ সাহিত্যের পরিচয় করিয়ে

দিয়ে পবিত্র কর্তব্য সমাধা হল বলে মনে করেন।'

৫. যুক্তিপন্থী সমালোচনা—যুক্তিপন্থী সমালোচনায় বৈজ্ঞানিক রীতির দ্বারা সমালোচক নানা গ্রন্থ পরীক্ষার সাহায্যে একটি বিচারপদ্ধতি গড়ে তোলেন।

৬. তুলনামূলক সমালোচনা—অপেক্ষাকৃত আধুনিক এই জাতীয় বিচার পদ্ধতির মাধ্যমে দেশীয়-বিদেশীয়, জাতীয়-আন্তর্জাতিক সাহিত্য ও চরিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের শকুন্তলা, মিরান্দা ও দেসদিমোনার আলোচনা এবং রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা টেম্পেষ্ট-এর আলোচনা তুলনামূলক সমালোচনার অন্যতম উদাহরণ।

৭. ঐতিহাসিক সমালোচনা—এই জাতীয় সমালোচনায় সমালোচকের দৃষ্টি প্রধানত ইতিহাস ও পটভূমিকায় নিবদ্ধ থাকে। ইতিহাস, সমাজ, অর্থনীতি ইত্যাদির প্রভাবে পরিবর্তিত সাহিত্যধারার কথা বলা হয়। দ্বান্দ্বিক বস্তুদর্শনের সাহায্য সৃষ্ট বিচার পদ্ধতিতে সাহিত্যের সামাজিক প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এছাড়া জীবনীমূলক, ভাষাতাত্ত্বিক ইত্যাদি নানা সমালোচনাও হতে পারে। সম্প্রতি নব্যসমালোচনা বা নব্যঅবয়ববাদ সমালোচনার উদ্ভব হয়েছে। 'নব্য অবয়ববাদী সমালোচনা হল বিশেষভাবে সমকাল লয়ে বাঁধা শিল্পকৌশল ও শিল্পকর্মের অন্তর্নিহিত অবয়বের অনুপুঙ্খ পরীক্ষা, অবয়বের বিশেষত্ব নির্ধারণকর্ম।'[১৪] শৈলীবিজ্ঞান বা স্টাইলিষ্টিকস-এর কথাও এ প্রসঙ্গে আসবে। এটি হল ভাষাবৈজ্ঞানিক রূপান্তরকর্ম। ভাষাবিজ্ঞান, শৈলীবিজ্ঞান ও সাহিত্য আলোচনার পারস্পরিক সম্পর্ক সমালোচনা-বিজ্ঞানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত।

সমালোচনার বিভিন্ন রীতি অনুযায়ী যেমন প্রকারভেদ ঘটে, তেমনি সমালোচকদের মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী তাঁদেরও নানাভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১. ভাববাদী ও নীতিবাদী সমালোচক একটি আদর্শ, সামাজিক ও নীতিঘটিত আদর্শের দ্বারা সাহিত্যমূল্য বিচার করেন। নীতিবাদী সমালোচক সাহিত্যের মাধ্যমে নীতি প্রচারকেই মুখ্য বলে মনে করেন।

২. বাস্তববাদী সমালোচক সাহিত্যে প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিফলনকেই একমাত্র সত্য বলে মনে করেন। 'ফর্ম' অপেক্ষা বিষয়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

৩. বস্তুবাদী সমালোচক চৈতন্যকে অস্বীকার করেন এবং চেতন-অচেতন সমস্ত কিছুকেই বস্তুর রূপান্তর বলে মনে করেন। সাহিত্য সৃষ্টির পটভূমিকায় ব্যক্তিসত্তাপেক্ষা বস্তুসত্তাকেই তাঁরা অধিক ক্রিয়াশীল বলে মনে করেন।

৪. ভবিষ্যবাদী সমালোচকের মতে 'শব্দের অর্থপ্রতীকের বন্ধনমোচন সবচেয়ে বড় কথা।' [ইংরেজীতে একে Futurism বলে, এই মতবাদের আবির্ভাব হয় ১৯০৯ খ্রীঃ]।

১৪. সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান: অশিসকুমার দে।

৫. প্রকাশবাদী সমালোচক (প্রকাশবাদ Expressionism) মনে করেন যে, বস্তুধর্ম ও যৌক্তিকতার প্রচলিত নিয়মবদ্ধ প্রত্যয়ের জগতে ভাবরূপের যথাযথ প্রকাশ ঘটে না; বস্তুর স্বরূপসন্ধানী হয়ে তাঁরা বস্তুর মৌলচেতনাকে বিকল্প জগতে মুক্তি প্রদানে সচেষ্ট।

৬. ১৯শ শতকের শেষভাগে আবির্ভূত ইমপ্রেসনিষ্টরা মনে করতেন—'সংহত, সুবিহিত, সুপরিকল্পিত শব্দকল্পের সাহায্যে কল্পনাবাণী চিত্রকল্পকে' যথাযথভাবে প্রকাশ করা যায়।

৭. ডাডাবাদী (ডাডাবাদ—Dadaism) সমালোচকের মতে, 'বস্তুস্বরূপ, মনোজাত বস্তুচৈতন্য এবং তাকে প্রকাশ করবার ভাবানুষঙ্গ ও ভাষাপ্রতীক' এরা পরস্পর সম্পর্কবিহীন।

৮. পরাবাস্তববাদী (পরাবাস্তববাদ—Surrealism) সমালোচক মনে করেন—'প্রত্যহ আমাদের যে চৈতন্য বস্তুজগতের সঙ্গে কারবার করে, ভাষার সাহায্যে বস্তুর ভাবপ্রতীক গড়ে তোলে, সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যবিচারে তা যথেষ্ট নয়। এই মতে বস্তুচৈতন্যে স্বপ্নানুষঙ্গ ও অবচেতন সত্তার অধিকতর প্রাধান্য, এবং বাস্তব ভাবপ্রতীকের সাহায্যে বস্তুস্বরূপ প্রকাশ করা যায় না, বস্তুর সেই আসল বস্তু স্বরূপ প্রকাশের জন্যই স্বপ্নপ্রতীকের প্রয়োজন। বাস্তবগ্রাহ্য যুক্তিপরম্পরা বস্তুর স্বধর্মকে কিছুতেই ফুটিয়ে তুলতে পারে না।'[১৫] পরাবাস্তববাদী সমালোচক সাহিত্য বিচারে অবচেতন মনের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং ভাবানুষঙ্গ বিচারে অস্পষ্ট প্রতীক বা চিত্রের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

৯. অস্তিবাদী সমালোচক মানুষের অস্তিত্বকে কার্যকারণাত্মক বলে মনে করেন না; মানুষ শুধু 'সৎ' (Exists) এবং 'ঘটমান' (Becoming)। মানুষ আত্মৈষণার জন্য পরিবেশের বাইরে গিয়ে স্বীয় অস্তিত্ব ঘোষণা করে।

১০. ব্যবহারবাদী সমালোচক মানুষের প্রয়োজনে লাগাকেই সাহিত্যের একমাত্র কাজ বলে মনে করেন।

১১. সৌন্দর্যবাদী সমালোচক বাস্তবপ্রয়োজনহীন সৌন্দর্য সৃষ্টি সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করেন।

১২. জীবনবাদী সমালোচক মনে করেন—'Art for lifes sake' নীতি বা সৌন্দর্য বা তত্ত্ব নয়; মানবজীবনই সাহিত্যের একমাত্র বিষয়বস্তু।

১৩. বিষয়বাদী সমালোচক সাহিত্যের বিষয় উপাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

১৪. রূপবাদী সমালোচক মনে করেন, প্রকাশই সাহিত্যের মূল; প্রকরণকেই তাঁরা সাহিত্যের কেন্দ্র বলে মনে করেন। প্রকাশই সাহিত্য—Expressiom is literature—এই মতবাদে রূপবাদী সমালোচক বিশ্বাসী।

১৫ সমালোচনার কথা: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৫. রসবাদী সমালোচক মনে করেন—নিজের আনন্দময় সম্বিতের আস্বাদনরূপ ব্যাপারে, রসনিষ্পত্তিতে সাহায্য করাই হল সাহিত্যের কাজ। আলোচ্য মতে ভারতীয় আলংকারিকরাই বিশ্বাসী।

(খ) বাংলা সমালোচনা সাহিত্য ঃ

বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকীয় নবজাগরণের সঙ্গে আধুনিক বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের যোগ অচ্ছেদ্য বলা চলে। রামমোহন বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের রচনায় এবং সংবাদ প্রভাকর জ্ঞানান্বেষণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের জয়যাত্রা সুরু হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে কেন্দ্র করে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় যে লেখকগোষ্ঠি আবির্ভূত হয় সেখানে সমালোচনার একটি পরিমণ্ডল লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের যথাযথ সূচনা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায়। সেখানে বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, রামনারায়ণ, রঙ্গলাল, মধুসূদন, দীনবন্ধু প্রমুখ গ্রন্থকারবৃন্দের গ্রন্থসমালোচনা দেখা যায়। বেথুন সোসাইটিতে বক্তৃতার উদ্দেশ্যে লিখিত বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩) এবং রঙ্গলালের 'বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ' (১৮৫৪) বাংলা সাহিত্যে প্রথম যথার্থ সমালোচনা। এই প্রবন্ধ দুটিতে সাহিত্যের রূপ রীতি তত্ত্ব ইত্যাদির যৌক্তিকতা ও সার্থকতা সম্পর্কিত আলোচনা হয়। রঙ্গলাল 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৫৫৮) কাব্যের ভূমিকাতেও আলংকারিক আলোচনা করেন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' রাজেন্দ্রলাল মিত্র মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' ও 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যের' গ্রন্থসমালোচনা করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ উক্ত পত্রিকাতেই 'মেঘনাদবধকাব্য সমালোচনা' লেখেন। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যের' সমালোচনা প্রকাশ করেন। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'মেঘনাদবধকাব্যের' ভূমিকা লিখতে গিয়ে একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখেন।

১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হলে বাংলা সমালোচনা ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূত্রপাত হয়। ১৮৭২—৭৮ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরচরিত, গীতিকাব্য, বিদ্যাপতি ও জয়দেব, শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেসদিমোনা ইত্যাদি প্রবন্ধে সমালোচনার একটি মানদণ্ড স্থির করে দেন। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকাকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লিখেছেন—'রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিমচন্দ্র একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গ সাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।' সমকালে প্রকাশিত 'প্রচার', 'সাধারণী', 'নবজীবন' প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি সমালোচক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। বঙ্কিম-সমকালে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, পূর্ণচন্দ্র বসু প্রমুখের নাম করা চলে।

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান পুরুষ 'রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাঁর উজ্জ্বল সৃজনধর্ম। তিনি Synthetic রীতির সমর্থক তো বটেনই, মাঝে মাঝে creative-ও হয়ে ওঠেন। আলোচ্য কাব্যকে গ্রহণ করে তার স্বরূপ সৌন্দর্যের ব্যাখ্যানে সীমাবদ্ধ না থেকে, আপনার বর্ণে তাকে অনুরঞ্জিত করে নবতর সৃষ্টিলোকে তিনি উত্তীর্ণ হতে চান।'[১৫] রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ গ্রন্থ তিনটিতে সমালোচনার মূল নীতি ও আদর্শ আলোচিত হয়েছে। প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থে প্রাচীন কাব্যাদির আলোচনায় কাব্যের অন্তর সৌন্দর্য আবিষ্কারের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসমালোচনার পদ্ধতি সর্বত্র অনুসরণযোগ্য না হলেও, তাঁর শিল্পবোধ, সৌন্দর্য উপলব্ধির ক্ষমতা, সংজাত রসবোধ ও বহু অধ্যয়নজাত পরিশীলিত মন সমালোচনার এক উচ্চাদর্শ স্থাপন করেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থের রামায়ণ প্রবন্ধে সমালোচনার যে নবতম তত্ত্বের অবতারণা করেছেন সেইখানেই সমালোচক রবীন্দ্রনাথ যথার্থভাবে প্রতিভাসিত… 'পূজার আবেগ মিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা, এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। আমাদের আজকালকার সমালোচনা বাজার দর যাচাই করা…। এরূপ যাচাই ব্যাপারের উপযোগিতা অবশ্য আছে, কিন্তু তবু বলিব যথার্থ সমালোচনা পূজা. সমালোচক পূজারী পুরোহিত, তিনি নিজের অথবা সর্বসাধারণের ভক্তিবিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র।' বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুধীরকুমার দাশগুপ্ত প্রমুখ ভারতীয় অলংকারতত্ত্বের ধারাটিকে মূল বলে মনে করেছেন। অন্যদিকে মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ সেনগুপ্ত প্রমুখ সমালোচকবৃন্দ উনিশ শতকীয় ইউরোপীয় সমালোচনাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। প্রমথনাথ বিশীর সমালোচনা বিশ্লেষণাত্মক হলেও রসবোধ অনুপস্থিত নয়। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকগণ সমকালীন ইউরোপীয় জীবনাদর্শ ও শিল্পবিচার প্রসঙ্গে অনেক অভিনবত্বের আমদানী করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর রোমান্টিক ও ব্যক্তিক সমালোচনা পদ্ধতি, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মননধর্মী সাহিত্য বিচার পদ্ধতি, বিষ্ণু দে-র বহু পঠন পাঠন বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে নতুন অধ্যায় যোজনা করেছে। মার্কসবাদী সমালোচকরূপে গোপাল হালদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ পোদ্দার প্রমুখ বাংলা সমালোচনা সাহিত্যকে যথেষ্ট উন্নত করেছেন। আবু সয়ীদ আইয়ুবের সমালোচনায় শতাব্দীর সামগ্রিকতা লক্ষ্য করা যায়। শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ সমালোচকবৃন্দ বুদ্ধদেবীয় সমালোচকসত্তার সঙ্গে স্বরূপ্য বোধ করেন এবং শাস্ত্রনির্ধারিত সমালোচনা ও গৃহীত সূত্রব্যাখ্যার পথ পরিত্যাগ করে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে নবতম অধ্যায় সংযোজনায় সচেষ্ট ও কৃতবিত্তও বটে।

১৫. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস : ক্ষেত্র গুপ্ত।

৩। প্রাবন্ধিক পরিচিতি :

॥ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥

আধুনিক যুগে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার অন্যতম অগ্রণী পুরুষ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০—১৯৭৭) শুধুমাত্র ভাষাতত্ত্ববিদ্ রূপেই খ্যাতিমান নন, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রাবন্ধিকরূপেও তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। ভাষাবিজ্ঞানে তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবের পুনরুজ্জীবন ঘটালেও, সেখানে অন্ধ ধর্মীয় দৃষ্টির প্রয়োগ ঘটেনি, নবযুগের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির মোহমুক্তি নিয়ে তিনি তার বিচার ও মূল্যায়ন করেছেন। সুনীতিকুমার জীবনের সূচনাপর্বেই পাশ্চাত্যদৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করায়ত্ত করেছিলেন। বৈদিক সংস্কৃত পাঠকালে তিনি প্রাচ্য সংস্কৃতির মূল উৎসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তাছাড়া, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য তাঁর হৃদয়ে মানবিকী বিদ্যার যে চিরন্তন রূপটির বিকাশ ঘটিয়েছিল, সেখানে ছিল মানবপ্রেমিক হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ ও সর্বতোভদ্র বিশ্ববীক্ষার বিকাশ। বিশ্বতোমুখী জ্ঞানতৃষ্ণা ও স্বদেশ সমাজের স্বভাষার প্রতি পরম মমত্ববোধবশত তিনি বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ব্যাকরণ সম্পর্কে গবেষণায় ব্রতী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিস্তৃতাকারে লিখিত তাঁর The Origin and Development of the Bengali Language গ্রন্থে তিনি রেখে গেছেন 'বাঙালী জাতির সাহিত্য সংস্কৃতির আধার তার চিরগর্বের মাতৃভাষার জন্ম-পরিচয় ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ।' কিন্তু শুধু ভাষাবিজ্ঞানী বললে তাঁর প্রতিভার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় দেওয়া যাবে না। তিনি ভাষাবিজ্ঞান ব্যতীত সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের প্রায় সমস্ত শাখাতেই স্বীয় প্রতিভার পরিচয় মুদ্রিত রেখেছেন। একজন প্রকৃত মানবতাবাদীর ন্যায় তিনি মানুষের সর্বপ্রকারের ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি অপার আকর্ষণ বোধ করতেন এবং সর্বাঙ্গীণতাকে জীবনের বিকাশের সর্বক্ষেত্রে আকর্ষণ করেছিল। মানুষের বিচিত্র সৃষ্টিকর্মের প্রতি আকর্ষণ তাঁকে জানা-অজানা ভাষাগোষ্ঠীর বিশাল প্রান্তরে নিয়ে গেছে। সুনীতিকুমার জ্ঞান সাধনার বৈচিত্র্যে বিশ্বমানবিকতার এমন এক স্তরে উপনীত হয়েছে যা দেশে কালে ইতিহাসে ভূগোলে ধর্মে সম্প্রদায়ে খণ্ডিত নয়, জ্ঞানের অবিভাজ্য গৌরবে যা মণ্ডিত। তিনি কেল্টিক, ইতালীয়, জারমানিক, বাল্‌তিক, চীনা, জাপানী, মোঙ্গল, বর্মী ইত্যাদির সমাজ সাহিত্য নৃতত্ত্ব সম্পর্কে যেমন আগ্রহী ছিলেন, তেমনি কোল, ভীল, কিরাত, জুলু, বান্টু, হটেনটট্, মায়া সভ্যতা সম্পর্কেও সমান আগ্রহী ছিলেন। ভাষাতত্ত্ব ব্যতীত তিনি ধর্ম উপধর্ম, ভক্তিবাদ, মরমীয়া সাধনা ইত্যাদি সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ধর্মানুশীলন সম্পর্কে নানা আলোচনা করলেও, তিনি কঠোর যুক্তিবাদী। শেষ জীবনে রচিত 'রামায়ণ'-এর উৎস সম্পর্কে তাঁর রচনা বিতর্কের সৃষ্টি করলেও, তিনি যুক্তিকে সারবস্তু মনে করেছিলেন; ফলে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেননি। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে

সুনীতিকুমার মালয়, সুমাত্রা, বলিদ্বীপ ও শ্যামদেশ ভ্রমণ করেন। সেই ভ্রমণের অনুপুঙ্খ বিবরণ 'দ্বীপময় ভারত' নামে প্রথমে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীকালে 'রবীন্দ্র সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর ইউরোপ ভ্রমণের বিবরণ প্রকাশিত হয় 'পশ্চিমের যাত্রী' গ্রন্থে। ১৯৩৮ সালে ইউরোপ ভ্রমণকাহিনী 'ইউরোপ ১৯৩৮' নামে দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়। 'জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য' গ্রন্থে তাঁর নানাজাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কিত সমৃদ্ধ আলোচনার প্রকাশ আছে। 'সাংস্কৃতিকী' সুনীতিকুমারের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ। নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে তাঁর লেখা 'পথচলতি' বেশ উপভোগ্য।

বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচনা করলেও ভাষাবিজ্ঞানীরূপে স্মরণীয় সুনীতিকুমারের ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থগুলি হলো—ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, A Brief sketch of Bengali phonetics, বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, ভারতের ভাষা সমস্যা, বাঙ্গালা ভাষা প্রসঙ্গে ইত্যাদি। ভাষাচিন্তা ব্যতীত আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মনীষার পরিচয় পাওয়া যায় Languages and Literature of Modern India গ্রন্থে। মূলত ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতিকুমার যে সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন, তার কারণ তাঁর দৃষ্টিতে ভাষা খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্ন একটি অস্তিত্ব নয়।

ভ্রমণকাহিনী রচনায় সিদ্ধহস্ত সুনীতিকুমারের 'ভ্রমণ কাহিনীগুলি যুগপৎ ভ্রমণতথ্য ও রচনাসাহিত্যের সমন্বয়। দেশ-বিদেশ ভ্রমণের সময় তিনি শুধু চোখ মেলে অজানা দেশ ও অজ্ঞাত পরিচয় মানুষকে দেখেননি, মনটিকেও খোলা রেখেছিলেন। সেই মনের ফলকে কত তথ্য ও তত্ত্ব ভিড় করেছে, কোনো কোনোটি বিচার-বুদ্ধি ও চিন্তার ফসলে পরিণত হয়েছে। ভাষা কোথাও গুরুগম্ভীর ব্যাখ্যামূলক, কোথাও বা সহজ চলতি জীবনের পটভূমিকায় মুখর'।[১] সুনীতিকুমারের শেষ পর্যায়ের রচনা 'জীবনকথাকে' স্মৃতিকথা জাতীয় রচনা বলা যেতে পারে। 'আমার ছেলেবেলার কথা' ও 'শৈশব স্মৃতিতে' সুনীতিকুমারের বাল্যজীবনের কাহিনী প্রকাশিত; স্মৃতি-বিস্মৃতির পটে লেখক নিজের হারানো-কালের স্মৃতিচারণায় মুখর। তার 'জীবনকথা'-য় অন্তর্জীবনের স্বরূপ অভিব্যক্ত। ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যুগপৎভাবে সুনীতি-কুমারের এই যে ভারতীয় ও বিশ্বসংস্কৃতির বিশ্লেষণ তার পেছনে যেমন প্রাচীন ভারতীয় ভাষা-সাহিত্য সংস্কৃতির জগৎ ক্রিয়াশীল, তেমনি ক্রিয়াশীল ঐস্লামিক উপাদানের সঙ্গে আরবী-ফারসী সাহিত্য সংস্কৃতির জগৎ এবং ইউরোপীয় সাহিত্য সংস্কৃতির জগৎ। সুনীতিকুমার প্রকৃত অর্থে 'বিশ্বমনা' এবং তাঁর সেই বিশ্বমনন বাংলা প্রবন্ধকে সমুন্নত করেছে।

।। গোপাল হালদার ।।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রাবন্ধিক গোপাল হালদার (১৯০২) বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী। বিবেকানন্দের 'অভীঃ' মন্ত্রে আর বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে কৈশোরেই দীক্ষিত গোপাল হালদার রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ সমাজের' চিন্তায় মুক্তির পথ অন্বেষণে রত থাকলেও শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, আত্মজিজ্ঞাসায় অস্থির গোপাল হালদার সর্বকালের সর্বমানবের মুক্তির জন্য মার্কসীয় দর্শনকেই সত্য বলে মনে করেছেন। প্রথম জীবনে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় রত থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি বিচিত্র পথে চরণচারণা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতির রূপান্তর, বাজে লেখা, এ যুগের যুদ্ধ, বাঙালী সংস্কৃতির রূপ, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, বাংলা সাহিত্য ও মানবস্বীকৃতি, সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা, বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষা ইত্যাদি। তাছাড়া তিনি উপন্যাস ও আত্মজীবনী-মূলক, আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থের রচয়িতারূপেও খ্যাতিমান হয়ে আছেন। তিনি 'বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপরেখা' গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর সমালোচনার মূল বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন—'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস মূলতঃ বাঙলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি অঙ্গ এবং বাঙালীর ইতিহাসেরই একটি শাখা'। এই মূল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় নিরত হয়েছেন। 'বাংলা সাহিত্য ও মানবস্বীকৃতি' গ্রন্থে তিনি আধুনিক সাহিত্য, বাঙলা সাহিত্য ও স্বাধীনতার প্রেরণা, বঙ্কিমসমস্যা, রবীন্দ্রকাব্যে মানবস্বীকৃতির রূপ আলোচনা প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ, আধুনিক বাঙলা ছোটগল্প ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আধুনিক সাহিত্যের মূল প্রকৃতি কী এবং বাংলা সাহিত্যে তার প্রকাশই বা কীভাবে হয়েছে—ইত্যাদি গোপাল হালদারের আলোচিত বিষয়। তিনি বিশ্বসংস্কৃতি ভারতীয় ও বাঙালী সংস্কৃতির রূপ সম্পর্কে বহু আলোচনা করেছেন এ বিষয়ে তাঁর স্মরণীয় প্রবন্ধাবলী হলো—সংস্কৃতির গোড়ার কথা, ইতিহাসের ভূমিকা, বিজ্ঞানের জগৎ, বাঙালী সংস্কৃতির রূপরেখা, বাঙালী মুসলমান ও মুসলিম কালচার, বাঙালী সংস্কৃতির সংকট, বাঙলার ভাষা সমস্যা, বাঙলার বাস্তব রূপ ইত্যাদি। সংস্কৃতি জিজ্ঞাসার জন্যই গোপাল হালদার স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। গোপাল হালদার লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীরূপে সুপরিচিত। তিনি ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর পরিপ্রশ্নবৃত্তি তাঁকে নতুন চিন্তা ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর রূপান্তরিত মনের ফসল হলো তাঁর সংস্কৃতি জিজ্ঞাসা। গোপাল হালদার প্রগতি লেখক সংঘে যোগদান করে তাঁর ফ্যাসিজম্ বিরোধী ভূমিকা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে পালন করেছেন, তিনি ঐতিহাসিক বা পরিবেশগত কোনো দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন গ্রহণ করে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য-সংস্কৃতি সমাজজীবন ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তিনি অবশ্য মার্কসবাদের যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন না। সংস্কৃতি-সাহিত্য ইত্যাদি বিচারে গোঁড়ামির

প্রশ্রয় না দিয়ে তিনি মুক্তমনা আধুনিক মননের পরিচয় দান করেছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন—'সংস্কৃতির বনিয়াদ তাহার আর্থিক অবস্থায়। কিন্তু কেহ যেন মনে না করে আর্থিক অবস্থাই সংস্কৃতির একমাত্র ব্যাখ্যা। মূলত; তাহা প্রধান বস্তু কিন্তু একমাত্র বস্তু নয়। বাস্তব ও আধ্যাত্মিক আরও অনেক শক্তি আছে। লেখক মনে করেন যে বাস্তব উপকরণ, সামাজিক রূপ ও মানস সম্পদ পরস্পর অচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ; তাই সাহিত্য-সংস্কৃতি মানবসভ্যতার সামগ্রিক রূপ'। তিনি সাহিত্যের আলোচনাকে ইতিহাসের এই ধারাপথে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। সাহিত্য-সংস্কৃতি বিচারের ক্ষেত্রে তিনি বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক বিচারের পক্ষপাতী। বিজ্ঞানের বিচিত্রমুখী বিকাশও যে সামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত তাও লেখক আলোচনার সাহায্যে প্রতিপাদন করেন। বাঙালী তার সাহিত্য সাধনায়, ধর্মান্দোলনে, চিত্রকলা ও সঙ্গীতে, বিজ্ঞান ও ইতিহাস চর্চায় সর্বত্রই এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে—গোপাল হালদার একথা যথার্থভাবে পাঠককে জানাতে ভোলেন না। সংস্কৃতি ও ধর্ম যে এক বস্তু নয় একথা জানাতেও তিনি বিস্মৃত হন না—'কাল্‌চার ও রিলিজিয়ন এক নয়; বরং সম্পর্কিত হলেও দুটি ভিন্ন প্রকৃতির জিনিষ। রিলিজিয়নের লক্ষ্য হল তাই সৃষ্টি নয়, স্থায়িত্ব, তাই সে হল স্থিতিধর্মী, কিন্তু কালচার তো গতিধর্মী।'

গোপাল হালদার বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে সৃষ্টিশীল প্রাবন্ধিক ও সমালোচকরূপে খ্যাতিমান হয়ে আছেন। তাঁর বাক্যবন্ধ সংক্ষিপ্ত, তিনি বাক্যপ্রয়োগের দ্বারা বিষয়বস্তুকে অযথা ভারাক্রান্ত করেন না। অপ্রচলিত তৎসম শব্দের ব্যবহারও তাঁর প্রবন্ধে লক্ষ্য করা যায় না। তবে তথ্যভারে তাঁর প্রবন্ধ আক্রান্ত। অবশ্য তাঁর সংস্কৃতিও ইতিহাসবিষয়ক প্রবন্ধগুলি তথ্য ভারাক্রান্ত হলেও, প্রবন্ধগুলিতে রমণীয়তা, স্বাদুতা ইত্যাদিও অনুপস্থিত নয়। তাঁর সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনাগুলি সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ হলেও মৌলিকতার সিদ্ধিতে দীপ্যমান। কত সংক্ষিপ্ত বাক্যবন্ধে তিনি সাহিত্যের মৌলিক রূপটি প্রকাশ করেন নিম্নোক্ত বাক্যাংশটি তার প্রমাণ বহন করে—'সুধীন্দ্রনাথ মৌনব্রত নিলেও বুদ্ধদেব বসু কবি হিসাবে অকৃপণ, নরেশ গুহ তাঁর পশ্চাতে অক্লান্ত। জীবনানন্দ দাশ স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গে সমরূপে কাব্যধর্মনিষ্ঠ। বিষ্ণু দে স্বকীয় সাধনায় অনলস—যদিও তিনি কখনও সাধারণ পাঠকের নিকট সহজবোধ্য হবেন না।' কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে গোপাল হালদার আশাবাদী; তিনি বিশ্বাস করেন—'কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে এখনও নতুন সৃষ্টির ইঙ্গিত আছে।' বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও তাঁর দ্বারা প্রশংসিত। জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে আস্থাশীল ও প্রত্যাশাসম্পন্ন গোপাল হালদার সাধারণ শিক্ষার ব্যাপক ও সার্বজনীন ব্যাপ্তি। সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশকেই বাঙালী সংস্কৃতি বলে মনে করেন। তাঁর প্রত্যয়বান চিত্তবৃত্তির প্রকাশ প্রবন্ধসাহিত্যে তাঁকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। গোপাল হালদারের বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক বোধ, পরিচ্ছন্ন মনন, গোঁড়ামিহীন দৃষ্টিভঙ্গি, বৈজ্ঞানিক চেতনা ও শোষণবিরোধী সমাজতান্ত্রিক আদর্শনিষ্ঠার উজ্জ্বল পরিচয় বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁকে গৌরবময় আসন দান করেছে।

॥ অন্নদাশঙ্কর রায় ॥

কবি, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪) বৃত্তিতে শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণকারী (আই. সি. এস) হলেও বাংলা সাহিত্যে যুক্তিবাদী চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক রূপেই খ্যাতিমান। তাঁর রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তারুণ্য, পথে প্রবাসে, জীবনশিল্পী, বাংলার রেনেসাঁস, সাহিত্যে সংকট ইত্যাদি। অন্নদাশঙ্কর কবি, কথাসাহিত্যিক, ভ্রমণকাহিনীকার হলেও, তিনি মূলত প্রাবন্ধিক রূপেই খ্যাতিমান। তার প্রবন্ধ-গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় অর্ধশতাধিক। অন্নদাশঙ্কর তাঁর প্রবন্ধ সম্পর্কে স্বয়ং মন্তব্যকালে বলেছেন—'প্রবন্ধ লেখার আর্ট আমি 'সবুজপত্র' সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কাছে শিখি। * * * পরবর্তী বয়সে যখন ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হই তখন চার্লস ল্যাম্ব, রবার্ট লুইস স্টিভেনসন, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ প্রভৃতির প্রবন্ধের আর্ট আমাকে মুগ্ধ করে।'[১] প্রবোধচন্দ্র সেন অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধসম্ভারকে 'বাংলা সাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ' রূপে অভিহিত করেছেন। অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধ 'বাংলা সাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ' হওয়ার কারণ মনে হয় যে, তাঁর সাহিত্যভাবনা ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সাহিত্যের ত্রিবেণী সঙ্গম। তাঁর সাহিত্যধারার এক প্রান্তে তিন হাজার বছরব্যাপী ভারতীয় সাহিত্যের ধারা, অন্যপ্রান্তে নবজাগ্রত য়ুরোপীয় সাহিত্যের ধ্যান-ধারণা। অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধসাহিত্যকে তাঁর অন্যান্য সাহিত্যসৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা অনুচিত। অন্যান্য রচনায় তাঁর যে ভাবনা-চিন্তা-মানসিকতা-ধ্যান-ধারণা প্রতিফলিত, প্রবন্ধসাহিত্যেরও তার প্রকাশ সংলক্ষ্য। তিনি জাতীয় জীবনধারার মৌলিক ধারাস্রোত থেকে যেমন দূরে সরে যাননি, তেমনি আবার য়ুরোপীয় ভাবনার স্রোতকেও অবহেলা করেননি। তাঁর সাহিত্যিক ঐতিহ্য সম্পর্কে মন্তব্যকালে সমালোচক যথার্থই বলেছেন—'এই লেখকের সাহিত্যচেতনা আবাল্য দুই মহান সাহিত্যপ্রবাহে লালিত, একটি ভারতীয় সাহিত্যের তিন হাজার বছরের ধারা, অন্যটি য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের পাঁচশো বছরের জোয়ার, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে এই দুই ধারার অনবদ্য সমন্বয় ঘটেছে। তাঁর রচনায় প্রথমত আছে সরলতা ও বিশুদ্ধি, যে সরলতা ও বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রবণতা তলস্তয়ের জগতের শিল্পাদর্শ থেকে আহৃত। তাঁর রচনার ভিতর যে স্নিগ্ধতা ও সরলতা তা লোকসাহিত্যেরও উত্তরাধিকার; ছড়া, বাউলগান ইত্যাদির সংসর্গের ফল। আবার তাঁর রচনায় পেছনে যে বিশুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিকতা তার কারণ তাঁর মানবিকবাদী মনীষা যা পাশ্চাত্য ধরনের। বস্তুতঃ তাঁর সাহিত্যচেতনার এই উভযোজ্যতা তথা সমন্বয় এক বৃহত্তর সংশ্লেষণ-প্রবণতার দিকে এগিয়ে যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, শিল্প ও জীবন, বিশ্বাস ও মনন এবং ভাবের সাথে ভাবনা, বস্তু-জিজ্ঞাসার সাথে রোমান্টিক চেতনা, লোকজীবনের সাথে পরিশীলিত জীবন—সব কিছুকে মিলিয়ে তিনি এক

---

১. ভূমিকা: শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ: অন্নদাশঙ্কর রায়।

নান্দনিক সমীকরণে পৌঁছে যান। যে প্রসঙ্গে গ্রীক দার্শনিকদের এনসাইক্লোপেডিক অন্বেষা ও সমন্বয়-প্রয়াসের কথা মনে পড়ে যায়।'[২]

অন্নদাশঙ্কর তাঁর প্রবন্ধে প্রধানত 'সবুজপত্র' সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর পদ্ধতি অনুসারী। 'সবুজপত্র' রীতির যুগের বাংলা গদ্যের চলতি রীতিকে সাহিত্যে বাক্‌সারস্বতের যে মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল, অন্নদাশঙ্কর তারই উত্তরসূরী বলা চলে। অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধের গদ্য স্বাদুতায়, স্নিগ্ধতায়, সরলতায় যেমন মনোহারী, তেমনি বুদ্ধির দীপ্তিতে, মিষ্টিসিজমে এক অনাস্বাদিতপূর্ব রহস্য বহন করে আনে। প্রবন্ধ অন্নদাশঙ্করের কাছে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আর্ট। আর সেই আর্টকে তিনি শব্দপ্রয়োগে, বাক্যগঠনে, অলংকরণে উজ্জ্বল করে তোলেন। সংস্কৃত ভাষার তৎসম শব্দকে তিনি সরল বাক্যগঠনের দ্বারা সাজিয়ে নিয়ে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে সারস্বত রীতি ও চলতি রীতির মিশ্রণ ঘটান। জটিল বা যৌগিক বাক্যগঠন তাঁর মানস প্রক্রিয়ায় গ্রহণীয় নয়। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ ফলাকাঙ্ক্ষী প্রবন্ধ হলেও সেখানে তাঁর মনন ও হৃদয়, সত্যনিষ্ঠা ও মানবপ্রেম উভয়ই প্রতিফলিত হয়। তাঁর প্রবন্ধে বুদ্ধিবাদের প্রাধান্যের সঙ্গে আছে উপলব্ধির প্রকাশ। তিনি স্বয়ং বলেছেন —'প্রবন্ধও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আর্ট হতে পারে। কাব্য, নাটক, উপন্যাস যদিও সাহিত্যের অগ্রজ তিনটি শাখা আর প্রবন্ধ সর্বকনিষ্ঠ তবু প্রবন্ধকেই আমরা দেখি সর্বঘটে। তার বৈচিত্র্য অশেষ। আমার অধিকাংশ প্রবন্ধই ফলাকাঙ্ক্ষী রচনা। ফল ফলবার পর তার আর প্রয়োজন থাকে না। সমসাময়িক সমস্যা ও তার সম্ভবপর সমাধান আমাকে ভাবায়। আমিও দশজনকে ভাবাই। কিছু ফল হয়তো ফলে। কিছু হয়তো ফলে না। এটা হলো একজন ইনটেলেকচুয়ালের কর্তব্যপালনে। বাদবাকী রচনা সাহিত্যিক প্রসঙ্গে আমার উপলব্ধির প্রকাশ'।[৩] অন্নদাশঙ্করের সুস্থির জীবনাদর্শ তাঁর প্রবন্ধে প্রতিফলিত। তিনি মনন ও হৃদয় উভয়কেই প্রবন্ধে স্থান দিয়েছেন। সত্যনিষ্ঠা ও মানবপ্রেম তাঁর প্রবন্ধের দুটি দিক। অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত সম্ভবত ১৯২৮—তারপর দীর্ঘকাল ধরে তাঁর নানা জাতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে চলেছে। তাঁর 'বিনুর বই' বাংলাসাহিত্যে আত্মজীবনী ও আত্মশিল্পমূলক রচনার অন্তর্গত। তাঁর 'তারুণ্য' প্রবন্ধগ্রন্থে রুচি, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, মনস্বিতা প্রকাশিত; তবে তাঁর বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ও মনীষার জন্য প্রবন্ধগুলি নিছক তথ্যে পর্যবসিত হয় নি। সৃষ্টিশীলতায় স্পন্দিত অন্নদাশঙ্কর দেশ ও কালের আবেগকে যেমন স্বীকার করেন, তেমনি আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদেও অভ্যস্ত। তাঁর প্রবন্ধ রচনার পেছনে সামাজিক শক্তির ক্রিয়াশীলতা সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। এ প্রসঙ্গে তিনি স্বয়ং বলেছেন— 'যদিও আমার প্রধান কাজ সৃষ্টি, একটির পর একটি সৃষ্টি করি আর একটুর পর একটু মুক্ত হই, তবু আমাকে কখনো কখনো সৃষ্টির কাজ সরিয়ে

২. সম্পাদকের ভূমিকা: অন্নদাশঙ্কর রায়ের সমগ্র প্রবন্ধ সাহিত্য (১ম খণ্ড)

৩ ভূমিকা: শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ: অন্নদাশঙ্কর রায়।

রেখে দেশের ও কালের ভাবনার ভাগ নিতে ও দিতে হয়। নইলে আমি হব পলায়নবাদী।' তাঁর এই স্বীকারোক্তি অত্যন্ত সত্য, কেননা তাঁর অধিকাংশ রচনাই সমসাময়িক প্রয়োজনবোধ থেকে লিখিত। তিনি মধ্যযুগ ও আধুনিক কাল, জনসংখ্যা ও জন্মস্বত্ব, হিন্দু ও মুসলমান, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, গ্যেটে, টলস্টয় ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলি একই সঙ্গে সামাজিক ও সাহিত্যিক, সাময়িক অথচ কালোত্তীর্ণ, সাহসী এবং মরমী। তাঁর একটি প্রবন্ধগ্রন্থের নামই হলো 'দেশকালপাত্র'। এই নামকরণই তাঁর মানসিকতার পরিচয় প্রদান করে। মানুষের সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হয় 'প্রত্যয়' নামক প্রবন্ধগ্রন্থে—যেখানে তিনি লেখেন –'সমস্ত প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে জনগণ এক ও অভিন্ন'। অন্নদাশঙ্কর রোমান্টিক সৌন্দর্যবাদী নন; তিনি কালচক্রের ঘর্ষণে উন্মুখর হন। ফলত তাঁর প্রবন্ধ রচিত হয় ভারতের ঐক্য, পনেরোই আগষ্ট, গান্ধীজীর লক্ষ্য, আমাদের স্বাধীনতা আমাদের সংগ্রাম, বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে। তাঁর প্রবন্ধগুলি স্বজ্ঞা ও যুক্তির দীপ্ত অবস্থানে উজ্জ্বল। তাঁর প্রবন্ধে অল্প কথায় বিপুলভাবৈশ্বর্যের প্রকাশ। তিনি ঋজু, তীক্ষ্ণ, মননশীল, সৎ, সাহসী, সৃষ্টিশীল, মানবতাবাদী প্রাবন্ধিক রূপে বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

॥ বুদ্ধদেব বসু ॥

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮—৭৪) যেমন এক কবি ব্যক্তিত্ব, তেমনি বাংলা প্রবন্ধ ও সমালোচনার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। বাংলা প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যের যে সূচনা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে সূচিত হয়েছিল, বুদ্ধদের বসু তাকে একটি প্রায় পূর্ণতা দান করলেন, এমন বলা চলে। বুদ্ধদেবের প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি যথাক্রমে হঠাৎ আলোর ঝলকানি, উত্তর তিরিশ, কালের পুতুল, সাহিত্যচর্চা, রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য, স্বদেশ ও সংস্কৃতি, সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ, প্রবন্ধ সংকলন, কবি রবীন্দ্রনাথ। তাছাড়া ইংরেজিতেও তিনি দুখানি প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেছেন। এ দুটি হলো An Acre of Green Grass এবং Tagore portrait of a poet, এর মধ্যে হঠাৎ আলোর ঝলকানি, উত্তর তিরিশ, সাহিত্যচর্চা, স্বদেশ ও সংস্কৃতি, সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ, দেশান্তর, কবি রবীন্দ্রনাথ, কবিতার শত্রু ও মিত্র প্রবন্ধ গ্রন্থ রূপে এবং কালের পুতুল, রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য ইত্যাদি সমালোচনা গ্রন্থরূপে অভিহিত হতে পারে। অবশ্য বুদ্ধদেবের প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যের এমন বিভাজন সম্ভব নয়। কেননা, তাঁর সমালোচনা প্রবন্ধের মৌলিকত্বে ভাস্বর, আবার প্রবন্ধগুলিও সমালোচনার রীতি পদ্ধতিতে সমাকীর্ণ। 'সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর বিশ্লেষণ প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হয় কবির উপলব্ধি এবং রচনা হিসেবে সমালোচনাকেও তিনি সম্পূর্ণাঙ্গ একটি সৃষ্টিকর্মে রূপান্তরিত করেন।' সাহিত্যবিষয়ে কোনো প্রচলিত মতের পুনরাবৃত্তি করা বুদ্ধদেবীয়

মননের বিরোধী; আর এর প্রমাণ পাওয়া তাঁর উল্লেখ্য প্রবন্ধ সমালোচনা গ্রন্থ 'সাহিত্যচর্চা'তে। আলোচ্য গ্রন্থের আটটি প্রবন্ধে তিনি রামায়ণ, মাইকেল, শিশু-সাহিত্য, সাংবাদিকতা, শিল্পীর স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করলেও এর সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত আলোচনা। তিনি এখানে রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক যেমন আলোচনা করেছেন তেমনি আবার রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসমালোচনা সম্পর্কেও তাঁর মৌলিক চিন্তা লিপিবদ্ধ করেছেন। বুদ্ধদেবের আলোচনা-সমালোচনার জগতে রবীন্দ্রনাথ যে একটি বিশাল অংশ জুড়ে আছেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য' গ্রন্থে। আলোচ্য গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধই ছাপা হয়েছিলো 'কবিতা' পত্রিকায়। কবির তুলনায় রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্যিক রূপেও যে স্মরণীয় বরণীয় এ তথ্য প্রমাণের জন্য বুদ্ধদেব মূলত আলোচ্য গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য বেছে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর বহুদিনের সঞ্চিত ভাবনা এবং অনবরত পরিবর্তমান ভাবনাগুলিকে পাঠকের গোচরে আনাই আলোচ্য গ্রন্থটির লক্ষ্য। 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি' বুদ্ধদেবের নানা প্রবন্ধের সমাহার। এখানেও বিশুদ্ধ প্রবন্ধের সঙ্গে টমাস মান, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রিক সমালোচনামূলক প্রবন্ধের আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। 'সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের দুটি পর্যায়। একটিতে সঙ্গ ও নিঃসঙ্গতা শীর্ষক আলোচনায় আধুনিক কবিতায় প্রকৃতি, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, রাজশেখর বসু ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। অন্য অংশে রবীন্দ্রনাথ শীর্ষক অংশে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ, উপমা, রবীন্দ্রনাথ ও প্রতীক সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই দেশ, কবিতা ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'কালের পুতুল' বুদ্ধদেবের সমালোচনার নিদর্শন গ্রন্থ। আলোচ্য গ্রন্থে যে সমস্ত সমালোচনামূলক প্রবন্ধ আছে সেগুলি পূর্বেই গ্রন্থসমালোচনারূপে 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বে বুদ্ধদেব বসু তিনটি নতুন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে পেরেছিলেন। তার মধ্যে কবিতা ও কবিতার মতো মিথলজির উপর নির্ভরশীল 'মহাভারতের কথা' অন্যতম। 'আমার যৌবন' তাঁর আত্মজীবনীর অংশ। 'কবিতার শত্রু ও মিত্র' গ্রন্থটি বুদ্ধদেবের কবিতা ও সাহিত্য বিষয়ক সর্বশেষ রচনা।

বুদ্ধদেবের প্রবন্ধসাহিত্য আলোচনা করলে লক্ষ্য করা যাবে যে সেখানে স্বদেশ বিদেশের সাহিত্য ও চিন্তার ক্ষেত্রের আলোড়ন তাঁর প্রবন্ধে আছে। প্রাথমিক মূল্যবোধ যেমন তাঁর প্রবন্ধে আছে তেমনি আছে তাঁর অতন্দ্র শিল্পীসত্তা, সর্বোপরি তাঁর প্রবন্ধে ছড়ানো রয়েছে তাঁর সংস্কারমুক্ত, মানবতাবোধে প্রাজ্ঞ, নিটোল, সজীব ও আধুনিক মন। একদিক থেকে বিচার করলে বুদ্ধদেবের সব প্রবন্ধই ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। তিনি তথ্যের গুরুভারে, যুক্তির আলোকে আর বিশ্লেষণের দাঁড়িপাল্লায় তাঁর প্রবন্ধ-গুলিকে গুরুভার না করে অনায়াসে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি বিশাল অংশ জুড়ে থাকেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-প্রসঙ্গের

রহস্যভেদের জন্য তিনি কাব্য-বিচারের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। বুদ্ধদেবের সমালোচনা সাহিত্য পাঠ জনিত আনন্দের প্রকাশ বলে তিনি সেই আনন্দকে পাঠকের মনেও অনায়াসে সঞ্চারিত করতে পারেন। এক্ষেত্রে তাঁর বাগবিন্যাসপ্রণালী অপরূপ, দৃষ্টিভঙ্গিও অনবদ্য। 'জীবনানন্দের গভীরতা, সুধীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞা, কি অমিয় চক্রবর্তীর বৈরাগ্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য বুদ্ধদেব ব্যস্ত হয়ে ওঠেন না, তাদের ব্যবহৃত শব্দ, মিল বা ভাবচ্ছবি থেকে হঠাৎ হঠাৎ এমন অনেক হীরকখণ্ড আবিষ্কার করেন যা পাঠকের চোখেও মায়াবী আলোর ছোঁয়া লাগায়'।[১] বুদ্ধদেবের গদ্য সুঠাম সাবলীল অথচ কাব্য রসাপ্লুত। তাঁর প্রবন্ধ স্বাভাবিক সত্যের শিকড় বিচ্যুত নয় বলেই তিনি বাক্যের গঠনভঙ্গিতে ইংরেজি বাক্যের গঠনভঙ্গির দ্যোতনা এনেছেন। তাঁর প্রবন্ধের শক্তি নিহিত রয়েছে তার চিন্তার স্বচ্ছতায় ও ঋজুতায়। বাক্য গঠনের ভঙ্গি তাঁর প্রবন্ধকে সহজ সৌন্দর্য দান করেছে। বুদ্ধদেব বসু একালের একজন শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক সমালোচক এবং গদ্য লেখকও বটে; যদিও তাঁর গদ্যের গায়ে লেগে থাকে কবিতার সৌরভ। বাংলাসাহিত্যে প্রাবন্ধিক সমালোচক বুদ্ধদেবের কৃতিত্ব এইখানে যে সমকালীন কবিদের সঙ্গে পাঠকদের তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন। 'একজন সৃষ্টিশীল কবি, অথচ সজাগ চক্ষু মেলে রেখেছেন সকলের জন্য, বিশেষত নবাগতের জন্য এবং অক্লান্তভাবে নতুন পরিচয়ের আনন্দ ধরে রাখছেন তাঁর সমালোচনায়, ধরে রাখছেন তাঁর সম্মতির দলিল, তাঁর স্বীকৃতির অভিজ্ঞান—বুদ্ধদেব বসুর এই পরিচয় বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। *** সমকালীন কবিতার প্রসঙ্গেই বুদ্ধদেবের ভূমিকা শেষ হয় নি; যা অতীত ইতিহাসের অন্তর্গত বা অদূর অতীতের যাঁরা প্রসিদ্ধ পুরুষ, সেদিকেও বার বার দৃষ্টিপাত করেছেন। ফিরে ফিরে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে। বস্তুত তাঁর সমালোচনা কর্মের বৃহত্তর না হলেও একটা বড়ো অংশ ছড়িয়ে আছে এই শক্ত জমিতে। রামায়ণ থেকে রবীন্দ্রনাথ, শার্ল বোদলেয়র, ডস্টয়ভস্কি রিলকের মতো মহিমান্বিত নামের জগতে। এখানে স্বভাবতই তাঁর সমালোচনা অতোটা 'বিশ্বধর্মী' নয়, এখানে তাঁকে প্রথম পথিকের মতো চাপা উত্তেজনা ও অস্থির ঔৎসুক্য নিয়ে এগোতে হয় না। এ জমি জরীপ হয়ে গেছে আগেই, অনেকবার তিনি জানেন, এবং পূর্বসমালোচনার অভিজ্ঞতা এখানে তাঁকে সাহায্য করে। এবং সাঁতে বোভ, মাথু আর্নল্ডের অনুসরণে তাঁর সমালোচনা তখন তৎপর হয় কবির জীবন ও তাঁর রচনার মধ্যে গভীর যোগসূত্রের বিশ্লেষণে'।[২] কবি বুদ্ধদেব তাঁর ভাষার ঐশ্বর্যে, যুক্তিতে, সমালোচনার চিন্তায়, ভাবগাম্ভীর্যে, তথ্যের উপস্থাপনে ও তত্ত্বের বয়নে বাংলা সাহিত্যে এক স্মরণীয় গদ্য শিল্পী—যিনি সমালোচক-প্রাবন্ধিক রূপে সমধিক যশস্বী।

---

১. বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ : অরুণকুমার সরকার।
[বুদ্ধদেব বসু : নানা প্রসঙ্গ / সম্পাদনায় আনন্দ রায়]
২. বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা : জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী।
[উত্তরাধিকার : বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা]।

॥ ভবতোষ দত্ত ॥

স্বদেশে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ ভবতোষ দত্ত (১৯১১) মূলত অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধের রচয়িতারূপে খ্যাতিমান। শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থনীতির অধ্যাপকরূপে ভবতোষ দত্ত একটি স্মরণীয় নাম। স্থিতধী ও চিন্তাশীল বলেই তাঁর বক্তব্য পাঠকচিত্তে অনায়াসে স্বচ্ছ আলোকপাত করে। বাংলা ভাষায় ভবতোষ দত্ত বহু গ্রন্থ লেখেননি, বাংলা ভাষায় তাঁর লিখিত প্রথম বই 'ধনবিজ্ঞান'। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' পর্যায়ে 'ধনবিজ্ঞান' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ নতুন করে লেখা 'ধনবিজ্ঞান' বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮২তে বিশ্বভারতী কর্তৃক। গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত হলেও অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ। পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী পত্রিকার তাগিদে তিনি ভারতীয় মনীষীদের অর্থনীতি সংক্রান্ত চিন্তার পরিচায়ক প্রবন্ধ রচনা শুরু করেন। অন্যান্য কয়েকটি পত্রপত্রিকাতেও তাঁর এই জাতীয় লেখা প্রকাশিত হয়। সেগুলি একত্রে ও একাধিক নতুন লেখা যোগ করে 'অর্থনীতির পথে' প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থটিও আয়তনে ক্ষুদ্র, কিন্তু লেখক সমালোচ্য গ্রন্থে ভারতবর্ষের আধুনিক অর্থনৈতিক চিন্তার ও অর্থনৈতিক বিকাশের ক্রমপর্যায় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সহজবোধ্য ও সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন। 'ভারতের অর্থ নৈতিক উত্থান' গ্রন্থেও লেখকের অর্থনীতি সম্পর্কিত গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় সংলক্ষ্য। সাম্প্রতিক বিষয়ক অবলম্বন করে লিখিত তাঁর 'দৃষ্টিকোণ' গ্রন্থটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'শিক্ষাভাবনা' নামে ভবতোষ দত্তের একটি শিক্ষা সম্পর্কিত গ্রন্থও আছে। এখানে ভবতোষ দত্তের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণের স্বকৃত অনুবাদ আছে। তাঁর 'আটদশক' আত্মস্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থ। 'আটদশক' গ্রন্থটির প্রস্তাবনায় লেখকের জীবনদর্শন ও তৎসম্পর্কিত বক্তব্য প্রকাশিত। উক্ত গ্রন্থটি সম্বন্ধে ভবতোষ দত্ত লিখেছেন—

'বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি স্মৃতিচারণা লিখেছিলাম। শৈশবের কথা সংক্ষেপে বেরিয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকাতে, কৈশোরের স্মৃতি নিয়ে লিখেছিলাম প্রতিক্ষণ-এ, আর রাইটার্স বিল্ডিং-এর অভিজ্ঞতার একটা চিত্র এঁকেছিলাম বারো-মাস-এ। তা ছাড়া, বর্ধমান রাজ কলেজের শতবর্ষপূর্তির স্মারকগ্রন্থেও একটি স্মৃতিচারণা লিখেছিলাম। বন্ধুজনেরা অনুরোধ করেছিলেন ফাঁকগুলি পূরণ করে দিতে। সেই অনুরোধ রক্ষারই চেষ্টা করেছি।

এটি আত্মজীবনী নয়। আমার নিজের কথা এখানে গৌণ, আমার চোখে দেখা আট দশকের দেশ-কাল-ব্যাপ্ত জগতের একটা আভাস দেওয়াই আমার অভীষ্ট। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রথম বছর থেকে শুরু করে নবম দশকের প্রায় শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আট দশক অনেক কিছু দেখেছি, অনেক মানুষের সান্নিধ্যে এসেছি। আমার জগতের বিস্তৃতি—দেশে শিলচর থেকে আহমেদাবাদ, সোনামার্গ থেকে কন্যাকুমারী—

আর বিদেশে ব্যাংকক থেকে সানফ্রান্সিসকো, স্টকহোলম থেকে কেপটাউন। আমার বিশ্বদর্শনের কাল-পরিক্রমার অন্তর্ভুক্ত দুটি মহাযুদ্ধ ভারতে তিনটি স্বাধীনতা আন্দোলন, ব্যাপক বিপ্লবী প্রচেষ্টা, বিশ্বব্যাপী মন্দা, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, শোকাবহ রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে দ্বি-খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা লাভ। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পতন-অভ্যুদয়, স্বার্থান্বেষী রাজনীতির অসংযত প্রকাশ, পৃথিবী জুড়ে নতুন ধরনের সাম্রাজ্য গঠনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দর্শকের চোখে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়, তথাকথিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি অনেক কিছুই ধরা পড়েছে। হয়ত চোখের দেখাতে অসম্পূর্ণতা থাকে, যা মৌলিকতার চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায় যা তাৎক্ষণিক। কিন্তু পিছন ফিরে তাকানোর স্বাধীনতা থাকে, তাৎক্ষণিক বিচারকে সংশোধন করে নেওয়া যায়।

জীবনে দুঃখ পেয়েছি, কিন্তু আনন্দ পেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি। সেই আনন্দের কথা-ই মনে রেখেছি। প্রধানতম আনন্দ পেয়েছি দীর্ঘকালের শিক্ষক জীবনে। দুঃখ পাই শিক্ষার জগতে অশিক্ষার অনুপ্রবেশ। যা দেখেছি, যা মনে হয়েছে সবই লিখেছি। হয়ত আমার জগৎটাকে অনেকে চিনতে পারবেন এবং আবো অনেকে—যাঁরা নতুন প্রজন্মের নাগরিক হয়ত একটা তুলনা করে দেখবার মত পটভূমিকা পাবেন।'

প্রাবন্ধিক ভবতোষ দত্তের গদ্যরচনা স্বাদু, তিনি মূলতঃ তথ্যের দিকেই বেশি গুরুত্ব দান করেন। 'আটদশক' স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থ হলেও লেখক এখানে দেশকাল ব্যাপ্ত মননের রূপকে তুলে ধরতে কোথাও ইতস্তত করেন নি। আলোচ্য গ্রন্থটিতে সমকালীন সমাজ অর্থ-সংস্কৃতির জগতের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এ গ্রন্থের ভাষারীতি তত্ত্ব বা তথ্য ভারাক্রান্ত নয়; অথচ সৌন্দর্যসাধক গদ্যের কেন্দ্রীয় পরিচয়কে পাঠকের কাছে আভাসিত করে তোলে। 'আটদশক' গ্রন্থে লেখক কয়েকটি গদ্যউক্তি ইতিহাসের মৌলিক সত্যের প্রতি ইঙ্গিত দান করে।

বাংলা ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থের রচয়িতা হলেও ভবতোষ দত্তের অর্থনীতিকেন্দ্রিক চিন্তা ও মনস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'ইকনমিকস অভ্ ইন্‌ডাসট্রিয়েলাইজেশন' গ্রন্থে। তাছাড়া ইংরেজি ভাষায় লিখিত তাঁর অন্যান্য ,গ্রন্থগুলি হলো—এসেজ ইন ইকনমিক প্ল্যানিং, দ্য কনটেক্সট অভ্ ইকনমিক গ্রোথ, ইভল্যুশন অভ্ ইণ্ডিয়ান ইকনমিক থট—টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি পারসপেকটিভস, সোশ্যাল জাস্টিস ইন এ মিক্সড ইকনমি ইত্যাদি। পরিকল্পনা কমিশনের অর্থ সাহায্যে তাঁর লিখিত অন্যতম গ্রন্থ 'ইকনমিক ডেভলপমেণ্ট অ্যাণ্ড এক্সপোর্টস'।

প্রাবন্ধিকরূপে ভবতোষ দত্ত স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী হওয়ার ফলে শব্দ ব্যবহারে তিনি সহজ দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছেন। সম্প্রদায়গত ধারণায় তিনি যুক্তিমনস্ক চিন্তাধারার পরিচয় দান করেন—'নিষ্ঠুরতা আর কাপুরুষতায় হিন্দু মুসলমান সব সমান'। অপরূপ সাহিত্যিক স্বাদুতার পরিচয় তাঁর গদ্যকে স্মরণীয় করে তোলে—'কুড়ির দশকের সূর্য কালো মেঘে অস্ত গেল। প্রথম মহাযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি থেকে সম্পূর্ণ

আরোগ্যের আগেই এল বিশ্বব্যাপী অভূতপূর্ব মন্দা।' সাহিত্যিক রূপায়ণের সঙ্গে সমকালীন ইতিহাসকে তুলে ধরার এহেন গদ্যভঙ্গি বাংলা সাহিত্যে অনন্যপূর্ব। 'আটদশক' গ্রন্থটি যেন যুগের দর্পণ। এখানে ভৌগোলিক স্থান হিসেবে দৌলতপুর, কলকাতা, বর্ধমান, নোয়াখালি, শিলচর, আহমেদাবাদ, ব্যাংকক, স্টকহলম, সানফ্রান-সিসকো যেমন আসে, তেমনি আসে ইতিহাসের স্মরণীয় ব্যক্তিত্বরা—রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র। শিক্ষাজীবনের স্মরণীয়, বরণীয় অধ্যাপকবৃন্দের কথা জানাতেও লেখক ভোলেন না। যেমন—সতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চন্দ, সুধাংশুকুমার গুহঠাকুরতা, নির্মলচন্দ্র গুপ্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুশীলকুমার দে, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ। সমকালীন রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, সমাজনীতি, শিক্ষা সমস্তই ভবতোষ দত্তের নিপুণ লেখনীতে চলচ্চিত্রের মত ফুটে ওঠে, আর এর ফলেই প্রাবন্ধিক ভবতোষ দত্ত বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারার এক নতুন মাত্রা যোগ করেন। তাঁর জীবনদর্শন তাঁকে সহজ-সরল-স্বাদু অথচ যুক্তি মননধর্মী বিজ্ঞানমনস্ক রচনায় অনুপ্রাণিত করে। যে জীবনদর্শন তাঁকে ত্রিশের দশকের কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে শরতের নীল আকাশ দেখাতে সক্ষম হয়েছিল, সেই জীবনদর্শনই তাঁকে প্রাবন্ধিকের গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত করায়—'জীবনকে সহজভাবে নিতে হবে, করণীয় কাজটা বিনা অভিযোগে করতে হবে, কাজ থেকে আনন্দ আহরণ করতে হবে, চোখ থাকবে খোলা, মন থাকবে সর্বপ্রকার যুক্তি, তথ্য ও রসগ্রহণের জন্য উন্মুক্ত, ভবিষ্যতের ভাবনাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে না—এই জীবনদর্শনেই আমরা নিজেদের আবিষ্ট করেছিলাম।'

॥ বিনয় ঘোষ ॥

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে বিনয় ঘোষ (১৯১৭-৮০) সমাজ বিজ্ঞানের লেখকরূপেই সমধিক খ্যাত। সৃজনশীল সাহিত্যিক, সমালোচক ও নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ রূপে বিনয় ঘোষ স্মরণীয় হয়ে আছেন। তবে মূলত সমাজবিজ্ঞানী রূপেই তিনি সর্বাপেক্ষা পরিচিত। 'বিনয় ঘোষের চর্চার ব্যাপকতা ও সাকল্য লক্ষ্য করলে তাঁকে একালীন বাঙালীর মননসাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরূপে স্বীকার করতেই হয়।' সাহিত্য জীবনে বিনয় ঘোষ ফরাসী লেখক আঁদ্রে জিদ-এর আদর্শকেই গ্রহণীয় বলে মনে করেছিলেন। তাঁর একটা কথা উল্লেখ করে বিনয় ঘোষ লিখেছিলেন—'এ যুগে আমাদের দায়িত্ব অনেক চারিদিকে যে কদর্যতা ও বীভৎসতার স্তূপ তাকে ঘেঁটিয়ে ফেলতে হবে আমাদেরই, সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরও সৃষ্টি করতে হবে। সেইজন্য 'এ যুগের লেখকের কলম প্রধানতঃ হবে কিরিচ, তারপর তুলি।...চারিদিকে আদিম অন্ধকারের মতো সংকট যখন ভয়াল আরণ্যক হিংস্রতায় আমাদের গ্রাস করতে উদ্যত, তখন কলমকে শাণিত তরবারি না বানিয়ে উপায় কি?' লেখা সম্পর্কে এই নীতি

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিনয় ঘোষ অনুসরণ করেছিলেন, আর সেই জন্যই তিনি সার্থক শিল্পী। ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যাই তিনি বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে করেছিলেন এবং সমাজ বিজ্ঞানের এই দৃষ্টিতেই তাঁর সমস্ত লেখার সৃষ্টি।

বিনয় ঘোষের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি যথাক্রমে 'আন্তর্জাতিক রাজনীতি', 'সোভিয়েট সভ্যতা,' 'ফ্যাশিজম ও জনযুদ্ধ,' 'সংস্কৃতির দুর্দিন', 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি,' (১, ২, ৩, ৪), 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ,' 'মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ,' 'বাংলার বিদ্বৎসমাজ', 'জনসভার সাহিত্য,' 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র,' বাংলার নবজাগৃতি,' 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত' (১, ২) 'নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা,' 'কালপেঁচার নক্‌সা,' 'কালপেঁচার বৈঠক' ইত্যাদি। বিনয় ঘোষের লেখার সূত্রপাত ছাত্রজীবন থেকেই। 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত বিনয় ঘোষের অল্প বয়সের লেখা পড়ে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর গল্পগুলি ছিল বাস্তবজীবনের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি, দক্ষতা সম্পন্ন চিত্রকরের মতো তিনি বিত্তবান, নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীনদের জীবনসংগ্রামের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আঘাত-সংঘাতের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রাজনীতি বিষয়ক লেখাগুলিও পাঠকসমাজে সমাদৃত হয়েছিল। এক অর্থে তাঁকে বর্তমানকালের লেখার জগতে সব্যসাচী বলা চলে। কেননা, তিনি সাহিত্য ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজে যথোপযুক্তভাবে লেখনীর কষাঘাত প্রয়োগ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন না। লেখা সম্পর্কে বিনয় ঘোষের ধারণা ছিল যে, লেখা হবে জীবনের ধ্যান-ধারণাধর্ম। লেখার ব্যাপারে তিনি সৎ, দৃঢ় ও নির্ভীক ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিসত্তা, সমগ্র চেতনা, অনুভূতি ও উপলব্ধি সমস্তই লেখার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। লোকসংস্কৃতির বিষয়ে লেখার আগে তিনি ক্ষেত্র অনুসন্ধানকার্যে নিযুক্ত থাকতেন। তাঁর লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ সংগৃহীত তথ্য ও অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থটিকে তাঁর লোকসংস্কৃতি বিষয়ক শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ বলা যেতে পারে। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি সামগ্রিক রূপে উপস্থিত, এ গ্রন্থটি পাঠ করলে যে কোনো পাঠক অতি সহজেই পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির উৎস, ব্যাপ্তি ও পরিণতি উপলব্ধি করতে পারবেন। ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের ভিত্তিতে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে তিনি পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা করেছেন। গ্রন্থটি রচনার জন্য তাঁর অমানুষিক পরিশ্রমের কথা অনেকেরই জানা নেই। তিনি গ্রামে-গঞ্জে শহরে জঙ্গলে, হাটে-মাঠে, দেউলে-লোকালয়ে, দেবালয়ে-মন্দিরে-মঠে-গীর্জায় তথ্য সংগ্রহের নেশায় অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

বিনয় ঘোষের প্রথম বই 'শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ' (১৯৪০) গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক লিখেছিলেন 'শিল্পী মানুষ। মানুষ বলেই তিনি তাঁর জীবনকে অবহেলা করতে পারেন না।' তাঁর 'আন্তর্জাতিক রাজনীতি' গ্রন্থটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনাকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন। 'সোভিয়েট সভ্যতার' প্রথম ও

দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। 'বাঙলার নবজাগৃতি' গ্রন্থে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'বরণীয় বাঙালী' গ্রন্থটি বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির ইতিহাসে প্রভাবশালী ও কৃতিপুরুষের জীবন ও সাধনার কাহিনী পরিচিতি; 'কালপেঁচার নক্‌শা' লঘুগুরু রচনার সংকলন। 'কলকাতা কালচার' লেখকের কলকাতার সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ক রচনার সংকলন গ্রন্থ। 'জনসভার সাহিত্য' প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাজসভায় বন্দী সাহিত্যের জনসভায় আবির্ভাবের বিবর্তন বিষয়ে সমাজ-বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা। 'বাদশাহী আমল' গ্রন্থটি বার্ণিয়ের ভ্রমণ বৃত্তান্ত অবলম্বনে লিখিত। 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' (তিন খণ্ড) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন ও সাধনার আলোচনা প্রসঙ্গে উনিশ শতকের বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস—এখানে সত্যসন্ধানী বিজ্ঞানীর মনোভাব প্রতিফলিত। 'বাংলার বিদ্বৎসমাজ' গ্রন্থে উনিশ শতকে বাংলার মধ্যবিত্ত বিদ্বৎসমাজের বিকাশ ও বিবর্তন সম্বন্ধে সমালোচনা করা হয়েছে। 'মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ' গ্রন্থটি বর্তমান কালের সমাজ ও মানুষ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ। তাছাড়া বিনয় ঘোষ 'মানবসভ্যতার ধারা 'সমাজবিদ্যা', 'ভারতজনের ইতিহাস' ইত্যাদি পাঠ্যপুস্তক রচনাও করেছেন। তাঁর গল্পসংকলনের নাম 'বোধন'। অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থটি তিনি সম্পাদনাও করেছেন। গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গেও বিনয় ঘোষ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর 'বিদ্রোহী ডিরোজিও' গ্রন্থে নব্যবঙ্গের দীক্ষাগুরু ডিরোজিওর জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'শ্রীবৎসের নানা প্রসঙ্গ' গ্রন্থে লঘু বিষয় গুরু ভঙ্গিতে এবং গুরু বিষয় লঘু ভঙ্গিতে পরিবেশিত হয়েছে। ভারতীয় প্রেস কমিশনের আমন্ত্রণে লিখিত তাঁর Press Comission Report Bengali Newspapers—1962-'77 একটি স্মরণীয় পর্যালোচনামূলক রিপোর্ট। বাংলাদেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিনয় ঘোষ সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবন, ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তিনি বিজ্ঞানমনস্ক হলেও তাঁর রচনার স্টাইল কিন্তু যুক্তিবিন্যাসের শুষ্কতায় পূর্ণ নয়, সেখানে সাহিত্যিকের সৌকর্যও সংলক্ষ্য। জীবনের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনও একাত্মবোধে তাঁর রচনাসমূহ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্পূর্ণ পরিচয় তাঁকে বাদ দিয়ে লেখা সম্ভব নয়; বাঙালী জাতির প্রকৃত পরিচয়, বাঙালী জাতির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ইতিহাস বিনয় ঘোষের রচনাবলীতে খুঁজতে হবে। বিনয় ঘোষের সাহিত্যিক আদর্শ সম্পর্কে যথার্থই বলা হয়েছে 'লেখা সম্পর্কে তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী ও নির্ভীক। মতামত প্রকাশে তাঁর কোন অস্পষ্টতার জড়তা বা সংকোচ ছিল না। তাঁর লেখায় আদর্শবাদের দিক দিয়ে কোন ফাঁকি নেই। বিচার-বিশ্লেষণ করে যা বুঝেছেন তাই নির্ভীকভাবে অতি যত্ন ও দরদের সঙ্গে লিখতেন। স্বার্থের খাতিরে বা অনুরোধে নিজের মনের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে এক লাইনও এমনকি একটি শব্দও কেউ তাঁকে দিয়ে লেখাতে পারেননি। তাঁর লেখা পড়ে কে খুশী হল

বা কে বিরক্ত হল সে সব ভাববার এবং ভেবে বিচলিত হবার মত অবকাশ তাঁর ছিল না। এ সম্বন্ধে বজ্রকঠিন ছিল তাঁর মনোবল ও চরিত্র'।[১] বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম লেখকরূপে বিনয় ঘোষ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আগামীকালে অবশ্যই অন্যতম সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বরূপে পরিগণিত হবেন। নতুন সাহিত্যের ভিত্তি যে মানবতা তার সাধনায় নিয়োজিত বিনয় ঘোষ তাঁর ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনার জন্য বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় আসনের অধিকারী।

১. বিনয় ঘোষ, তাঁর সাধন ও জীবন : বীণা ঘোষ

৪. প্রবন্ধ পাঠ

ইতিহাস ও সংস্কৃতি : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥

[সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধটি ১৩৫১ বঙ্গাব্দে কানপুরে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে ইতিহাস ও সংস্কৃতি শাখার সভাপতির অভিভাষণ। প্রবন্ধটি উক্ত নামে ১৩৫১ বঙ্গাব্দের 'দেশ' পত্রিকায় ১৪ ও ২১ মাঘ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস' গ্রন্থে মোট পাঁচটি প্রবন্ধ আছে -সংস্কৃতি, ইতিহাস ও সংস্কৃতি, শিল্প ও ইতিহাস, শিল্পকলা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি। সমালোচ্য প্রবন্ধটি উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ।]

● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে 'ভাষাচার্য' রূপে সম্বোধন করলেও এবং ধ্বনিবেদবিৎ ও ভাষা সম্বন্ধে ভূগোলবিজ্ঞানী রূপে বর্ণনা করলেও, মানবিকীবিদ্যার প্রায় সমস্ত প্রধান শাখাতেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর মুদ্রিত হয়েছে। তাঁর সৃজনশীল, নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সমস্ত রচনাকেই শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। ভাষাতত্ত্ব, ভারততত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, সংস্কৃতি, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত তাঁর প্রায় সমস্ত বক্তব্যই গ্রহণীয় বলে মনে হয়। সমালোচ্য 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধ সম্পর্কে উল্লিখিত সূত্রটিও প্রণিধানযোগ্য।

'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৩৫১ অর্থাৎ ১৯৪৪ অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তরঙ্গশীর্ষ। এই সময় ভারতবর্ষ ইংরাজ শাসনাধীন। পঞ্চাশের মন্বন্তরে বিধ্বস্ত বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত। ১৯৪৪-এ চার্চিলকে লেখা একটি চিঠিতে ওয়াভেল লিখেছিলেন যে, যুদ্ধের পর ভারতবর্ষকে গায়ের জোরে ধরে রাখা সম্ভব হবে না। ১৯৪৪-এ সুভাষের আজাদ-হিন্দ-ফৌজ ভারতের সীমান্তে এসে হাজির হয়। এই সময় মুদ্রাস্ফীতির যে প্রবণতা দেখা দেয় তাই ১৯৪৫-এ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরে বাংলাদেশের ১৫ থেকে ৩০ লক্ষ লোক মারা যায়। এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৪৪-৪৫ নাগাদ ভারতে ব্রিটেনের পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমদানির প্রধান উৎস হয়ে উঠতে লাগল। শিল্পেরও বিকাশ হচ্ছিল অত্যন্ত ধীরে ধীরে। বস্ত্রশিল্প, লৌহ ইস্পাত শিল্প, সিমেন্ট ও কাগজ শিল্পে উন্নতি দেখা যাচ্ছিল, ইঞ্জিনীয়ারিং ও রসায়ন শিল্পের সূচনা হচ্ছিল, কিন্তু জাহাজ-মোটর গাড়ি ও বিমানশিল্পের উন্নতিতে বিদেশি বাধা ছিল। ভারতের অগ্রণী ব্যবসায়ীরা ১৯৪৪-এর জানুআরি মাসে বোম্বাই পরিকল্পনা চালু করেন। এই সময় দেশে রুশ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সপ্রশংস উল্লেখ পাওয়া যায়। চারিদিকে অভূতপূর্ব গণদুর্দশা সত্ত্বেও বুর্জোয়াদের অবস্থা ক্রমশ ভাল হচ্ছিল। 'জনযুদ্ধ' নীতি ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টিকে জনজীবন বিচ্ছিন্ন করে তুলেছিল। এই সময় ভারতবর্ষ যে বহুজাতিক ও বহুভাষী দেশ এই তত্ত্বের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এমনও মনে

করা হয়েছিল যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মত এখানেও বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। কেননা, তার ফলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছা সংযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র গড়ে উঠবে। এই সময় মধ্যবিত্তশ্রেণীর সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর মার্কসবাদের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। লোকশিল্পের মাধ্যম তথা সাংস্কৃতিক আঙ্গিকে প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম রূপে দেখা দেয়। ১৯৪৪-৪৫ ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এ ব্যাপারে লক্ষণীয় সাফল্য অর্জন করে। গণনাট্য সংঘ ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংস্থা ভারত তথা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে এক নব চেতনার দিগন্ত উন্মোচিত করে। সমাজ-আর্থ-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তা-চেতনার এই পটভূমিকায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে (১৩৫১) ইতিহাস ও সংস্কৃতি শাখার সভাপতির অভিভাষণে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, দেশের সামগ্রিক সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি রচিত হলেও প্রাবন্ধিক সমকালীন সামাজিক সমস্যাকে পরিত্যাগ করতে পারেননি। এই সময় রাষ্ট্র ও সমাজশক্তিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল। সিন্ধি, বালুচি, পাঞ্জাবি, পাঠান ইত্যাদি নানা জাতিসত্তাগত ধারণার প্রকাশ আরম্ভ হয়েছিল। বিচ্ছিন্নতাবাদের এই ভয়াবহ প্রবণতার মুখে দাঁড়িয়ে সুনীতিকুমার ভারতের জাতিসত্তায় বিভিন্ন বিচিত্র সংস্কৃতির মিলন সূত্র তথ্যসহযোগে জাতির সামনে প্রকাশে সচেষ্ট হলেন। বাংলাদেশের তথা ভারতের সংস্কৃতি যে বিমিশ্র সংস্কৃতির ফলশ্রুতি একথা তিনি প্রমাণ করলেন বহুবিধ তথ্যাদির সাহায্যে আর এইখানেই প্রবন্ধটির ঐতিহাসিকতা নিহিত।

● বস্তুসংক্ষেপ

অতীতকালের মানুষের কথা নিয়ে যা রচিত তাই ইতিহাস নামে কথিত। আর নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হল, মানুষের উদ্ভব এবং মানুষের সভ্যতা ও সমাজের বিকাশ। মানুষকেন্দ্রিক সমস্তকিছু এবং মানুষের ব্যক্তিক বা মিলিত প্রয়াসের বিষয় নৃবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। নৃবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধি অত্যন্তব্যাপক, তার অন্তর্ভুক্ত হল মানুষের দেহের ও আবেষ্টনী অনুসারে প্রকৃতির আলোচনা, মানবসমাজের ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, শিল্প-সংস্কৃতি, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি; এককথায় মানুষের মনোজগতের প্রকাশভূমি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হল, মানুষের অতীত বা সাম্প্রতিক সামগ্রিক প্রয়াস। সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতির মতো কার্যকারণাত্মক ঘটনাবলীর আলোচনা বলে ইতিহাসকেও মানববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ভাষাতত্ত্বও উক্ত পর্যায়ভুক্ত। [১]

জাতির সর্বাঙ্গীণ সাংস্কৃতিক বিকাশের কথা ইতিহাসে থাকে বলে এর পরিধি আরও ব্যাপক। আগে ইতিহাস বলতে শাসকবর্গের কীর্তি-কাহিনী বোঝানো হত। কিন্তু বর্তমানে ইতিহাস বলতে সমগ্র জাতির প্রগতির ধারণাকে বোঝানো হয়। জাতির ও

মানবসমাজের ইতিহাস হলো সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস। [২]

বর্তমানে 'সংস্কৃতি' শব্দটি culture এর প্রতিশব্দ রূপে বাংলায় প্রচলিত হলেও শব্দটি ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পাওয়া যায়। সেখানে সংস্কৃতি শব্দের অর্থ যার দ্বারা কোনো বস্তু মার্জিত বা উন্নত হয়। culture এর পরিবর্তে কৃষ্টি শব্দটি বাংলায় ব্যবহৃত হলেও, তা রবীন্দ্রনাথের পছন্দ ছিল না। কেননা, বেদে কৃষ্টি মানে জাতি, জন বা জনগণ। সংস্কৃতি শব্দটি প্রথম মারাঠি ভাষায় ১৯২২ সালে প্রযুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ কৃষ্টি অপেক্ষা সংস্কৃতি শব্দটি অধিকতর সুপ্রযুক্ত বলে মনে করেন এবং তখন থেকে শব্দটি বাংলা ভাষায় সর্বজনগৃহীত হয়েছে। অবশ্য কোনো কোনো মুসলমান লেখক সংস্কৃতির পরিবর্তে আরবী তমদ্দুন শব্দটি ব্যবহার করতে চেয়েছেন। কিন্তু তমদ্দুন শব্দটির মূলে আছে মদিনা বা নগর শব্দের দ্যোতনা। বাঙালী সংস্কৃতি গ্রামীণ জীবনাশ্রয়ী বলে সেখানে তমদ্দুনের পরিবর্তে সংস্কৃতি শব্দটি অধিকতর প্রযোজ্য। সংস্কৃতির সঙ্গে সভ্যতার পার্থক্য আছে। সভ্যতা বহিরঙ্গ; সংস্কৃতি অন্তরঙ্গ। মানুষের উন্নত জীবনযাত্রা, সামাজিক রীতিনীতি, রাষ্ট্রনীতি, বাস্তুশিল্প ইত্যাদি সভ্যতার অঙ্গ, আর সংস্কৃতি হলো আধ্যাত্মিক ও আধিমানসিক জীবন, সামাজিক জীবনের সৌন্দর্যময় প্রকাশ। [৩]

জাতি হিসেবে বাঙালীর রাষ্ট্রনৈতিক কৃতিত্ব লক্ষ্যগোচর নয় বলে বাঙালীর ইতিহাসের আলোচনা হলো তার সংস্কৃতির আলোচনা। নিখিল ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে বাঙালীর ভূমিকা নগণ্য। পেরিক্লিস, আলেকজাণ্ডার, আলফ্রেড বা পিটারের ন্যায় বাঙালী জাতির নিয়ন্তা দুর্লভ। সৃজ্যমান বাঙালী জাতি মূলত বিহার ও উত্তর প্রদেশ কর্তৃক শাসিত হত। অশোকের পর বাংলাদেশের একাংশে বাঁকুড়া জেলার পুষ্করণার অধিপতি চক্রস্বামী বিষ্ণুভক্ত সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মার শিলালেখ পাওয়া যায় বাংলাদেশ ও জাতি মূলত মৌর্য ও গুপ্ত সম্রাটগণ কর্তৃক শাসিত। বাংলাদেশের প্রথম খ্যাতিমান নরপতি পালবংশের ধর্মপাল; তাঁর সময়ে বাঙালি জাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার অবকাশ পায়। সেন বংশের বল্লাল সেন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর সমাজে শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা আনয়নে সচেষ্ট হন। বাঙালী হিন্দুর সমাজ নিয়ন্ত্রণে ও রাজ্য পরিচালনায় কতিপয় উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণের হাত ছিল। [৪]

বাঙালি জাতির গঠনে কিংবা পরিচালনায় কোনো নৃপতি কোনো বড়ো কাজ করেছেন কিনা তা জানা যায় না। মোগল-পূর্ব যুগে তুর্কী-পাঠান বা সুলতানী আমলে কোনো বিরাট ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক জীবনে লক্ষ্য করা যায় নি। রাজা কংস দনুজমর্দনদেব ১৪ শতকের ২য় দশকে বাংলাদেশে হিন্দু অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে সারা বাংলায় স্বীয় ক্ষমতা স্থাপন করলেও, তিনি মহারাষ্ট্রের শিবাজীর মতো জাতীয় জাগৃতির আহ্বানধ্বনি শোনাননি। ফলে জনসাধারণের ওপর তাঁর সুচিরস্থায়ী প্রভাব দুর্লক্ষ্য। এই সমস্ত কারণে বলা যায় যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনাপেক্ষা সাংস্কৃতিক জীবনই মুখ্য। [৫]

আসাম, কেরল, নেপাল প্রভৃতি দেশ রাষ্ট্রনৈতিক দিক অপেক্ষা সংস্কৃতিতে অধিক উন্নত। রাজস্থান, বিজয়নগর, উৎকল, পশ্চিম উত্তর প্রদেশ, দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি অঞ্চল গুলি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক গৌরবে সমান। ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাস এই স্বদেশের অধিবাসীদের দ্বারা গঠিত। রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী উৎসব' কবিতাতে মহারাষ্ট্র ও বাংলাদেশের ভাবগত ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য প্রকাশিত হয়েছে। [৬]

অবশ্য কখনো কখনো বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে উচ্চতর রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মের সমাবেশ লক্ষ্য করা গেছে। তুর্কী বিজয়ের পর থেকে ইংরেজ আমল পর্যন্ত বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ইতিহাস তেমন গৌরবদীপ্ত না হলেও, তুর্কী বিজয়ের পূর্বে হিন্দু আমলে বাংলাদেশ একবার উত্তর ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে শীর্ষে উন্নীত হয়েছিল এবং গৌড়বঙ্গের সম্মানায় স্থান ছিল। আধুনিক কালে নবীন ভারত গঠনে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভাবজগতে, কর্মজগতে বাঙালির মনীষা স্বীকৃত। [৭]

বাঙালির ইতিহাস বাঙালির সংস্কৃতির ইতিহাস এবং তা আলোচনার জন্য বাঙালিজাতির উৎপত্তির ইতিহাস থেকে আরম্ভ করতে হয়। সমভাষিতা জাতীয়তার প্রধান লক্ষণ বলে মনে রাখতে হবে যে, বাংলা ভাষার উদ্ভবের সঙ্গে বাঙালি জাতির উদ্ভব হয়েছে। [৮]

বাঙালি জনগণের গঠনে কী কী উপাদান সংমিশ্রিত হয়েছে তার আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, বাঙালি জনগণ বিভিন্ন জাতির সমবায়ে গঠিত। নিগ্রোবটু, প্রাথমিক অস্ত্রালাকার, অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় প্রভৃতির সংমিশ্রণে বাঙালি জাতির সৃষ্টি। প্রথমে নেগ্রিটো জাতির লোকেরা আফ্রিকা থেকে স্থলপথে ভারতে আসে। বাংলাদেশে এদের কোনো চিহ্ন না থাকলেও এদেশে তারা বসবাস করেছিল। আসামে নাগাদের মধ্যে এদের অস্তিত্ব সংলক্ষ্য। প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড জাতিগোষ্ঠী ভারতের নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে সংমিশ্রিত আছে। অষ্ট্রিক ভাষী জাতিগোষ্ঠীর আগমন কবে, কোথা থেকে হয়েছিল সে প্রসঙ্গে মতভেদ থাকলেও, এ তথ্য সর্ববাদীসম্মত যে, অষ্ট্রিকভাষী গোষ্ঠী একসময়ে সারা ভারতবর্ষে বিস্তৃত হয়েছিল, বিশেষত গাঙ্গেয় উপত্যকায় তাদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে অষ্ট্রিক ভাষার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় সাঁওতাল, মুণ্ডারী, হো, শবর, খাসিয়া ইত্যাদি ভাষার মধ্যে। উত্তর ভারতের তথা বাংলার অধিবাসীরা প্রথমে অষ্ট্রিক জাতির সঙ্গে, পরবর্তীকালে দ্রাবিড় ও আর্যভাষী জনগণের মিশ্রণে জাত। দ্রাবিড়েরা সম্ভবত ভূমধ্য সাগরীয় জাতির বিভিন্ন শাখা থেকে আগত; তাদের উৎপত্তি দক্ষিণ ইউরোপে, তারা সম্ভবত পশ্চিম থেকে আসে এবং দক্ষিণ ভারতে উপনিবিষ্ট হয়। উত্তর ভারতের নদীমাতৃক সমতল ভূমিতেও অষ্ট্রিকদের মধ্যে তাদের আগমন ঘটেছিল। দ্রাবিড়দের পর আর্যরাও আসে পশ্চিম থেকে। এইভাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে ভারতে 'মহামানবের মেলা,' যেন পূর্ণতা পায়। আর্যরা সভ্যতায়, নগর গঠনে, বাস্তু ও অন্যান্য শিল্পে খুব উন্নত না হলেও তারা কল্পনাশীল ও কৃতকর্মাজাতি ছিল। নবাগত আর্যরা ধীরে ধীরে অনার্য অষ্ট্রিক ও

দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংমিশ্রিত হয় এবং এই অপরিহার্য সংমিশ্রণের ফলে প্রাচীন ভারতীয় বা হিন্দু জনগণ ও হিন্দু সভ্যতায় উৎপত্তি হয়। প্রথম দিকে এই সভ্যতায় আর্য আহৃত উপাদান বেশি থাকলেও পরবর্তীকালে উভয়ের সংমিশ্রণে রীতিনীতি প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হতে থাকে। এর ফলে বৈদিক, ঔপনিষদিক ধর্ম চিন্তা ও সভ্যতার পরে পৌরাণিক তান্ত্রিক ভাবধারা ও ধর্মমতের প্রকাশ ঘটে। এইভাবে উত্তর ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পত্তন ঘটে। ভিন্ন ভিন্ন উপাদান সংযোগে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে বলে উপাদানগত স্বল্পতা বা আধিক্য অনুযায়ী প্রাদেশিক সংস্কৃতিগত ও ভাষার প্রকৃতিগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। [৯]

অতএব দেখা গেল যে, উত্তর ভারতে চার-পাঁচটি জাতির সমবায়ে ভারতীয় জনগণের উদ্ভব হয়। অবশ্য এই সংমিশ্রণ সর্বত্র একভাবে বা এককালে হয় নি। উত্তর ভারতে সংমিশ্রণ সমাপ্ত হওয়ার পর বাংলাদেশে এই কার্যক্রম সুরু হয়। উত্তর ভারতে এই সংমিশ্রণে বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল বৈদিক, লৌকিক সংস্কৃত এবং বিভিন্ন প্রাকৃত রূপের ভাষায়। [১০]

বাংলাদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসের কথা আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, বাংলা ভাষা ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে তার রূপ গ্রহণ করে। প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন এর পক্ষে রায় দেয়। আর্যভাষার প্রাচ্য প্রাকৃতের একটি প্রকারভেদ মাগধী এবং সেই মাগধী প্রাকৃত কালক্রমে নানা রূপান্তরের মাধ্যমে বাংলা ভাষার রূপ পরিগ্রহ করে। আর্যভাষা প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলাদেশে কোল ও দ্রাবিড় শ্রেণীর ভাষা এবং ভোট-চীন, ভোট-ব্রহ্ম গোষ্ঠীর ভাষা প্রচলিত ছিল। বাংলা ভাষা এক ভাষা সূত্রে সকলকে আবদ্ধ করল। বাংলার অনার্যভাষায় লিপি ছিল না। উত্তর ভারতের আর্যভাষা একই ধর্ম ও সংস্কৃতির সূত্রে যেভাবে বাঙালিকে বেঁধে দিল তাকে বাধা প্রদানের ক্ষমতা তৎকালীন বাংলার অনার্যজগতে ছিল না। বিভিন্ন প্রকারের ভাষা ও ধর্মে বিভক্ত বাঙালি যোগসূত্রহীন খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ছিল। উত্তর ভারতের সমন্বয়ধর্মী ও উচ্চতর দার্শনিক চিন্তায় প্রোজ্জ্বল ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বাংলা দেশের অনার্য ধর্মনেতারা এমন কিছু চিন্তার সূত্র পেয়েছিলেন যা তাঁদের অজ্ঞাত ছিল। আর্যভাষা ও আর্যধর্ম এইভাবে অতি সহজেই জয়ী হল। আর্যভাষা গ্রহণের পর দলে দলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রসহ বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করেন। গুপ্ত যুগ থেকেই ভূমিদান করে ব্রাহ্মণ বসানো কার্যক্রমের মধ্যে পরিগণিত হতে থাকে। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ৪০০ খ্রীঃঅব্দে আর্যভাষা এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাম্রলিপ্ত বৌদ্ধজ্ঞানের কেন্দ্রভূমিরূপে পরিগণিত হয়েছিল। খ্রীঃ ৭ম শতকের প্রথমার্ধে হিউয়েন সাঙের আগমনকালে বাংলাদেশ আর্যভাষীতে পরিণত হয়েছিল। খ্রীঃ ৮ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার পালরাজবংশের অভ্যুদয় ঘটে; সেই সময় অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোট-চীনী জাতীয় লোকেরা উত্তর ভারতের ও বিহারের অধিবাসী-দের সঙ্গে সমভাষী হওয়ার জন্য ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়। ফলে জনগণ-এ পরিণত

হয়। সমভাবিতাকে অবলম্বন করে জাতীয়তাবোধের ও একরাষ্ট্রীকতার এই যে ধারণা গড়ে ওঠে তা তখনও পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অনুপস্থিত। [১১]

বাঙালি জনগণের পত্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতি তার রূপ ধারণ করে। তবে কোন্ কোন্ উপাদানে তা রূপায়িত তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বাঙালি ধর্ম-সংস্কৃতি ও সমাজকে জানার যে প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে তার দ্বারা জাতির প্রকৃতির আভাস পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। [১২] ,

দেশ বা জাতির ক্ষেত্রে নতুন ধর্মের আবির্ভাব হলেও প্রাচীন ধর্ম সম্পূর্ণত নির্মূল হয় না; নাম ও রূপ পরিবর্তিত করে নিজেকে বজায় রাখার চেষ্টা করে। আর্যদের 'হবন' বা হোমমূলক অনুষ্ঠান এবং অনার্যদের পূজামূলক ধর্মানুষ্ঠান মিলিত হয়ে নতুন পদ্ধতির সূচনা করে। আর্যদের দেবলোক এবং অনার্য দ্রাবিড় ও অস্ট্রিকদের দেবলোক— উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হল। প্রাচীন ধারা নবীনের মধ্যে ক্ষীণভাবে অথবা পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিতভাবে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রবাহিত আছে। [১৩]

প্রাচীন অনার্য, অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষার বিলুপ্তি, অনার্য শব্দের আর্য ভাষাভাণ্ডারে স্থান গ্রহণ ইত্যাদি আর্য-অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘাত এবং সংমিশ্রণের পরিচয় প্রদান করে। অনার্য ধর্মের স্বরূপ বর্তমানে অনুন্নত ও অশিক্ষিত জনগণের গ্রামদেবতার পূজায় ও লোকধর্মে প্রত্যক্ষ করা যাবে। বর্তমানে যে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম, কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, যোগদর্শন, আদ্যাশক্তির আরাধনা ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়, তা আসলে সাংস্কৃতিক মিলনের পরিচয় বহন করে। [১৪]

বাংলাদেশে প্রচলিত লোকধর্মের আলোচনায় দেখা যাবে যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে লোকধর্মের আপোষ হওয়ার ফলেই ধর্মঠাকুর বিষ্ণু-শিব ও সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছেন। কেউ কেউ ধর্মপূজাকে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ বলে মনে করলেও একে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে অসম্পৃক্ত স্বতন্ত্র কাল্ট্ মনে করাই উচিত। প্রাগার্য যুগে আদিম অস্ট্রিক জাতির মধ্যে যে ধর্ম প্রচলিত ছিল, ধর্মপূজাকে তার ব্রাহ্মণ অনুমোদিত রূপ বলে মনে হয়। ধর্মপূজা প্রকৃতপক্ষে অতীত যুগের ধর্মবিশ্বাস ও আচরণের অবশেষ মাত্র। [১৫]

ধর্মপূজা যেমন আর্য-অনার্যের মানসিক, আধ্যাত্মিক ও সংস্কৃতি বিষয়ক ভাববিনিময় মাত্র; তেমনি সহজিয়া, নাথধর্ম, তান্ত্রিকতা, মনসা-ব্যাঘ্র ইত্যাদি পূজাও কালক্রমে মিশ্রিত হয়। সহজিয়া ও তান্ত্রিকতা যেমন মহাজন বৌদ্ধধর্মের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়; তেমনি নাথধর্ম, মনসাপূজা ও দক্ষিণরায়ের পূজাও মধ্যযুগের হিন্দুধর্মে প্রবিষ্ট হয়। [১৬]

ধর্মপূজা, নাথধর্ম, বৌদ্ধ-বৈষ্ণব সহজিয়া, বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ তান্ত্রিকতা ও নানা লৌকিক দেবতার পূজানুষ্ঠানের মধ্যে বাংলাদেশের ধর্ম সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটেছে। ইসলামধর্মের প্রতিষ্ঠার পর দক্ষিণ রায়ের পূজা গাজী মিয়ার নামে প্রচলিত হয়েছে এবং তা ইসলামী রঙে রঞ্জিত। বাস্তববাদী আর্যরা স্বর্গ-মর্ত্য অন্তরীক্ষে অবস্থিত তেত্রিশ কোটি

দেবতাকে অগ্নির মাধ্যমে অর্ঘ্য অর্পণ করে জীবনে শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাত। অনার্যদের মধ্যে জল স্থল পাহাড় অরণ্য পৃথিবীর অভ্যন্তরে অধোলোকের অধিবাসী দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল। এদের মধ্যে আবার অলৌকিক শক্তির অধিকারী যোগীদের উপর বিশ্বাসও ছিল। মৃত্যুর পরও সেই ব্যক্তি সমাজের ভালোমন্দ করতে পারতেন—এমন ধারণা অন্যান্য আদিম জাতির মতো অনার্য সমাজেও প্রচলিত ছিল। শক্তিধর যোগী বা পূজারীর মৃত্যুর পর তার দেহাস্থি ভূ-প্রোথিত করে তার উপর মৃত্তিকা প্রস্তর বা ইষ্টক নির্মিত স্তূপ গঠন করে তার পূজা করা হত। মৃতের পূজা পদ্ধতি সম্ভবত অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির লোকেদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং এরা ইরান থেকে আফগানিস্থান ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে বিরাজিত ছিল। আর্যরা দেহ ভূ-প্রোথিত বা দাহ করতো, কিন্তু তাদের মধ্যে সমাধি পূজার রীতি প্রচলিত ছিল না। রামায়ণ-মহাভারতে এই সমাধি পূজাকে 'এড়ুক পূজা' বলে অবজ্ঞা করা হয়েছে। বুদ্ধদেবের প্রতি অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শনের ফলে বৌদ্ধচৈত্যপূজায় দেশ পূর্ণ হয় এবং পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেও অনেক গুরুর সমাধি-পূজা প্রচলিত হয়। এই চৈত্যপূজার অভিনব রূপ দেখা গেল ইসলাম ধর্ম—পীরের দরগা। মোহাম্মদী ইসলামের পক্ষপাতারা দরগাকেন্দ্রিক ধর্মানুষ্ঠান পছন্দ করেন না। তবুও সারা ভারত ও পূর্ব ইরানে পীরের দরগা মাজারে হিন্দু-মুসলমান ভক্তদের শীরনী দিয়া পূজার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। [১৭]

বাংলাদেশ মূলত কৃষিপ্রধান দেশ বলে এখানে উপযুক্ত বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে নি। যদিও বাংলাদেশের বণিকরা চীন, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মালয়, সিংহল, গোয়া, পারস্য দেশে গমনাগমন করত তবুও বাংলাদেশ পৃথিবীর বাণিজ্য পথের এক প্রান্তে পড়ে থাকায় বাঙালিরা পৃথিবীর অন্যতম বণিক জাতি হয়ে উঠতে পারে নি। বাংলা দেশের সভ্যতা কৃষিমূলক গ্রামীণ সভ্যতা বলে এখানে মথুরা, দিল্লী, কাশীর মত নগর গড়ে উঠতে পারে নি। [১৮]

বাঙালী জাতির সৃজনের কালে বাংলাদেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, গুপ্তরাজাদের আমলে যে সমস্ত প্রধান রাজকর্মচারী ও জনসাধারণের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের নাম পাওয়া যায় তারা সকলেই বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর ব্যক্তি। পরবর্তীকালে পাল ও সেন রাজাদের আমলে পল্লীগ্রামের কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদেরও স্থান দেওয়া হয়েছে। গুপ্তআমলে বাঙালি বিজিত ও অনার্যভাষী বলে তাদের উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয় নি। পরবর্তীকালে আর্যভাষী হওয়ায় তারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের অপরিহার্য অংশ রূপে পরিগণিত হয়। [১৯]

পাল ও সেনবংশীয় রাজাদের আমলে বাঙালি জনগণ ও তাদের ভাষা বিশিষ্টতা অর্জন করতে থাকে। চর্যাপদকে অবলম্বন করে বাঙালির সাহিত্য রচিত হতে থাকে। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সংকলনগ্রন্থেও বিভিন্ন বাঙালি কবির কল্পনা ও ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। [২০]

তুর্কী বিজয়ের পর বাঙালি জনজীবনে পরস্পরবিরোধী ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি হল। একদিকে বৌদ্ধধর্মের পতনের কালে আনুষ্ঠানিক ধর্মমতের প্রাধান্য, বৈষ্ণব ভক্তিবাদ ও তান্ত্রিক শক্তিপূজাকে অবলম্বন করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা; অন্যদিকে তুর্কী রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষিত ইসলামের আবির্ভাব। ধর্ম উচ্চভাবদর্শন বিচ্যুত হয়ে আনুষ্ঠানিক ধর্মমাত্রে পর্যবসিত হল। নানা ধর্মাদর্শ ও মতবাদের সংঘাতে ও সংঘর্ষে জাতীয় জীবনে এক বিপুল ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি হল। [২১]

ইসলামি ধর্ম ভারতবর্ষে দুটি রূপে আবির্ভূত হয়। একদিকে শাস্ত্রানুমোদিত গোঁড়া ইসলামধর্ম, অন্যদিকে উদার ও সার্বজনীন সুফী মতবাদ। দ্বিতীয় মতবাদ হিন্দুর মনকে আন্দোলিত করে এবং তার ফলে ভারতের ধর্মজীবনের ভক্তিবাদের উপর নতুন অনুভূতির সৃষ্টি হল। শরিয়তী ও সুফিয়ানার সঙ্গে মুসলমান রাজশক্তির প্রভাব বহু হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করে। বাঙালীর মনোজীবনে গোঁড়া ইসলাম ও সুফী মতাদর্শ মিলিত হয়ে এক নতুন ভাবনার সূত্রপাত করে। [২২]

বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ বৈষ্ণব কীর্তনে না পণ্ডিতের টোলে এ সম্পর্কে মতদ্বৈধতা থাকলেও একথা স্বীকার্য যে, কোন একটিকে বাদ দিয়ে বাঙালিহিন্দু সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব নয়। বাঙালি জনগণের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় উপাদান বিরাজিত থাকায় বলা উচিত যে, বাঙালি সংস্কৃতিতে রূপ ও রসের অভিব্যক্তি যেমন আছে তেমনি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাও অনুপস্থিত নয়। [২৩]

বাংলাদেশে হিন্দুত্ব ও ইসলামের মধ্যে একটা সমঝোতার আবহাওয়া লক্ষ্য করা যায়। বাংলার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেন মুসলমান প্রচারককে ভূমি দান করেছেন; আবার প্রথম মুসলমান বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা জফর খাঁ মধুর ভক্তিপূর্ণ ভাষায় গঙ্গাস্তব রচনা করেছেন। ইংরেজ আমলেই মুসলমানকে গোঁড়া মুসলমান তৈরির চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। প্রাক্ ইংরেজ শাসনব্যবস্থায় বাঙালি মুসলমান ইসলামী ধর্মানুষ্ঠান করলেও, ভাবে ও চিন্তায় বাঙালিহিন্দু মানসিকতার অংশীদার ছিল। [২৪]

চৈতন্যাবির্ভাবের ফলে বাঙালির সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবন শ্রেয়ের পথ অবলম্বনে প্রয়াসী হয়েছিল। তুর্কী ও পাঠান সুলতানদের রাজত্বকালে বহির্জগতের সঙ্গে বাঙালির সংযোগ বেশি ঘটে নি, কিন্তু ষোড়শ শতকের শেষভাগ থেকে মোগল সাম্রাজ্যের কালে বাঙালিহিন্দু-মুসলমান উভয়েই বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগের সুযোগ পেলেও তার সদ্ব্যবহার করে নি। মাটির প্রতি বাঙালির আকর্ষণ বেশি হওয়ায় অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালি গ্রামীণ ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সন্তুষ্ট জাতিতে পরিণত হয়। মুষ্টিমেয় অভিজাত শ্রেণী বাদ দিলে বাঙালিহিন্দু ও মুসলমানে খুব একটা পার্থক্য ছিল না। [২৫]

আঠারো শতকের শেষে ও উনিশ শতকের প্রথমে পশ্চিম ইউরোপের চিন্তাদূতরূপে ইংরেজ নাগরিক সভ্যতা নিয়ে গ্রামীণ সভ্যতার অধিকারী বাঙালির মনোজগতে ধাক্কা দিল। উভয় সংস্কৃতির সমন্বয়ধর্মিতার ফলে রামমোহন রায়ের ন্যায় মনীষার প্রচেষ্টায়

বাঙালি সংস্কৃতি ও ভারতীয় সাহিত্য-সভ্যতা-সংস্কৃতির নবভাষ্য রচনা সুরু হয়। বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথ মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় সংস্কৃতির শাশ্বত ও সার্বজনীন অংশকে গ্রহণ করে ইউরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ আত্মসাৎ করার আহ্বান জানালেন। এইভাবে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ সমন্বয়ধর্মিতাব পথে যাত্রা করে এক নতুন যুগোপযোগী পথ গ্রহণ করে। [২৬]

বাংলা তথা ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বয় ও সহযোগিতার পথ গ্রহণ করলেও মুসলমান সমাজ এই প্রচেষ্টায় উদাসীন হয়ে রইল। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেক সুযোগ-সুবিধার সংকোচ ঘটলে তারা ইংরেজ শাসনের ন্যায় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকেও পরিত্যাজ্য মনে করল। মুসলমান শাসকদের বংশধররা উর্দু কবিতার আশ্রয়ে শান্তি খুঁজে পেল। ধর্মকে আশ্রয় করে সংহতি সাধনের চেষ্টায় ওয়াহাবী আন্দোলন দেখা দিল, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহে মুসলমান রাজত্বের আকাঙ্ক্ষা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হল। হিন্দুব মধ্যে সহযোগিতা দেখে ইংরেজ স্বীয় রাজশক্তিতে অটুট রাখার জন্য নানা কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করল ও হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে উভয়ে উভয়ের প্রতি সন্দিহান হওয়ায় ভারত ইতিহাসে এর ফলে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সৃষ্টি হল। [২৭]

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায় বাঙালি মুসলমান নেতৃবৃন্দ অখণ্ড ইসলামী জাতির স্বপ্নে মশ্‌গুল। হিন্দু সংস্কৃতির অংশীদার রূপে বাঙালি মুসলমান আর নিজেকে চিহ্নিত করতে প্রস্তুত নয়। বাঙালি হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতির পরিবর্তে তারা এখন বহির্বঙ্গের ও বহির্ভারতের ইসলামধর্মাবলম্বী জাতির ঐতিহ্য অন্বেষণে তৎপর। মুষ্টিমেয় ইসলামধর্মাবলম্বী ব্যক্তি পাকিস্তানের আদর্শকে বাঙালি মুসলমানের অন্তর্দেশে লালন করতে সমুৎসুক। [২৮]

বিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজ রাজনীতির কৌশলে বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাসে এক সংকট ঘনায়মান। বাঙালি মুসলমানকে প্রকৃত মুসলমান তৈরির চেষ্টায় আরব পারস্যের ইসলামী সংস্কৃতি ও উর্দু ভাষা আনয়নের চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। [২৯]

পুরাতন হিন্দু বাঙালি সংস্কৃতি ও অনাগত মুসলিম বাঙালি সংস্কৃতি কিভাবে কিরূপে প্রকাশিত হবে তা চিন্তার কারণ। তার স্বরূপ চিন্তায় কেউ আনন্দিত, কেউবা শঙ্কিত। কেউ মনে করেন, উভয়ের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার পথ খোলা থাকবে; কেননা একই দেশে, রক্তে ভাষায় ইতিহাসে এক জাতি দুটি ধর্ম সম্প্রদায়গত ও প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রব্যবস্থা অসম্ভব। আসলে এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ মত প্রদান অসম্ভব। তবে ভাষা সম্পর্কে উদারতা গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ মুসলমান লেখক প্রয়োজন মনে করলে বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করবেন, আবার প্রয়োজনমত হিন্দুকে ইসলাম ধর্ম সংস্কৃতি সম্পর্কিত শব্দ শিখে নিতে হবে। এই উদারতা বোধ হয় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের অন্যতম পথ। [৩০]

জাতির শিক্ষাগত উন্নতি হলে শ্রেণীগত পার্থক্য কমে আসে এবং ভাষাও এক

হয়ে যায়। বাংলাদেশে যতদিন এই অবস্থা না আসে ততদিন পর্যন্ত খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতের বিরোধের দিক পরিহার করে সাম্যের ও মিলনের সাধনা করাই একান্ত প্রয়োজন। [৩১]

তবে এই সমস্যা সুচিরাস্থায়ী হতে পারে না। আরবী-ফারসী শব্দের দিকে বাঙালি মুসলমান লেখকেব প্রবণতা একদিন অবশ্যই কমে আসবে। ইসলামী ভাবধারার সঙ্গে বাঙালি হিন্দু পরিচিত হবে এবং এই প্রসঙ্গে রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র সেনের কোরান অনুবাদের কথা বাঙালিকে মনে রাখতে হবে। আরবি-ফারসী জগতের সংস্কৃতির আবহাওয়ায় সমগ্র বাঙালি জাতি লাভবান হবে। [৩২]

অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্ত দিক থেকেই বাঙালি জাতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন। আদর্শগত বিপর্যয় ও যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত অর্থনৈতিক বিভীষিকা বাঙালি হিন্দুর সমাজে যে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে তা সত্যই দুশ্চিন্তার ও বেদনার কারণ। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে কায়েম হবে কিনা তাও সংশয়ের বিষয়। [৩৩]

দু'হাজার বছরের অধিককাল ধরে বাঙালি জনগণের সমভাষিতামূলক জাতীয়তা ও বাংলা ভাষা-সাহিত্যের গতি অব্যাহত। প্রথম মহাযুদ্ধ বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনকে ততখানি পঙ্গু করেনি, যতখানি করেছে গত বছরের দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ অর্থাৎ পঞ্চাশের মন্বন্তর। এর ফলে বাঙালি হিন্দুর মধ্যবিত্ত কৃষক-শ্রমজীবী শ্রেণীগুলি প্রায় বিধ্বস্ত এবং এর পরিণতি স্বরূপ বাঙালি সংস্কৃতিও এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। [৩৪]

জাতির এই দুর্দশায় বিচলিত হলে চলবে না। যতদিন ভাষা সাহিত্য থাকে ততদিন জাতির প্রাণ ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় বিদ্যমান থাকে। সেই ভাষা-সাহিত্যের দ্বারা জাতির মনোগত প্রকৃতি, ইতিহাস, আভ্যন্তর আত্মা-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়ে জাতিকে উপযুক্ত পথ দেখাতে হবে। আর সেটাই ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকের প্রধান ও পবিত্র কর্তব্যরূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। [৩৫]

● প্রবন্ধ বিশ্লেষণ :

প্রাবন্ধিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি'-তে যে সমস্ত বিষয় আলোচনা পরিধির অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেগুলি হলো— ১. ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২. বাঙালীর রাষ্ট্রনৈতিক কৃতিত্ব ৩. বাঙালী জনগণের গঠন উপাদান ৪. বাংলাদেশের ইতিহাস বা সংস্কৃতির ইতিহাস ৫. বাঙালী সংস্কৃতির রূপ গ্রহণ ও নানা উপাদান ৬. বাঙালী সংস্কৃতিতে ইসলাম প্রভাব ৭. বালাদেশের অর্থনৈতিক সভ্যতার ইতিহাস ৮. বাঙালীর ভাষা ৯. আধুনিক যুগের সূচনা—ইংরেজের আগমন ও বাঙালীর সংস্কৃতিতে তার প্রভাব।

বিষয়গুলি পৃথকভাবে আলোচিত হলেও এগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়; বিপরীত পক্ষে এরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও পরিপূরক আলোচনা। প্রবন্ধ বিশ্লেষণের কালে

লক্ষ্য রাখা হবে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিচ্ছিন্ন বা সামগ্রিক মতামতসমূহ কতখানি গ্রহণীয় এবং আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে তথ্যগত সংযুক্তির সম্ভাবনা কতখানি। প্রাবন্ধিকের বক্তব্য বা প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে নতুন তথ্য ও সিদ্ধান্ত যুক্ত হওয়া অসম্ভব নয়, কেননা প্রবন্ধটি রচিত হওয়ার পরবর্তীকালে নৃতত্ত্ব ও অন্যান্য বিষয়ক অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। অর্থাৎ প্রবন্ধ বিশ্লেষণকালে নতুন বক্তব্য যুক্তি তথ্য প্রবন্ধটির পরিপূরক রূপে গৃহীত হবে।

● সমালোচ্য প্রবন্ধটির প্রথমাংশে লেখক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনার ভূমিকারূপে প্রথমে ইতিহাস বলতে কী বোঝানো হয় সেই আলোচনায় প্রবেশ করে ইতিহাসের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'ইতিহাস' ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'অতীতকালের কথা লইয়া ইতিহাস' এবং অতীতকালের কথা হল স্বাভাবিকভাবেই 'অতীতের মানুষের কথা'। প্রাবন্ধিকের উক্ত বক্তব্যকে স্বীকার করে নিয়ে ইতিহাসকে শুধুমাত্র 'অতীতের মানুষের কথা' না বলে, এমন কথা বলা চলে 'মানুষ ও তাহার পরিবেশের কাহিনীই ইতিহাস।' ইতিহাসের উপাদান বলতে বোঝানো হয় প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম, তার সৃষ্ট সমাজের পরিবর্তন, তার কর্মপ্রয়াস, মনন ইত্যাদি সমস্তই হলো ইতিহাসের উপাদান। পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে। যেমন, পৃথিবীর উৎপত্তি ও তার পূর্বকেন্দ্রিক বিষয়ের নাম ভূতত্ত্ব; উদ্ভিদকেন্দ্রিক বিষয় হলো উদ্ভিদতত্ত্ব; জীবের উৎপত্তি ও বিকাশকেন্দ্রিক বিদ্যার নাম জীবতত্ত্ব ইত্যাদি। তেমনি মানবকেন্দ্রিক বিদ্যার নাম নৃতত্ত্ব বা নৃবিজ্ঞান। যে শাস্ত্রে মানুষের উদ্ভব, তার সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ আলোচিত হয় তাই নৃবিজ্ঞান বা নৃতত্ত্ব। মানুষ একক বা মিলিতভাবে যা কিছু করেছে এবং করছে তার সমস্তই নৃবিজ্ঞানের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। 'বিজ্ঞানের যে শাখা মানব প্রজাতির আবির্ভাব, বিকাশ ও প্রকৃতির বিষয়ে আলোচনা করে তাকে নৃবিজ্ঞান বলে। প্রাচীনতম মানবসদৃশ প্রাণীর জীবাশ্ম, আমাদের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষদের দ্বারা নির্মিত ও ব্যবহৃত সমস্ত সংস্কৃতিবস্তু, জীবিত ও ইতিহাসে বর্ণিত সমস্ত মানুষ এবং তার সমাজ, নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। 'অ্যানথ্রোপাস' এবং 'লোগোস'—গ্রীক ভাষায় এই দুটি শব্দযোগে 'অ্যানথ্রোপোলোজি' কথাটি গঠিত। যার অর্থ মানুষের আলোচনা—এক কথায় নৃবিজ্ঞান।"[১] নৃবিজ্ঞানে মানুষকে সামগ্রিক সত্তা হিসেবে দেখানো হয়। প্রাবন্ধিক আলোচ্য প্রবন্ধে মূলত সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের কথা বলেছেন, কেননা তিনি মূলত মানুষের সংস্কৃতির দিকটিই এখানে আলোচনা করতে চেয়েছেন। নৃতত্ত্ব বা নৃবিজ্ঞানের শাখা বিষয়গুলি যথাক্রমে জৈবিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক। জৈবিক নৃবিজ্ঞানে মানুষের জৈবসত্তা বা প্রাণীসত্তা আলোচিত হয়। প্রাণীজগতে মানুষের অবস্থান, ক্রমবিকাশের ধারায় তার উদ্ভব,

১. প্রারম্ভিক নৃবিজ্ঞান : দীপক মুখোপাধ্যায়।

তার জিনীয় গঠন ইত্যাদি জৈবিক নৃবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। প্রাবন্ধিক প্রসঙ্গত জৈবিক নৃবিজ্ঞানের কথা পরোক্ষে বলেছেন। তিনি নৃবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে মানুষের দেহের ও আবেষ্টনী অনুসারে মানুষের প্রকৃতির আলোচনা, মানুষের উদ্ভবের প্রসঙ্গ ইত্যাদি প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন। তবে প্রাবন্ধিকের মূল আলোচনার বিষয় হলো সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান অর্থাৎ Social Cultural Anthropology. সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধি সামাজিক ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, জনতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, শিল্প-সংস্কৃতি, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি প্রায় সমস্তই। ভাষাতত্ত্বের কথাও আলোচ্য প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। সামাজিক অবস্থান ও সাংস্কৃতিক যোগ্যতা, আচরণ ইত্যাদি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান বলে, সমাজ ও সংস্কৃতির যৌথ অস্তিত্ব প্রাণীজগতের মধ্যে একমাত্র মানুষেই বর্তমান। সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সামাজিক নৃবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত অংশ পরিবার, সামাজিক স্তর বিন্যাস, বিবাহ, কর্তৃত্ব, উত্তরাধিকার ইত্যাদি; আর সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হলো জীবিকার্জন, বাসগৃহ, পোষাক, অলংকার নৃত্যগীত ইত্যাদি। মানবসমাজের অতীত ও অগ্রসরণের ইতিহাস জানার জন্যে ভাষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মানবসভ্যতা জানার অন্যতম উপায় হলো ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান চর্চা। সমালোচ্য প্রবন্ধের লেখক নৃতত্ত্বের শাখাগুলির পৃথক আলোচনা না করে সামগ্রিকভাবে প্রবন্ধে নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানকে ব্যাপকার্থে প্রয়োগ করেছেন; যদিও তাঁর প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ে সহযোগিতা করেছে নৃবিজ্ঞানের একটি শাখা; আর তা হলো সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান।

প্রাবন্ধিক সুনীতিকুমার ইতিহাসের আলোচনা প্রসঙ্গে নৃবিজ্ঞানের উল্লেখ করে পুনরায় ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবেশ করে ইতিহাসের ব্যাপক পরিধি নির্ণয়ে ব্রতী হয়েছেন। তাঁর মতে, জাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের কথা ইতিহাসেই পাওয়া যায়। ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ধারণার পার্থক্য নির্ণয় প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন যে, আগে ইতিহাস ছিল রাজন্যবর্গের কীর্তির আলোচনা, আর বর্তমানে ইতিহাস হলো সামগ্রিকভাবে জাতির প্রগতির আলোচনা। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের ইতিহাসই হলো জাতির বা মানবসমাজের ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথও 'রাজাদের জীবনবৃত্তান্তকে' ইতিহাস বলতে চাননি। অতীত ঘটনার সংরক্ষিত বা লিপিবদ্ধ রূপকেই ইতিহাস বলা চলে না। ইতিহাস হলো এমন এক বিজ্ঞান যাকে ঘটনার কারণ ও যোগসূত্র অনুসন্ধান করতে হয়। মানবজীবন ও সভ্যতার রূপান্তরের নানা পর্যায় ইতিহাসে রূপায়িত হয়।

● ইতিহাসকেন্দ্রিক আলোচনার পর প্রাবন্ধিক সংস্কৃতির আলোচনায় প্রবেশ করে 'সংস্কৃতি' সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন। সমালোচ্য প্রবন্ধের এই অংশটি আলোচনার কালে স্বভাবতই প্রাবন্ধিকের 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস' গ্রন্থের অন্তর্গত সংস্কৃতি। প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করতে হয়। উক্ত প্রবন্ধে তিনি সংস্কৃতি প্রসঙ্গে যে

দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, তা বর্তমানে আলোচিতব্য অংশের পরিপূরক রূপে বর্ণনা করা যেতে পারে।

জ্ঞান ও বোধশক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ে সূক্ষ্ম পর্যালোচনার জন্য নতুন শব্দের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পার্থিব সভ্যতা বহু জাতির বা মানুষের থাকলেও, একথা সত্য যে, সুসংবদ্ধ জীবনাচরণের অতিরিক্ত কোনো বিষয় জাতির জীবনে আছে। একে তার বাহ্যসভ্যতার ভিতরের প্রাণ এবং বহিরঙ্গ প্রকাশ বলা চলে। আধুনিক ইউরোপীয় ভাষায় একে Culture বলা হয়েছে। একাধারে সভ্যতা তরুর পুষ্প এবং তার ভিতরকার প্রাণ বা মানসিক অনুপ্রেরণাকেই Culture বলে। অবশ্য ইউরোপে Culture শব্দটি সভ্যতার নানা আন্তর সম্পদের ব্যাপক সংজ্ঞা রূপেই আবির্ভূত হয়েছে। 'তার মানসিক আর আনুভবিক দৃষ্টিভঙ্গি বা বিচার, তার উপলব্ধি, আর তার বাহ্য সাধনা আর প্রকাশ, তার দর্শন সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি, তার মানসিক প্রবৃত্তি আর তার অবচেতনাও তার নৈতিক আদর্শ আর তৎপ্রকাশক সহজ ক্রিয়া আর কৃত্রিম পরিণামটি, এ সমস্তর কথা এসে যায়; এ সমস্তকে বাহ্য সভ্যতা ছাড়া আর একটা সর্বব্যাপক সংজ্ঞা দিতে ইচ্ছা হয়। সেই সংজ্ঞাটি ইউরোপে Culture শব্দের রূপে দেখা দিয়েছে।'[২]

Civilisation ও Culture শব্দ দুটি সমার্থক নয়। Civilisation-এর বাংলা প্রতিশব্দ সভ্যতা, আর Culture-এর বাংলা প্রতিশব্দ সংস্কৃতি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'সভ্যতা বলতে উন্নত মানবসমাজের বহিরঙ্গরূপকে বোঝানো হয়; মানবসমাজের বহিরঙ্গরূপের প্রকাশ হলো তার জীবনযাত্রা।' সামাজিক রীতিনীতি, রাষ্ট্রনীতি, বস্তুশিল্প, পূর্তশিল্প ইত্যাদি। সংস্কৃতি বলতে বোঝানো হয়—উন্নত জীবনের অন্তরঙ্গ দিক অর্থাৎ 'আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন', 'সামাজিক জীবনের সৌন্দর্যময় প্রকাশ'। অর্থাৎ কাব্যসাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শন ইত্যাদি মানবমনের সৃজনীশক্তির সম্পদ। সভ্যতা হলো পার্থিব বা ভৌতিক; আর সংস্কৃতি হলো সভ্যতার অন্তর্নিহিত আত্মিক সম্পদ। অবশ্য অনেকেই এই সর্বজনস্বীকৃত পারিভাষিক শব্দ দুটিকে যথার্থ অর্থে অনেক সময় ব্যবহার করেন না।

আধুনিক ইউরোপীয় সমাজবিজ্ঞানীরা Civilisation ও Culture-এর যে স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন তাও আলোচনা করা যেতে পারে। Civilisation শব্দটি পরোক্ষভাবে ল্যাটিন ভাষাভাণ্ডার জাত। ক্ল্যাসিকাল লাটিনে Civilis বিশেষণ ও বিশেষ্য Civilitas নাগরিকোচিত কতকগুলি গুণাবলী, বিশেষত নিম্নশ্রেণীর প্রতি সমাজের উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিদের সৌজন্য ও মধুর সৌহার্দ্য প্রদর্শনকে বোঝাত। Civilisation-এর আধুনিক অর্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদের সৃষ্টি, বিশেষত ভলতেয়ার ও অন্যান্য এনসাইক্লোপিডিস্টদের সৃষ্টি। অষ্টাদশ শতকের ইংল্যাণ্ডের

২. সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের অন্যতম বুদ্ধিজীবী ডঃ জনসনের জীবনীকার বসওয়েল ইংরেজি ভাষায় সর্বপ্রথম Civlisation শব্দটি প্রয়োগ করেন। সেই সময় মধ্যযুগ, সামন্ততন্ত্র ইত্যাদিকে অন্ধকার যুগ মনে করা হতো এবং অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদী চিন্তানায়করা নিজেদের কালকে জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত এবং কুসংস্কারাদি থেকে মুক্ত যুগ মনে করতেন। ইতিহাসের এই বিভাজনগত অবস্থার নাম ছিল Dark Age এবং Age of Enligh- tment.জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত যুগের মনীষীবৃন্দ যে সমস্ত মূল্যনির্ণায়ক বিচারের মানদণ্ড উপ- স্থাপিত করেন সেগুলি সভ্যতা সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপের ধারণাকে প্রভাবিত করে। তাঁরা সভ্যতা বলতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং পরিমার্জনার ফলে উন্নত পরিমার্জিত চিত্তের বৃত্তি- সমূহকে Culture বলতেন। কোন কোন আধুনিক লেখক Culture-কে স্বতন্ত্র বিষয়- রূপে গ্রহণ করেছেন ; এমনকি Civilisation-এর বিপরীত অর্থে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এটি যথাযথ নয় ; সভ্যতা যদি একটি সামগ্রিক সত্তা হয় তবে সংস্কৃতির দিক উপেক্ষনীয় নয় আবার ব্যবহারিক, প্রযুক্তিগত, শিল্পসংক্রান্ত পার্থিব অগ্রগতির অর্থে সভ্যতাকে গ্রহণ করলে সংস্কৃতির বিকাশে সভ্যতার ভূমিকা স্মরণীয়। আধুনিক সমাজবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ববিদরা সভ্যতাকে বর্বরতার বিপরীতরূপে গ্রহণ করেননি। সভ্যতা মানুষের জৈবসত্তা থেকে স্বতন্ত্র অন্যকিছু, কেননা মানুষে প্রকৃতিসর্বস্ব জৈবসত্তার গণ্ডীকে অতিক্রম করে উন্নতভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা এবং নিজেদের মানসিক বিকাশে যত্নবান হওয়াকেই আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী ও নৃতত্ত্ববিদগণ Human superstructure বলেছেন ভিত্তির উপর স্থাপিত অট্টালিকা ইত্যাদির ন্যায় মানুষের নিজস্ব রচনা, উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে সৃজিত নানাবিধ ঐশ্বর্যই হল মানব সভ্যতা।

Culture-এর প্রতিশব্দরূপে বর্তমানে প্রচলিত 'সংস্কৃতি' শব্দটি ঋগ্বেদে নেই ; ব্রাহ্মণ গ্রন্থে আছে। এ বিষয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ থেকে উদ্ধৃত শিল্পস্তুতিমূলক একটি শ্লোকের প্রতি ক্ষিতিমোহন সেন লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিল্পস্তুতি সম্পর্কিত শ্লোকটি 'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি'—'এই শিল্পসমূহই হইতেছে আত্মার সংস্কৃতি'।

ইংরেজি Culture শব্দের মূলে আছে লাতিন 'কুলতুরা' শব্দ, এই শব্দটি লাতিন COL ধাতু নিষ্পন্ন—COL-এর অর্থ কৃষ চাষ করা, যত্ন করা ইত্যাদি। Culture-এর অনুরূপ প্রতিশব্দরূপে উৎকর্ষ সাধন' বা উৎকর্ষ চলতে পারে। বাংলায় দীর্ঘকাল Culture-এর প্রতিশব্দরূপে "কৃষ্টি" কথাটির প্রচলন ছিল। কৃষ্টি শব্দটি কৃষ্ ধাতুজাত- এর অর্থ 'চাষ করা।' বেদে কৃষ্টি শব্দের অর্থ জাতি,জন, জনগণ ইত্যাদি। বৌদ্ধসংস্কৃতিতে সভ্যতা বা সংস্কৃতি অর্থে কৃষ্টি শব্দের প্রয়োগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ কৃষ্টি শব্দটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি। বঙ্কিমচন্দ্রও Culture অর্থে অনুশীলন শব্দটি গ্রহণ করেছিলেন। Culture-এর প্রতিশব্দ রূপে 'সংস্কৃতি' শব্দটি রবীন্দ্রনাথের কাছে অধিকতর গ্রহণীয় বলে মনে হয়। 'সংস্কৃতি' শব্দটি প্রথম লেখকের গোচরে আসে ১৯২২ সালে প্যারিসে এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর কাছে। Culture-এর প্রতিশব্দরূপে সংস্কৃতি শব্দটিতে সুনীতি

কুমার আকৃষ্ট হন এবং দেশে ফিরে রবীন্দ্রনাথকে জানালে তিনি তা সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন এবং Culture-এর প্রতিশব্দরূপে 'কৃষ্টি" শব্দের পরিবর্তে 'সংস্কৃতি' শব্দের ব্যবহার যে যথাযথ তাও জানিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ যে কৃষ্টি শব্দ ব্যবহারের ঘোরতর বিরোধী এবং সংস্কৃতি শব্দ ব্যবহারের পক্ষে ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 'শব্দতত্ত্বে' সংকলিত 'কালচার ও সংস্কৃতি' নামক নিবন্ধে—'কালচার শব্দের একটা নতুন বাংলা কথা হঠাৎ দেখা দিয়েছে, চোখে পড়েছে কি? কৃষ্টি। ইংরেজি শব্দটার আভিধানিক অর্থের বাধ্য অনুগত হয়ে ঐ কুশ্রী শব্দটাকে কি সহ্য করতেই হবে।*** অন্য প্রদেশে ভদ্রতা বোধ আছে। এই অর্থে সেখানে ব্যবহার সংস্কৃতি। যে মানুষের কালচার আছে তাকে বলা চলে সংস্কৃতিমান*** ইংরেজি ভাষায় চাষ এবং ভব্যতা একই শব্দ চলে গেছে বলে কি আমরাও বাংলা ভাষায় ফিরিঙ্গিয়ানা করব? *** গত জ্যৈষ্ঠের (১৩৪২) 'প্রবাসীতে' একস্থানে ইংরেজি 'কালচার' শব্দের প্রতিশব্দরূপে কৃষ্টি শব্দের ব্যবহার দেখে মনে খটকা লাগল। *** কৃত কথাটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো বাংলা ভাষার পায়ে বিঁধেছে। *** ভাষায় কখনো কখনো দৈবক্রমে একই শব্দের দ্বারা দুই বিভিন্ন জাতীয় অর্থজ্ঞাপনের দৃষ্টান্ত দেখা যায়. ইংরেজিতে কালচার কথাটা সেই শ্রেণীর।*** বৈদিক সাহিত্যে সংস্কৃতি শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়, তাতে শিল্প সম্বন্ধেও সংস্কৃতি শব্দের প্রয়োগ আছে।*** মারাঠি হিন্দী প্রভৃতি অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় সংস্কৃতি শব্দটাই কালচার অর্থে স্বীকৃত হয়েছে।'

কৃষ্টি ও সংস্কৃতি শব্দ দুটির ব্যবহার প্রসঙ্গে আলোচনার পর প্রাবন্ধিক সুনীতি-কুমার সাম্প্রতিক কালে কয়েকজন মুসলমান লেখক কর্তৃক সংস্কৃতির পরিবর্তে 'তমদ্দুন' শব্দটির ব্যবহারগত প্রাসঙ্গিকতা আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, কয়েকজন মুসলমান লেখক সংস্কৃতির পরিবর্তে 'তমদ্দুন' শব্দটি ব্যবহারের অধিক পক্ষপাতী; সুনীতিকুমার এর বিরোধিতা করে বলেছেন যে,-'তমদ্দুন' শব্দটিতে সংস্কৃতির ন্যায় সূক্ষ্মভাবে সভ্যতার অন্তর্নিহিত মানসিক সৌরভের অভিপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না। সিভিলাইজেসন্ যে অর্থে নাগরিক সভ্যতা, তমদ্দুন শব্দটি সেই অর্থে নগরজাত সভ্যতার দ্যোতনা বহন করে। কেননা, 'তমদ্দুন' শব্দের মূলে আছে মদিনা বা নগর। সেইজন্য তিনি মনে করেন যে, বাঙালী হিন্দু বা বাঙালী মুসলমানের সভ্যতা-সংস্কৃতির বিচার প্রসঙ্গে 'তমদ্দুন' শব্দটির ব্যবহার অসঙ্গত, বাঙালীর সভ্যতা-সংস্কৃতি মূলত গ্রামীণ জীবনকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে; সে সভ্যতা সংস্কৃতি নগরাশ্রয়ী নয়; নগরাশ্রয়ী নাগরিকতা অর্থাৎ সিভিলাইজেসন্ বা 'তমদ্দুন' নয়।

● ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনার পর প্রাবন্ধিক সুনীতিকুমার বাঙালীর রাষ্ট্রনৈতিক কৃতিত্বের আলোচনায় প্রবেশে প্রয়াসী হয়েছেন। বাঙালীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, তার সংস্কৃতির গৌরবই অধিক; কেননা জাতি হিসেবে বাঙালী কোনোদিনই রাষ্ট্রনৈতিক কৃতিত্বের শিখরে আরোহণ করতে পারে নি। প্রাচীনকালে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে বাঙালীর কৃতিত্ব বা

অধিকার স্থাপন সবিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। বাঙালীর জাতীয় জীবনে এমন কোনো শাসক বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আবির্ভূত হন নি যাকে বাঙালীর জাতীয় জীবনের পরিচালক বা নিয়ন্তা বলা যেতে পারে। প্রাচীন গ্রীসের পেরিক্লিস ও আলেকজাণ্ডার, ইংলণ্ডের রাজা আলফ্রেড বা রাণী এলিজাবেথ, রুশ দেশের সম্রাট পিটর, প্রাচীন ভারতের মহারাজ অশোক, মধ্যযুগের সম্রাট আকবর, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন যেমন তাঁদের কার্যাবলী, সাম্রাজ্যবিস্তার, শাসনক্ষমতা, সংস্কার কার্য ও জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য স্ব স্ব জাতির ভাগ্যবিধাতা বা পরিচালক বা নিয়ন্তারূপে অভিহিত হয়েছেন, বাঙালী জাতির মধ্যে তেমন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দুর্লভ। বাঙালী জাতির সৃজ্যমানতার কালে বাংলাদেশ বিহার ও উত্তরভারত কর্তৃক শাসিত হতো—এই সময় ইতিহাসে মৌর্য ও গুপ্ত সম্রাটদের কাল রূপে চিহ্নিত। বাংলাদেশের আদি যুগের ঐতিহাসিক কাল খ্রীঃ ৫ম শতাব্দী (গুপ্তযুগ) থেকে ১২শ শতাব্দী (লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়) পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনায় দেখা যাবে যে, খ্রীঃ ৫ম শতাব্দীর মধ্যে সমস্ত বাংলাদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। গুপ্তবংশের আদি পুরুষ শ্রীগুপ্ত (খ্রীঃ ৩য়-৪র্থ শতক) সম্ভবত বরেন্দ্র বা তার নিকটবর্তী অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। বাঁকুড়ায় চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করে সম্ভবত সমুদ্রগুপ্ত পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলার উপর প্রাধান্য অর্জন করেন। সমতট প্রথমে গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে করদরাজ্যে পরিণত হলেও, পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ গুপ্ত সম্রাটদের অধীনস্থ হয়। সুতরাং খ্রীঃ ৫ম—৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র বাংলা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তবে এই সময়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে চন্দ্রবর্মা নামে এক নৃপতির উল্লেখ পাওয়া যায় বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের লিপিতে। চন্দ্রবর্মা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নরপতি ছিলেন এবং সম্ভবত তিনিই সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত চন্দ্রবর্মা এবং এলাহাবাদ লিপিতে মনে হয় এই চন্দ্রবর্মার নামোল্লেখ আছে। বাংলায় গুপ্ত রাজত্বের প্রধানতম কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। হূণ আক্রমণে এই বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তিমদশা ঘনিয়ে এলে পূর্ব-ভারতের অনেক নৃপতি হৃতশক্তি পুনরুদ্ধারে ব্রতী হন এবং দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের স্থানীয় শাসনকর্তৃগণ স্বাতন্ত্র্য লাভের চেষ্টা করতে থাকেন। মনে হয়, পূর্ব বাংলার গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব সম্ভবত স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন; কিন্তু ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতায় তেমন কোনো প্রভাব দেখতে পারেন নি। এই নৈরাজ্যের রাষ্ট্রীয় সংকটক্ষণে শশাঙ্কর আবির্ভাব হলো। সুনীতিকুমার তাঁর প্রবন্ধে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনাকালে শশাঙ্কর উল্লেখ কেন যে করেননি তা বোধগম্য নয়। অথচ তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মপ্রতিষ্ঠার রাজা আদিশূরের উল্লেখ করেছেন, বাংলা তথা ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে যাঁর কোনো ভূমিকা নেই।

প্রকৃতপক্ষে ৬০৬ খ্রীঃ অব্দের পূর্বেই শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত গৌড়েশ্বর রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনিই প্রথম গৌড়কে সর্বভারতীয় মহিমা দান করেছিলেন। মহাকাব্যের

যুগে যেমন পৌণ্ড্রক বাসুদেব স্থানীয় রাজন্যবর্গকে মিলিত করে একটা পূর্বাঞ্চলিক শক্তি সংহত করেছিলেন, তেমনি শশাঙ্কও অনুরূপভাবে গৌড়কে আর্যাবর্তের ভীতিস্থল করে তুলেছিলেন। শশাঙ্ক থেকেই বাংলার স্বাতন্ত্র্য সূচনা হলো। বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্কর বিশিষ্ট ভূমিকা স্মরণীয়। শশাঙ্কর সময়েই গৌড় রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্য ও সামরিক উৎকর্ষ লাভ করে। পরবর্তীকালে গৌড়বঙ্গ উত্তরাপথের প্রভাব খর্ব করে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে, কখনও বা উত্তরাপথের রাষ্ট্রিক প্রভাব বিস্তারে প্রতিরোধ করে স্বীয় প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়, তার প্রাথমিক সূচনা শশাঙ্কর প্রচেষ্টায় সংলক্ষ্য বলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক ইতিহাস আলোচনাকালে শশাঙ্ককে স্মরণ করতে হয়।

শশাঙ্কর মৃত্যুর পর গৌড়ে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের অবসান হলে অরাজকতার সুযোগে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল প্রজাপুঞ্জের অভিপ্রায়ে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তারপর ধর্মপাল, মহীপাল, দেবপাল প্রমুখ বাঙালীর ইতিহাস উজ্জ্বল করে রাজত্ব করেন। ধর্মপাল প্রথমে প্রতীহাররাজ বৎসরাজের কাছে এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবর নিকটে পরাজিত হলেও, ধ্রুব দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাগমন করেন এবং ধর্মপাল সাম্রাজ্য বিস্তারে মন দিয়ে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, অবন্তী, গান্ধার ইত্যাদি রাজ্য জয় করেন। ধর্মপালের মৃত্যুর পর উত্তরাপথে বাঙালীর আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয়েছিল এমন মনে করার কোনো সাক্ষ্য প্রমাণাদি নেই। পালবংশ অবসানের কিছু পূর্বে বাংলাদেশে খড়্গবংশ, বর্মণবংশ প্রভৃতি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হলেও তারা স্থানিক প্রভাবের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি। সেনবংশের বিজয়সেন ১১২৫ খ্রীঃ অব্দে গৌড়েশ্বর হন এবং তাঁর পুত্র বল্লালসেন ১১৫৮ খ্রীঃ অব্দে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। পালযুগে বাংলাদেশে সহজযান মত প্রচারের ফলে বৈদিক ও স্মার্ত সংস্কার দুর্বল হয়ে পড়লে তিনি নতুন করে উত্তরাপথের ভাবধারার দ্বারা বাঙলাকে পুনঃ সংস্কৃত করতে প্রয়াসী হন। বল্লালসেনের পর তাঁর পুত্র লক্ষ্মণসেন ১১৭৮ খ্রীঃ অব্দে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন এবং গৌড়-কামরূপ-কলিঙ্গে তাঁর স্থায়ী প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হয়েছিল। এমনকি মগধ পর্যন্ত তার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে ধর্মপাল, লক্ষ্মণসেনের নাম স্মরণীয়। খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে নবদ্বীপ বিজিত হওয়ার সঙ্গে গৌড়ে হিন্দু রাজত্বের অবসান হয়। ধর্মপাল, লক্ষ্মণসেন উত্তরাপথের অগ্রগমন ক্ষণকালের জন্য প্রতিহত করতে সক্ষম হলেও তাঁরা অথবা সমকালে আবির্ভূত অন্য কোনো নৃপতি বাঙালী জাতির গঠন ও পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, এমন কোনো প্রমাণ ইতিহাসে নেই। পেরিক্লিস, আলেকজাণ্ডার, আলফ্রেড, পিটার, অশোক, আকবর প্রমুখের ন্যায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে ব্যক্তিত্বপূর্ণ নরপতির আবির্ভাব দুর্লক্ষ্য—যিনি বাঙালী জাতির পরিচালক বা নিয়ন্তারূপে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

খ্রীঃ ১২০৩ অব্দে ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন বক্তিয়ার খিলজীর নদীয়া জয় থেকে শুরু করে

১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ বছর ধরে বাংলার রাষ্ট্রিক ইতিহাস কখনও পাঠান-তাতার-তুর্কী-আমীর ওমরাহ, কখনও দিল্লীর সুলতানের রাজপ্রতিভূর অধীন, কখনও বা হাবসী খোজার দৌরাত্ম্যে বিব্রত বিপর্যস্ত। ১৬শ শতকে মুঘল শাসন স্থাপিত হবার পর বাংলাদেশ মুঘল সাম্রাজ্যবাদের শাসনের আওতায় আসে। ইতিহাসে এই অধ্যায়েও রাজা কংস বা দনুজমর্দনদেব ব্যতীত এমন কোনো রাজার সন্ধান পাওয়া যায় না যিনি সারা বাংলায় আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইলিয়াসশাহী বংশের অধঃপতনের সুযোগে দিনাজপুরের ভাতুড়িয়া পরগণার প্রসিদ্ধ হিন্দু জমিদার রাজা গণেশ ইলিয়াসশাহী যুগে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। ফরাসী গ্রন্থে ভ্রমক্রমে তাঁকে 'কানস্' বা কাঁশ বলা হয়েছে। এই কাঁশ বা কংসই রাজা গণেশ—তিনি যে একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। মুসলমান যুগে মুসলমান পরিবেষ্টিত হয়ে এবং দিল্লীর রোষ শিরে ধারণ করে যে হিন্দু রাজা স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন, তিনি যে কর্মনৈপুণ্যে ও মনোবলে অসাধারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইলিয়াসশাহী বংশের শেষ সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে নিহত হলে প্রতিভাশালী রাজা গণেশ ১৪১৬ খ্রীস্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি সগর্বে 'দনুজমর্দনদেব' উপাধি গ্রহণ করে স্বাধীন নরপতির পদমর্যাদা গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের টাঁকশাল থেকে মুদ্রিত তাঁর বাংলা লিপিময় মুদ্রা সমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি সারা বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন। প্রাবন্ধিক সুনীতিকুমার দনুজমর্দন-দেবের আবির্ভাবকে মহারাষ্ট্রের শিবাজীর আবির্ভাবের সঙ্গে তুলনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শিবাজী ১৭শ শতকে যেভাবে মারাঠা জাগৃতির আহ্বান ধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন এবং মহারাষ্ট্রীয় প্রজাদের গানে-গাথায় যেভাবে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়েছিল, দনুজমর্দনদেব সেই তুলনায় নিষ্প্রভ এবং ঐতিহাসিকরাও তাঁর ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ে আজ পর্যন্ত কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি।

প্রাবন্ধিক প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটির উল্লেখ করেছেন। এই কবিতাটি শিবাজী উৎসব উপলক্ষে ১৩১১ বঙ্গাব্দে রচিত—কবিতাটিতে শিবাজী বন্দনায় সঙ্গে কবি মহারাষ্ট্রে ও বাংলাদেশে রাজনৈতিক আদর্শ ও শান্তিময় গ্রামীণ জীবনের তুলনামূলক আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন। শিবাজীর জাতীয় জাগরণের বিশাল উদ্দীপ্ত আহ্বানমন্ত্র বাঙালীর জাতীয় জীবনকে অনুপ্রাণিত করেনি। পরবর্তী-কালে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়ে বাঙালী বণিক ইংরেজের অর্থনৈতিক দাসত্বের শিকার হয়। অন্তর্কলহে জর্জরিত বাঙালী, বিভেদ-অনৈক্যে পীড়িত বাঙালী ইংরেজ উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশে পরিণত হয়।

উল্লিখিত প্রসঙ্গের আলোচনার সমাপ্তিতে প্রাবন্ধিক মন্তব্য করেছেন যে, বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে উচ্চ রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মের সমাবেশ দেখা না দিলেও, তুর্কী বিজয়ের

পূর্বে বাংলাদেশ উত্তর ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক দ্বন্দ্বে একদা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল; অবশ্য তুর্কী বিজয়ের পর থেকে ইংরেজ আমল পর্যন্ত বাঙালীর ইতিহাস বেদনার, পরাজয়ের ইতিহাস। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে, স্বাধীনতা সংগ্রামে, নবজাগরণের ক্ষেত্রে বাঙালী স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করেছে। তাই বাঙালীর ইতিহাস রাষ্ট্রনৈতিক গৌরবাপেক্ষা সাংস্কৃতিক গৌরবে সমুজ্জ্বল।

● বাঙালী জাতির রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস আলোচনার পর প্রাবন্ধিক সুনীতিকুমার বাঙালী জনগণের গঠনগত আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন। অবশ্য আলোচ্য অংশে সুনীতিকুমারের সামগ্রিক বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হলেও, তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিতর্কিত আলোচনার সূত্রপাত করেছেন এবং বাঙালী জনগণের গঠনগত উপাদান আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর যুক্তি ও সিদ্ধান্ত সমগ্রত গ্রহণীয় নয়। তিনি বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দানকালে ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানের কথাও আলোচনা করেছেন। এ আলোচনাটি পৃথক অংশে আলোচিত হওয়া উচিত ছিল। তিনি বাঙালী জনগণের গঠনগত উপাদানে Proto-Austroloid বা 'প্রাথমিক আস্ত্রালাকার' নামে অভিহিত জাতির উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত তিনি নৃতত্ত্ববিদ ডঃ বিরজাশংকর গুহ (১৮৯৪—১৯৬১) কৃত ভারতীয় জনগণের জাতিগত শ্রেণীবিন্যাসের তত্ত্বকে (১৯৩১এ প্রকাশিত) গ্রহণ করে প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড জাতিগোষ্ঠীর কথা তুলেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই জাতিগোষ্ঠীর ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ মানুষের জাতিসমূহের মধ্যে অষ্ট্রালয়েড একটি অন্যতম প্রাচীন গোষ্ঠী—তার কোন আদিরূপ অবাস্তব। সুনীতি-কুমারও ডঃ বিরজাশংকর গুহর মতো বিভিন্ন জাতিগত উপাদানকে বাইরে থেকে নিয়ে এসেছেন—যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারত জনমানবশূন্য একটি দেশ ছিল। তাঁর মতে, 'বাহির হইতে ভারতে মানবের আগমন হইয়াছিল'—এই তত্ত্বটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সুনীতিকুমার কৃত বাঙালী জনতত্ত্বের আলোচনাকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে কয়েকটি সংযোজন, সংশোধন ও পরিমার্জনার দ্বারা আলোচনাটি নিম্নোক্তভাবে উপ-স্থাপিত হতে পারে—

বিভিন্ন মানুষের জাতিগত সংমিশ্রণে যে বাঙালী নামক মিশ্র জাতির উদ্ভব ঘটেছে, তা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। বিশেষজ্ঞরা বাঙালী সমাজের বিভিন্ন মানবদেহের নৃতাত্ত্বিক উপাদান বিশ্লেষণ করে বাঙালী জনতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা প্রায়ই পরস্পরবিরোধী। রিজ্‌লে সাহেব বাঙালী জাতি সম্বন্ধে যা বলেছেন রমাপ্রসাদ চন্দ তা স্বীকার করেননি এবং পূর্বতন আচার্যদের বিরোধিতা করে বিরজাশংকর গুহ আবার ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

বাঙালী জনতত্ত্বের আলোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশের প্রাগিতিহাস ও ইতিহাস যুগের নরগোষ্ঠী প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত—প্রাগার্য নরগোষ্ঠী এবং আর্য নরগোষ্ঠী। বাঙালী জীবনের মেরুদণ্ড হলো প্রাগার্য নরগোষ্ঠী। নৃতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে, বাংলার আর্যেতর

জন মূলত নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং ভোট-চীনীয়—এই মোট চারিটি শাখায় বিভক্ত।

নিগ্রোদের অনুরূপ দেহগঠনযুক্ত একপ্রকার আদিম জাতি আজ থেকে বহুযুগ পূর্বে ভারতে বসবাস করত। অনুমান করা হয়, আসামের পার্বত্য জাতির মধ্যে তাদের শেষ চিহ্ন বিরাজিত। আসাম ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানে কদাচিৎ নেগ্রিটো জাতির বৈশিষ্ট্যসহ আদিবাসী মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের প্রান্তে প্রাপ্ত প্রত্নপ্রস্তর যুগের অমসৃণ পাথরের অস্ত্র দেখে মনে হয় তারা কৃষিকার্যে অনভিজ্ঞ ছিল এবং আদিম স্তরের জীবনযাপন করত।

বাঙালী জাতির প্রধান অংশ অস্ট্রিকগোষ্ঠী সম্ভূত বলে মনে হয়। কেউ কেউ এদের নিষাদ জাতি বলেছেন। অস্ট্রিক জাতি কৃষিসভ্যতার ধারক হলেও সাধারণভাবে সভ্যতা ও কৃষ্টির অংশীদার ছিল না। ইন্দোচীন থেকে অস্ট্রিক জাতির লোকেরা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত পার হয়ে আসাম হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। সম্ভবত পাঁচ-ছয় হাজার বছর পূর্বে তারা প্রথম আদিম স্তরের সংঘবদ্ধ জনজীবনও ভূমিচারী সভ্যতা সৃষ্টি করে। এরাই ভারতের আদিবাসী কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতির পূর্বপুরুষ; বাঙালীর রক্তে এদের প্রভাব যথেষ্টভাবে বিদ্যমান। বাঙালী জাতির জীবনাচরণে যেমন, বাংলাভাষাতেও তেমনি এদের প্রভাব অনুপস্থিত নয়। বাংলাদেশের তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, নাথপন্থা, ধর্মঠাকুরের পূজা, শিবের গাজন, মেয়েদের ব্রত আচার ইত্যাদি প্রায় সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অস্ট্রিক জাতির পরোক্ষ প্রভাব স্বীকৃত।

অস্ট্রিকজাতির পর দ্রাবিড় ভাষা জাতির কথা উল্লেখ্য। দ্রাবিড়ভাষী জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। তারপর তারা ভারতের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য বর্তমানে কেউ কেউ দ্রাবিড় জাতির অস্তিত্বে সন্দিহান। দ্রাবিড় ভাষাভাষী জাতি থাকলেও দ্রাবিড় নামক নরগোষ্ঠী ছিল কিনা সে বিষয়ে অনেকেই দ্বিমত পোষণ করেন। অস্ট্রিক জাতির সমকালে বা কিছু পরে আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ভারতে যে দ্রাবিড় ভাষী জাতি প্রবেশ করে তাদের আদি নিবাস ছিল ইরান, ইরাক, এশিয়া মাইনর, গ্রীস অঞ্চলে। এদের সঙ্গে সুমেরীয়, আসিরীয়, বাবিলনীয় প্রভৃতি ভূমধ্যসাগরীয় নরগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সভ্যতায় উন্নত দ্রাবিড় জাতি অস্ট্রিক জাতিকে গ্রাস করে। বাঙালীর উচ্চ-নিম্ন বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে এই অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির মিশ্রিত রক্ত প্রবাহিত। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে বাঙালীর জনপ্রবাহে ভোট-চীনীয় গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করতে হয়। ভোট-চীনীয় জাতির মূল শাখা ইয়াংসিকিয়াং নদীর উৎপত্তিস্থলে বাস করত। সম্ভবত খ্রীঃ ১ম সহস্রাব্দের কাছাকাছি সময়ে তারা ভোটতিব্বত অতিক্রম এতদঞ্চলে প্রবেশ করে। বাংলাদেশে আর্যকরণের পরই এদের আগমন ঘটে। বাংলাদেশে এই প্রাগার্য আদিম জাতি বাঙালী জনসাধারণের তিন-চতুর্থাংশ অধিকার করে আছে। বাংলাদেশে আর্য অভিযান সুরু হলে অস্ট্রিক-দ্রাবিড়

জনগোষ্ঠী আর্যভাষাভাষী গোষ্ঠী ও জনজীবনের ধারার সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে গেছে।

● বাঙালী জনগণের গঠনগত উপাদান আলোচনার পর লেখক সুনীতকুমারের আলোচ্য বিষয় বাংলাদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসের কথা বা ইতিহাস ও সংস্কৃতির কথা। বাংলা দেশের সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনাকালে প্রাবন্ধিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যে সমস্ত উপাদানকে মুখ্যরূপে স্বীকার করে নিয়েছেন, সেগুলি যথাক্রমে হলো—ক. ভাষা খ. লিপি গ. ধর্ম। প্রথম পর্বে এই তিনটি বিষয়ের উপর আলোচনা করে বাঙালি সংস্কৃতির মিশ্রিত রূপ নির্ণয়ে ব্রতী হয়ে পরবর্তী অংশে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে লেখকের মৌল সিদ্ধান্ত এই যে—বাঙালি সংস্কৃতি এক মিশ্রিত সংস্কৃতি; নানা সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে উপাদান গ্রহণ করে বাঙালি সংস্কৃতির পত্তন হয়েছে; একে এক.. অবিভাজ্য, অমিশ্র, মৌলিক সংস্কৃতি বলা যাবে না।

যে কোনো জাতির সংস্কৃতির ইতিহাসে বা সাংস্কৃতিক বিকাশের ইতিহাসে ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রাবন্ধিক বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক বিকাশে বাংলা ভাষার স্মরণীয় গৌরবময় ভূমিকাকে স্বীকার করে বাংলা ভাষার জন্ম-ইতিহাস নির্ণয়ে ব্রতী হয়েছেন।

আনুমানিক ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয় এবং নব্যভারতীয় আর্য ভাষারূপে বাংলা ভাষা এখনো জীবন্ত। বাংলা ভাষা নব্যভারতীয় আর্যভাষান্তর থেকে জাত এবং নব্যভারতীয় আর্যভাষার আগে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ও মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার স্তর বিদ্যমান। অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের পরে ভারতীয় আর্যভাষা তৃতীয় যুগে পদার্পণ করে আনুমানিক ৯০০ খ্রীঃ অব্দে। তখন এক একটি অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে একাধিক নব্যভারতীয় আর্যভাষা জন্মগ্রহণ করে। এর মধ্যে মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ এবং মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়।

অবশ্য কেউ কেউ স্বদেশপ্রেমের আতিশয্যবশত মনে করেন যে, সংস্কৃত থেকেই বাংলা তথা ভারতের অন্যান্য আধুনিক ভাষাগুলির জন্ম; কিন্তু তা ঠিক নয়। নব্য-ভারতীয় আর্যভাষাগুলির অব্যবহিত জন্ম উৎস হলো বৈদিক ভাষার কথ্য রূপ থেকে জাত মধ্যভারতীয় আর্যভাষার শেষ স্তর বিভিন্ন অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ভাষা। বাংলা ভাষার জন্ম মাগধী-অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ থেকে বলে সংস্কৃত ভাষাকে বাংলা ভাষার জননী মনে করা যুক্তিহীন। বাংলা ভাষার উৎস স্থানীয় মাগধী-অপভ্রংশ অবহট্‌ঠের কোনো লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় নি বলে কেউ কেউ মাগধী-অপভ্রংশের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে মনে করেছেন যে, আদর্শ কথ্য প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। কিন্তু আদর্শ কথ্য প্রাকৃতেরও কোনো লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় নি এবং এটিও অনুমিত স্তর মাত্র। অন্যপক্ষে জর্জ গ্রীয়ার্সন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, মাগধী-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে বাংলা

ভাষার জন্ম এবং সেই মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। আলোচ্য প্রবন্ধে সুনীতিকুমার বাংলা ভাষার জন্মউৎস নির্ণয়কালে যথাযোগ্য মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেন যে, উত্তরভারতের আর্য ভাষা উত্তর ভারতে ও বিহারে মিশ্র আর্য-অনার্য জনগণের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে খ্রী.পূর্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যভাগে যে রূপ ধারণ করে, আর্যভাষার সেই প্রাচ্য প্রাকৃতের একটি প্রকারভেদ মাগধী প্রাকৃত। এই মাগধী প্রাকৃতের পরিবর্তন সমান্তরালভাবে মগধে ও বাংলায় হচ্ছিল। মৌর্য রাজশক্তি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতিবেশী মগধ থেকে বাংলাদেশে রাজকর্মচারী, বণিক, সৈনিক, ভিক্ষু, যতি ইত্যাদির মাধ্যমে সম্ভবত খ্রীঃ চতুর্থ শতক থেকে মাগধী প্রাকৃত বাংলাদেশে আনীত হতে থাকে। শতকের পর শতক উভয় দেশে মাগধী প্রাকৃতের পরিবর্তন ঘটে। অবশেষে মাগধী প্রাকৃত জাত মাগধী অপভ্রংশ অবহট্‌ঠ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়। বাংলা ভাষা যে খ্রীঃ ১০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে তার সৃজ্যমান রূপ গ্রহণ করছিল তার প্রমাণ আছে এর পরের বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের রচিত চর্যাগীতিতে, 'অমরকোষে'র সর্বানন্দ রচিত টীকায় প্রদত্ত চার শতাধিক বাংলা প্রতিশব্দে, বৌদ্ধকবি ধর্মদাস রচিত 'বিদগ্ধমুখমণ্ডল' গ্রন্থে উৎকলিত দু'চারটি বাংলা কবিতায় এবং 'সেক শুভোদয়া'য় উদ্ধৃত গানে ও ছড়ায় বাংলাদেশ আর্যঅধ্যুষিত হওয়ার আগে যে কোল ও দ্রাবিড় ভাষা ছিল তার সঙ্গে নবাগত ভোট-চীন, ভোট ব্রহ্ম ভাষা ভাষী গোষ্ঠীকে একসূত্রে বেঁধে দিল উত্তরভারতাগত উল্লিখিত ভাষা। ফলে সমগ্র বাঙালী জাতি এক ভাষাসূত্রে একধর্ম ও সংস্কৃতির সূত্রে আবদ্ধ হলো। পাল ও সেনবংশীয় রাজাদের আমলে বাংলা ভাষা ও বাঙালি জনগণ তাদের বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হল। নতুন বাংলা ভাষা রূপ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির মানস সংস্কৃতির বিকাশের সূচনা হলো এবং আনুমানিক দশম শতক থেকে প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত চর্যাপদকে অবলম্বন করে বাঙালির সাহিত্যিক জয়যাত্রার সূচনা লক্ষ্য করা গেল। সেই সময় শিক্ষিত সমাজে দেবভাষার চর্চা হলেও বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যগণ ও নাথপন্থী সাধকগণ নিরক্ষর জনগণকে শিক্ষিত করানোর তাগিদে বাংলা ভাষায় লিখতে সুরু করেন। সে যুগের শিক্ষিত মার্জিত বাঙালী কবিমনের পরিচয় পাওয়া যায় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কাব্য কবিতায়, 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' বাঙালি কবিকল্পনা ও ভাবুকতার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে বহু প্রকীর্ণ কবিতায়—সেগুলি সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত হয়েছিল।

বিহারের পথ ধরে উত্তরভারতের যে আর্য ভাষা সমগ্র বাংলাদেশ সহ উত্তর-পূর্ব-ভারতে যে ভাষাগত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের আয়োজন করলো তার অন্যতম কারণ সেই ভাষার লিপি। প্রাগার্য যুগে বাংলায় প্রচলিত অন্ আর্য ভাষার, যেমন অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ইত্যাদি ভাষার কোনো লিপি ছিল না। আর্যভাষার লিপিসম্পদ তাকে বাঙালি জাতির চোখে আরও মহান করে তুলেছিল। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ব্রাহ্মীলিপিরই প্রচার এবং এই লিপি থেকে বাংলা তথা অন্যান্য ভারতীয় লিপির উদ্ভব। কোনো কোনো লিপিতত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে, সিন্ধুলিপি থেকেই ভারতীয় লিপির

উদ্ভব। অবশ্য কোনো কোনো ব্রাহ্মীলিপির সঙ্গে সিন্ধুলিপির প্রতীকচিহ্নের সাদৃশ্য পাওয়া গেলেও সিন্ধুলিপির আজ পর্যন্ত পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি বলে এজাতীয় মন্তব্য করা অনুচিত। খ্রীঃপূঃ পঞ্চম শতক থেকে খ্রীঃ অব্দ তৃতীয় শতক পর্যন্ত ব্রাহ্মীলিপির যুগ। অশোকের শিলালিপিসহ ঐ সময়ের প্রায় সমস্ত শিলালিপিতেই ব্রাহ্মীলিপির নিদর্শন পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এই লিপি উত্তর ও দক্ষিণভেদে দুটি ভাষায় বিভক্ত হয়। আরও পরে লিপির বিবর্তনে উত্তরাঞ্চলে শারদা লিপি ও মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলে নাগরলিপির উদ্ভব ঘটে। গুপ্তযুগের পর খ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে নবম শতকের মধ্যে বর্ণের উপর মাত্রাদানের যে রীতি প্রবর্তিত হয় সেখানে স্বরের মাত্রার আকৃতি অত্যন্ত কুটিল ছিল বলে এই লিপিকে কুটিললিপি বলা হতো এবং এই কুটিললিপি থেকেই বঙ্গলিপির উদ্ভব ঘটে।

যাহোক্ আর্য ভাষার লিপিমাহাত্ম্য, বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থসহ ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম বাংলায় আগমন করলে তাদের প্রতিহত করার শক্তি বাংলাদেশের ছিল না। তাছাড়া, সুনিয়ন্ত্রিত, সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রেণী, বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘ ও জৈন যতিগণের চেষ্টায় ও রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় বলীয়ান আর্য ভাষা ও আর্যধর্মের গতিকে প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না। বিভিন্ন ভাষা ও ধর্মমত প্রচলিত থাকার ফলে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোট-চীন গোষ্ঠী খণ্ডবিচ্ছিন্ন ছিল, প্রাগার্য জাতিগোষ্ঠীর ধর্মচিন্তা, ধর্মানুষ্ঠান ইত্যাদি উত্তরভারতাগত আর্যজাতির তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল ছিল বলে আর্যধর্মের বিজয়াভিযান অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হলো। চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েনের ভারত আগমনকালে অর্থাৎ খ্রীঃ চতুর্থ অব্দে বাংলাদেশে আর্যধর্মাচরণ ও সংস্কৃত ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো এবং তখন তাম্রলিপ্ত বৌদ্ধ জ্ঞানচর্চার অন্যতম কেন্দ্রভূমি রূপে পরিচিত। খ্রীঃ সপ্তম শতকের হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণকালে বাংলাদেশ যে সম্পূর্ণত আর্যভাষী হয়ে পড়েছিলে, তা তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়। খ্রীঃ অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে পাল রাজবংশের অভ্যুদয়ের কালে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোট-চীন জাতীয় লোকেরা উত্তর ভারতে ও বিহারের আর্যভাষী ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে সমভাষী হওয়ার ফলে এক ভাষার সূত্রে গ্রথিত এক বিশিষ্ট জনগণে পরিণত হয়। সমভাষিতাকে আশ্রয় করে যে জাতীয়তা বা একরাষ্ট্রীকতার ধারণা এই সময়ে গড়ে ওঠে তা শুধু ভারত ইতিহাসেই নয়, বিশ্ব ইতিহাসেও দুর্লক্ষ্য।

বাঙালি জাতির ও বাংলাদেশের সংস্কৃতির ইতিহাস সাধারণভাবে আলোচনার পর প্রবন্ধকার বাঙালি সংস্কৃতির উপাদানের অন্বেষণে সচেষ্ট হয়েছেন এবং বিভিন্ন উপাদান আলোচনার মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতিকে মিশ্র সংস্কৃতি রূপে অভিহিত করেছেন। অবশ্য বাঙালির মিশ্র সংস্কৃতিতে কোন্ কোন্ উপাদান গৃহীত হয়েছে তা নির্ণয় করা জটিল সমস্যা—এ সাধারণ সত্যে প্রবন্ধকার অবিচল থেকেও আবিষ্কৃত তথ্যের সাহায্যে মূলত আলোকপাত করেছেন শব্দ, লোকযান, লোকধর্ম, ইসলামধর্ম এই চারিটি বিষয়ের উপর। শুধু বাঙালি সংস্কৃতিই নয়, সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতি বিমিশ্র

এবং সমন্বয়ধর্মী একথা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সংস্কৃতি' প্রবন্ধেও ব্যক্ত হয়েছে—"ভারতের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, ভারতের সত্যকার সংস্কৃতি, আমার মনে হয়, কতগুলি ভাবপুঞ্জ নিয়ে, যেগুলি একাধাবে ভারতের বাহ্য সভ্যতার অনুপ্রেরণারূপে আর তার প্রকাশ-রূপেও বিদ্যমান। এই ভাবপুঞ্জ ভারতের জনগণের ইতিহাসের আধারেই দানা বেঁধেছে। নানাজাতির সম্মিলন ও সংমিশ্রণের ফলে ভারতীয় জাতি গড়ে উঠেছে—এইসব জাতির ভাষা আর সভ্যতা, এদের সংস্কৃতি, এদের ঐতিহ্য, মূলতঃ পৃথক ছিল। কিন্তু অস্ট্রিক ভাষাই দ্রাবিড় ভাষী আর ভোট-চীন-ভাষী বিভিন্ন সংস্কৃতির জনগণ আর্য ভাষা গ্রহণ কবে আর্যভাষীদের সঙ্গে মিলে উত্তরভারতে প্রাচীন হিন্দু জাতিতে পরিণত হ'ল। * * * হিন্দু সভ্যতার প্রথম থেকেই একটি বড়ো সাংস্কৃতিক সূত্র প্রকট হল- সমন্বয়। * * * বিভিন্ন আপাত বিরোধী মতবাদের মধ্যকার ঐক্য বা'র করে একটা সামঞ্জস্যের চেষ্টা চিরকাল ধরে ভারতীয় করে এসেছে; পিতৃলোক আর পুনর্জন্ম, হোম আর পূজা, এক আর বহু, দুইই একসঙ্গে দেখা, পিণ্ডদানে মুক্তি আর অনপনেয় কর্মফল, জ্ঞান আর ভক্তি, নিষ্কাম কর্ম আর সকাম অনুষ্ঠান, সামাজিক বিভেদ আর সামাজিক সমীকরণ—এ সমস্তকেই ধরে নিয়ে। এদের বিবাদের মধ্যে সংবাদ আবিষ্কার করে, এক মহান মিলনসংগীত গাইবার চেষ্টা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রথম কথা।" ভারতের সংস্কৃতি সম্বন্ধে সুনীতিকুমারেব বক্তব্য বাঙালি সংস্কৃতির সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। বাঙালি সংস্কৃতিও যুগে যুগে নতুন নতুন ভাবপরম্পরা আত্মসাৎ করে এক মিশ্র সংস্কৃতিতে পরিণতি লাভ করেছে। প্রাচীন ও নবীনের মিলন ও সমন্বয়ই যে কোনো সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের অন্যতম সর্ত; ভারতসহ বাংলাদেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় নি। প্রাগার্য ভারতবর্ষে প্রচলিত পূজামূলক ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে আর্য কর্তৃক আনীত হবন বা হোমমূলক ধর্মানুষ্ঠান পারস্পরিক সমন্বয়ধর্মিতায় মিলিত হয়ে আর্য ও অন্-আর্যের ধর্মগত নিজ নিজ পরিমণ্ডলে স্থান করে নিয়েছে। আর্যদের দেবলোক ও অন্-আর্য দ্রাবিড় অস্ট্রিকদের দেবলোক একটা সামঞ্জস্যের ঐক্যে বিধৃত হলো। অবশ্য এই পারস্পরিক বিনিময়ের কালে প্রাচীন ও নবাগত ধর্মসংস্কৃতির মধ্যে আপোষ করতে হয়েছে। এখনও সেই ধারা বর্তমান জীবনে কোথাও পরিবর্তিত আকারে, কোথাও বা পরিবর্ধিত আকারে, কোথাও বা ক্ষীণভাবে প্রচলিত আছে।

পূজার্চনা বা হোমমূলক ধর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্র ব্যতীত ভাষার ক্ষেত্রেও এই পারস্পরিক আদান-প্রদান সংলক্ষ্য। প্রাচীন অন্-আর্য ভাষা অস্ট্রিক, দ্রাবিড ইত্যাদি বর্তমানে বিলুপ্ত হয়ে গেলেও এরা আর্য ভাষার প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করেছে অথবা অনেক অন্-আর্য শব্দ আর্য ভাষায় স্থান করে নিয়েছে। ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীকে কোল, দ্রাবিড়, ভোট-চীনা ও আর্য এই চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। এর মধ্যে কোল ভাষা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। দ্রাবিড় ও আর্যগণের আগমনের আগে থেকেই এ ভাষা ভারতে প্রচলিত। এই গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত ভাষা বর্তমানে সাঁওতাল, মুণ্ডারী, হো, ভূমিজ,

কোডা, কুরকু, শবর ইত্যাদি। এই কোল গোষ্ঠীকে অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীও বলা হয়। দ্রাবিড গোষ্ঠীর ভাষা বর্তমানে দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত। তামিল, তেলেগু, মালয়ালী, কানাড়া প্রভৃতি ভাষা দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী থেকে সমুদ্ভূত। সুতরাং প্রবন্ধকার যখন মন্তব্য করেন 'প্রাচান অনার্য ভাষা, অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় স্বয়ং লুপ্ত হইয়া গিয়াছে'— তখন তা প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয় না। সমগ্র উত্তরভারতে আর্যগোষ্ঠীব ভাষা প্রচলিত থাকলেও এবং বাংলা ভাষা এই ভাষাগোষ্ঠীব অন্যতম হলেও ভারতীয় আয ভাষায় এবং বাংলা ভাষায় অস্ট্রিক বা কোলগোষ্ঠীব এবং দ্রাবিড়গোষ্ঠীর শব্দসম্পদ যথাযথ স্থান করে নিয়েছে। বাংলা ভাষায় অস্ট্রিক বা কোল গোষ্ঠীর বেশ কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায়। [যেমন—কম্বল, কুঁড়ি, ফল, বান, লগুড, লগা, লাঙ্গল, লিঙ্গ, উচ্ছে, ঝিঙে, খোকা, খুকি, ডেঙ্গব ইত্যাদি] দ্রাবিড় গোষ্ঠী থেকেও অনেক শব্দ বাংলায় গৃহীত হয়েছে। [যেমন—উলু (খড অর্থে), খাল, পিলে (ছেলেপিলে) ইত্যাদি]। বাংলা ভাষায় বহু অনায শব্দও পাওয়া যায় যার সঙ্গে প্রাকৃতের পর্যন্ত কোনো সম্পর্ক নেই। [যেমন—কুলা, ঝাঁটা, ঝোল, ডাকা, ডাঙ্গা, ডাগব, ডাব, ডাহা, ডাঁসা, ডিঙি, ডেকরা, ঢিল, ঢেউ, ঢেঁডশ, ঢোল, ঢাক ইত্যাদি] তাছাড়া ধ্বনিতত্ত্বের অনেক নিয়মও প্রাগায গোষ্ঠীর ভাষা থেকে গৃহীত হয়েছে।

ভারতে বর্তমানে যেসব বংশের ভাষা পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অস্ট্রিক বংশই হলো ভারতে আগত প্রাচীনতম বংশ। অস্ট্রিক ভাষা বংশের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলো সাঁওতালী। বাংলা ভাষায় অস্ট্রিক ভাষা বংশের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি। সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলার যে সব শব্দকে আর্য ভাষার শব্দ বলা হয় তাদের মধ্যে অনেকগুলি অস্ট্রিক উৎস থেকে জাত পরিবর্তিত শব্দ। এমনকি 'বঙ্গ' শব্দটিও অস্ট্রিক উৎসজাত।

দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় ভাষার একচ্ছত্র প্রভাব থাকলেও অস্ট্রিক ভাষার মতো এই ভাষার প্রভাব বাংলা ভাষায় তত প্রত্যক্ষ বা ব্যাপক নয়। শব্দে ও বাক্যে যে আদি শ্বাসাঘাত থাকে তা দ্রাবিড় প্রভাবজাত। যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার, সমাপিকা ক্রিয়ার পরিবর্তে শতৃ, শানর্চ-এর ব্যবহার, গুলা, গুলি প্রভৃতি বহুবচনের বিভক্তি— দ্রাবিড় প্রভাব জাত বলে মনে করা হয়। সুতরাং ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

বাঙালির ধর্মকর্মগত মানস জীবন অত্যন্ত জটিল এবং সেখানে নানা প্রভাব ও মিশ্রণক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। সমাজের ভেতরে বাইরের নানা গোষ্ঠী নানা স্তর, নানা কোমের ভক্ত-বিশ্বাস, পূজাচার প্রভৃতিরও একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। নানা শ্রেণী স্তর-উপস্তর, কোম ইত্যাদির ধ্যান-ধারণা, ভক্তি-বিশ্বাস, অনুষ্ঠান নানা বিরোধ ও মিলনের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয় এবং এক সমাজের ভাবধারা অন্যসমাজে গৃহীত হয়। অন্য শ্রেণী ও কোমের ধর্মকর্মগত জীবন যেমন আর একটি শ্রেণী বা কোমকে প্রভাবিত করে, তেমনি নিজেও প্রভাবিত হয়। বাঙালি সাংস্কৃতিক জনতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের আলোচনায়

অগ্রসর হলে দেখা যাবে যে, যাকে হিন্দুধর্মকর্মসাধনা যা আর্যব্রাহ্মণ্য সাধনা বলে মনে করা যায়, তা আসলে আর্য ও প্রাগার্য বা অন্-আর্য ধর্মকর্মসাধনার সমন্বয় মাত্র। আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অবশ্য বহু লোকায়ত অন্-আর্য ধর্মকর্মকে হয় প্রয়োজনমত পরিবর্তিত করেছে অথবা অবিকৃতরূপে গ্রহণ করেছে। বাঙালির ধর্মকর্মের আদি ইতিহাস হলো বাংলার আদিবাসীদেরই পুজা, আচার, অনুষ্ঠান, ভয়, বিশ্বাস, সংস্কারের ইতিহাস। শুধু বাঙালী সম্পর্কে নয়, সমগ্র ভারতবাসী সম্পর্কেও এই একই সূত্র প্রযোজ্য হতে পারে। বিশেষভাবে হিন্দুর জন্মান্তরবাদ। পরলোক সম্পর্কিত ধারণা, প্রেততত্ত্ব, পিতৃতর্পণ, পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধাদি সংক্রান্ত অনুষ্ঠান, আভ্যুদায়িক এ সমস্তই আদিবাসী রক্তের দান। বৈদিক আর্যধর্মের বাইরে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম, যোগদর্শন, আদ্যাশক্তির আরাধনা, শিবশক্তিবাদ, বিষ্ণুর আরাধনা ইত্যাদি সমস্তই অনার্য ধর্মজগত থেকে গৃহীত। এমনকি বৃক্ষ, প্রস্তর, ফুল, ফল, পশু, পক্ষী ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করে নানা স্থানে যে পূজাপদ্ধতি এখনও খাসিয়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল ইত্যাদির মধ্যে প্রচলিত আছে, তাও আদিবাসীদের দান। বাংলার সর্বত্র জীবনাচরণের যে নানা উপাদান ছড়ানো আছে তা আসলে মিশ্র সংস্কৃতির ফলশ্রুতি।

বাংলাদেশে প্রচলিত লোকধর্ম ও ধর্মপূজার উদাহরণ বিশ্লেষণের দ্বারা প্রাবন্ধিক এই মিশ্র সাংস্কৃতিক রূপকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধর্মঠাকুরের পূজা উৎসব প্রচলিত থাকলেও ধর্মঠাকুরকে সকলেই বৌদ্ধ দেবতা বলে মনে করতেন। উনিশ শতকের শেষে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘোষণা করেন যে, ধর্মঠাকুর বৌদ্ধ-দেবতা, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি ধর্মঠাকুর। শূন্যমূর্তি বুদ্ধদেবই কূর্মমূর্তি স্বরূপ ধর্মশিলায় পরিণত হয়েছে। মাণিকরামের ধর্মমঙ্গলকাব্যে ধর্মকে শূন্যমূর্তি বলা হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সকলেই ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধ প্রমাণ করেছেন। কিন্তু অনুসন্ধানে অগ্রসর হওয়ার ফলে আবিষ্কৃত নানা তথ্যের সাহায্যে প্রমাণিত হয়—'ধর্মঠাকুর মূলত ছিলেন প্রাক্ আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা ; পরে বৈদিক ও পৌরাণিক, দেশি ও বিদেশি নানা দেবতা তাহার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া ধর্মঠাকুরের উদ্ভব হইয়াছে'। [বাঙালীর ইতিহাস ঃ নীহাররঞ্জন রায়।] ধর্মঠাকুরের স্বরূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধানে করে জানা গেছে যে, ধর্মঠাকুর বৌদ্ধদেবতা নন ; ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্বের গভীর সাদৃশ্য আছে। ধর্মঠাকুর বৈদিক সূর্য দেবতা হলেও তাঁর সঙ্গে বৈদিক বরুণ দেবতা, ডোম-চাড়াল জাতির রণদেবতা, অনার্যের শিলাদেবতা মুসলমানের ফকিরী বেশধারী দেবতা ইত্যাদিরও নানা সাদৃশ্য আছে, প্রভাবও আছে। ধর্মঠাকুর একটি মিশ্র দেবতা যার মধ্যে বৈদিক ধর্মাচার, প্রাচীন আর্যেতর সংস্কার, ব্রাত্য শৈবধর্ম, নাথধর্ম, বিষ্ণু উপাসনা ইত্যাদি নানা ধর্মোপাসনা একীভূত হয়ে গেছে। এমনও কেউ কেউ মনে করেছেন যে, 'ধর্ম' শব্দটি অনার্য কোলগোষ্ঠীর কূর্মবাচক 'দড়ম' বা 'দরম' শব্দের পরিবর্তিত, আর্যীকৃত রূপ। বৈদিক দেবতা বরুণের বিশেষ প্রভাব

বাংলার লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় লক্ষ্য করা যাবে। ধর্মমঙ্গলে ধর্মের বন্দনায়, শূন্যপুরাণে, ধর্মপূজাবিধানে, রমাই পণ্ডিতের অনাদ্যমঙ্গলে সর্বত্রই ধর্মনিরঞ্জনকে নিরাকার শূন্য বলা হয়েছে। নানা আবিষ্কারের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে 'ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনার মূলে বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্ব, পরবর্তীকালের বৌদ্ধদর্শন, আদিবাসীদের ধর্মাচার, নাথধর্ম ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র প্রভৃতির বিশেষ অস্বাকাব কবা যায় না।' [বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৩য় খণ্ড ১ম পর্ব : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।] ধর্মঠাকুবের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, সেখানে প্রাগার্য অস্ট্রিক সমাজের সূর্যোপাসনা, বৈদিক সূর্যোপাসনা বৈদিক-অবৈদিক সৌরকাণ্টের যোগাযোগের সঙ্গে আদিম বাংলার কোলগোষ্ঠীর ধর্মাচার, শৈব-নাথধর্মের প্রভাব, ইসলামেব প্রভাবও স্বীকার করতে হয়। কেননা মুঘলযুগে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মনিরঞ্জনের পরিকল্পনায় ইসলামি প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়।

বাঙালি জাতি সৃজনের কালে আর্য অন্-আয ধর্ম-কর্ম সংস্কৃতি ইত্যাদি শুধু যে ধর্মপূজার মাধ্যমে রূপায়িত হচ্ছিল তাই নয়, তখন সহজিয়া-তান্ত্রিকতা-নাথধর্ম-মনসার পূজা ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণ রায়ের পূজা প্রভৃতিও প্রচলিত ছিল। তান্ত্রিকতা ও সহজিয়া মত মহাযান বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যেমন মিশে যায় তেমনি আবার শৈব-শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যেও স্থান করে নেয়। নাথধর্ম, মনসাপূজা এবং দক্ষিণ রায়ের পূজা মধ্য যুগের বাংলার হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। সর্বাস্তিবাদ, মহাসাংঘিকবাদ ইত্যাদি নিয়ে সপ্তম শতাব্দীর বাংলায় যে মহাযান বৌদ্ধমতের আবির্ভাব হয়েছিল অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সেখানে মাতৃকাতন্ত্রের নানা দেবীর সঙ্গে ভূত, প্রেত, যক্ষ রক্ষ প্রভৃতির স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। মনে হয়, বিশাল জনসমাজকে বৌদ্ধধর্মের সীমার মধ্যে আকর্ষণের জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তন্ত্রের এই গুহ্য, গূঢ় রহস্যময় মন্ত্র যা মহাযান বৌদ্ধধর্মে প্রবৃষ্ট হলো, তা সমস্তই কিন্তু যাদুশক্তিতে বিশ্বাসী আদিম সমাজ লালিত ব্রাহ্মণ ধর্মেও তান্ত্রিকতা স্থান লাভ করে। আদিবাসী সমাজের জনসাধারণ নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস, ধ্যান ধারণা দেবদেবী সহ বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করছিল। অন্যদিকে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মও নিজ নিজ ধারণা ও ভাবকল্পনানুযায়ী, শক্তি ও প্রয়োজনানুযায়ী আদিম ধর্মবিশ্বাস, ধ্যানধারণা, দেবদেবী ইত্যাদির ধর্ম ও রূপ শোধিত রূপান্তরিত করে আপনাপন ধর্মমণ্ডলে গ্রহণ করছিলো।

ধর্মপূজা, নাথধর্ম, বৌদ্ধ-বৈষ্ণব, সহজিয়া, বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ তান্ত্রিকতা মনসা প্রভৃতি লৌকিক দেবতার পূজা, ধর্মকর্মাদর্শে তাদের প্রতিষ্ঠা, রূপান্তরিত হওয়া ইত্যাদি ইতিহাসের সঙ্গে বাংলা দেশের ধর্ম ও উচ্চচিন্তাকেন্দ্রিক সংস্কৃতি প্রায় হাজার বছর ধরে অবিভাজ্যভাবে, সম্পৃক্তভাবে জড়িত। বাস্তববাদী আর্যরা ঘৃত, দুগ্ধ, সমিধ, মাংস ইত্যাদির সাহায্যে অন্তরীক্ষে অবস্থিত দেবতাদের উদ্দেশ্যে পূজার্ঘ্য নিবেদন করে সুস্থ, সম্পন্ন, সমৃদ্ধিশালী জীবন কামনা করত। অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মধ্যে আবার জল, স্থল, পাহাড় পর্বত, অরণ্য, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে অধোলোকের অধিবাসী-

দের পূজাও প্রচলিত ছিল। তারা যৌগিক বিভূতি ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পূজারীতেও বিশ্বাস করত। আদিম মানবের ধর্মীয় জীবনে ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বেশি স্থান পেত। আদিম মানব কর্তৃক অনুসৃত এই সকল ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া-কলাপ দু'রকম পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—'সদৃশ বিধানী ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া' এবং 'সংস্পর্শ বিধানী ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া'। এই জাতীয় দিব্য শক্তিমান পূজারী আধুনিক নৃতাত্ত্বিক পরিভাষায় S H A M A N রূপে কথিত। পৃথিবীর বহু আদিম মানুষের মতো এখানকার আদিম মানুষেরও ধারণা ছিল যে, দিব্য শক্তিসম্পন্ন লোকেরা যে সমাজের লোক ছিলেন তাঁরা সেই সমাজের ভালোমন্দ করতে পারেন। ফলে, তাঁদের মৃত্যুর পর সমাধিতে লোকে নিয়মিত পূজা করত আত্মার সন্তুষ্টির জন্য। মৃত্যুর পর দৈব্যশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির দেহাস্থি বা ভস্মাবশেষের উপর 'স্তূপ' নির্মাণ করা হতো। এই 'স্তূপ' মৃত্তিকা-ইষ্টক বা প্রস্তর নির্মিত ছিল। স্তূপের অভ্যন্তরে সমাহিত মৃতের পূজা করা হতো। এই রীতি সম্ভবত অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় উভয় জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই দুই জাতির মানুষের বসবাস ক্ষেত্র ছিল পশ্চিমে ইরান থেকে আরম্ভ করে আফগানিস্তান এবং সমগ্র ভারত জুড়ে—এই সমস্ত অঞ্চলে প্রেতাত্মার সম্মাননার জন্য সমাধিপূজা প্রচলিত ছিল। আর্যরা মৃতদেহ দাহ বা ভূপ্রোথিত করতো; তাদের মধ্যে সমাধিপূজার রীতি প্রচলিত ছিল না। ভারতে এসেও সমাধিপূজা তারা গ্রহণ করে নি। রামায়ণে মহাভারতে সমাধি পূজাকে 'এড়ূক পূজা' বলে অবজ্ঞা করা হয়েছে। কিন্তু এই সমাধি পূজা অত্যন্ত প্রাচীন এবং সহজে বিলুপ্ত হওয়ার নয়। সমাধি পূজার মধ্যে মানুষের ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। মূলত আত্মাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য পূজার আশ্রয় গ্রহণ করা হতো। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আনুকূল্য লাভের চেষ্টায় তাদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করা হয়। এমনকি বৌদ্ধধর্মেও বুদ্ধদেবের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধাহেতু বৌদ্ধচৈত্যপূজাকে আশ্রয় করা হয়েছে, যাকে সমাধিপূজা বলা যেতে পারে। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেও অনেক সন্ন্যাসী বা গুরুর সমাধিপূজা প্রচলিত হলো। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম কর্তৃক এই প্রাগার্য রীতি গৃহীত হওয়ার অর্থই হল সংস্কৃতির সমন্বয়বাদ এবং এই অর্থেই ভারত তথা বাঙালি সংস্কৃতি মিশ্র সংস্কৃতি।

● বাঙালির জাতিগত সংস্কৃতিতে প্রাগার্য, আর্য ও অন্-আর্য উপাদান নির্ণয়ের পর প্রবন্ধকার ঐস্লামিক উপাদান নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছেন। ১২০১ খ্রীস্টাব্দে বখত্‌ইয়ারের বাংলা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেনবংশের অবসান ঘটে এবং ইসলাম ধর্মসংস্কৃতির অভ্যাগম সূচিত হয়। বাঙালির রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় জীবনে ইসলামের আগমন কিন্তু কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, ইতিহাসেরই পরিণাম। সেই কালের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন—

'তখন বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজ ভেদবুদ্ধি দ্বারা আচ্ছন্ন, স্তরে উপস্তরে দুর্লঙ্ঘ্য সীমায় বিভক্ত; রাজসভা চরিত্র ও আত্মশক্তিহীন; ধর্ম ও সমাজ বিলাসলালসায়

ও যৌনাতিশয্যে পীড়িত; শিল্প ও সাহিত্য বস্তুসম্বন্ধ বিচ্যুত ভাবকল্পনার জগতে পল্লবিত বাক্য উচ্ছ্বাসময় অত্যুক্তি, আলঙ্কারিক আতিশয্য এবং দেহগত লীলাবিলাসে ভারগ্রস্ত ও মদির, জনসাধারণের দেহমন বৌদ্ধ বজ্রযান সহজযান প্রভৃতির এবং তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য ডাকিনী যোগিনীদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড তুকতাকে পঙ্গু, উচ্চতর বর্ণসমাজ ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে আড়ষ্ট। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধোগতির চিত্র সম্পূর্ণ, উভয়েই চরিত্রে ও আত্মশক্তিতে দুর্বল ও দৈন্যপীড়িত। এই দুর্বল ও দৈন্যপীড়িত রাষ্ট্র ও সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং সমাজ-প্রকৃতির নিয়মে পরবর্তীকালে শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া দেশ তাহার মধ্য দিয়া যাইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। বখ্‌ত-ইয়ারের নবদ্বীপ জয় এবং একশত বৎসরের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়, ভাগ্যের পরিহাসও নয়—রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতির দুর্নিবার পরিণাম' তুর্কী বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে বাঙালি জনগণ পরস্পর বিরোধী ভাবতরঙ্গে উদ্বেলিত, পতনের দশায় বৌদ্ধধর্ম বজ্রযান সহজযানের অনুষ্ঠান ও মন্ত্রতন্ত্রে পর্যবসিত। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বৈষ্ণব ভক্তিবাদ, তান্ত্রিক শক্তিপূজা, রামায়ণ মহাভারত—পুরাণকেন্দ্রিক ধর্মমতের প্রচারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে সচেষ্ট, এমন সময় রাজশক্তির আনুকূল্য লাভে পরিপুষ্ট ইসলামি ধর্মের আবির্ভাব। নবধর্মের আবির্ভাবের ফলে লৌকিক ধর্ম নিরর্থক আচার অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হলো। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাদর্শ বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয় সম্প্রদায়ের মাধ্যমে জনজীবনে প্রবল শক্তি রূপে আবির্ভূত হলো এবং নবাগত ইসলাম ধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাদর্শের সংঘর্ষ ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি রূপে দেখা দিল।

বাংলাদেশ সহ ভারতবর্ষে ইসলাম দুটি মূর্তিতে আবির্ভূত হলো - শরিয়ৎ বা শাস্ত্রানুমোদিত রক্ষণশীল ইসলাম রূপে—যার সঙ্গে অন্য ধর্মের বিরোধ অনিবার্য। এই শরিয়ৎবাদ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাদর্শকে 'কুফার' বা ইসলাম বিরোধী ধর্মাদর্শ মাত্র মনে করে। দ্বিতীয় মতাদর্শ ছিল সুফী—যার আদর্শ ছিল উদার ও সার্বজনীন এবং যার সঙ্গে হিন্দু দর্শন ও ধর্মজীবনের আপোষ সহজসাধ্য ছিল। শরিয়তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য হিন্দু সমস্ত চেষ্টায় নিয়োজিত হলো। ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় মূর্তি হলো সুফীবাদ। দ্বাদশ শতকে উত্তর ভারতে মুসলিম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হলে স্বভাবতই ভারতীয় সভ্যতা—সংস্কৃতি ইসলামী সংস্কৃতির ঐশ্বর্যকে গ্রহণ করেছে। ইসলাম ধর্ম ও সমাজের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের ফলে ভারতবর্ষে এক নতুন ও উদার ধর্মচিন্তার আবির্ভাব ঘটে। ইসলাম কর্তৃক আনীত একেশ্বরবাদ, সামাজিক সাম্য ইত্যাদির প্রভাবে ভারতের অধ্যাত্মচিন্তায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। কবীর, দাদু প্রমুখ সন্তদের কণ্ঠে জাতিভেদ প্রথা জর্জরিত, আচারসর্বস্ব ও অন্তঃসারশূন্য ধর্মাদর্শের পরিবর্তে মানবতার মহান বাণী উদ্‌গীত হলো। বাংলাদেশে সুফী প্রভাব যে গভীরভাবে পড়েছিল বাউলদের সাধনায় ও গানে তার চিহ্ন আছে। প্রেমই সুফী ধর্মতত্ত্বের মূল বিষয়, ঈশ্বর ও মানুষ মিলনের সেতু। সুফী প্রেমসাধনায় মধ্যযুগের ভারত সেই রহস্যময় পরমপুরুষকে অজানা

অচেনাকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধির সুযোগ পেয়েছিল।

শরিয়তি ও সুফীয়ানা—এই দুইয়ের মিলিত ইসলামাদর্শ রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এবং দুর্দমনীয় শক্তিতে পরিণত হয়। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বহু বাঙালী হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তাছাড়া জাতিভেদপ্রথা জর্জরিত প্রাকৃত জনগণ বর্ণহিন্দুদের অত্যাচার ও শাস্ত্রীয় আচার-আচরণের বিড়ম্বনা থেকে মুক্তির জন্য দলে দলে একেশ্বরবাদী সাম্যবাদী ইসলাম ধর্মের পতাকাতলে সমবেত হয়। বাংলাদেশের ধর্ম-সংস্কৃতিতে ইসলামের অন্যতম প্রভাব চৈত্যপূজার অভিনব ইসলামী রূপ পীরের দরগা। ইসলামের জন্মভূমি আরবদেশে পীরের দরগার কোনো উল্লেখ নেই। অবশ্য একথা ঠিক যে, মোহম্মদের পূর্বেকার অজ্ঞতাযুগের অনেক আচার-অনুষ্ঠান ইসলাম ধর্মাদর্শের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিশুদ্ধ কোরাণী বা মোহাম্মদী ইসলামের অনুরাগীরা দরগাকেন্দ্রিক ধর্মানুষ্ঠান পছন্দ করেন না। তাঁরা এই প্রথাকে 'পীর পরস্তী', 'স্থবিরপূজা' বা 'সমাধিপূজা' নামে অবজ্ঞা করেন। তবে রক্ষণশীল মুসলিম সম্প্রদায় পীরের দরগাকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান পছন্দ না করলেও সারা বাংলাদেশেই নয়, সারা ভারতেও এমনকি পূর্ব ইরাণেও হিন্দু মুসলমান উভয় সংস্কৃতি, সমন্বয়স্বরূপ পীরের দরগায় এবং মাজারে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই শিরনীসহ পূজার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ইসলামধর্ম প্রতিষ্ঠার পরে দক্ষিণ রায়ের পূজা ইসলামী ভাবনায় অনুরঞ্জিত হয়ে গাজী মিয়াঁর নামে বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে বড় গাজী খাঁর যুদ্ধ বৃত্তান্তই রায়মঙ্গলের বিষয়বস্তু।[১] এই কাহিনীকে কেন্দ্র করে মুসলমান সমাজেও কোনো কোনো কবি কাব্য রচনা করেছেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঘের উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য উপায় অনুসন্ধান করেছে। মুন্সী বয়নদ্দীন সাহেব রচিত 'বনবিবি জহুরা-নামা' কাব্যে হিন্দু সমাজের কল্পিত দক্ষিণ রায় ও মুসলমান সমাজের কল্পিত বনবিবির মিশ্রকাহিনীও পাওয়া যায়। নিম্নবঙ্গে ব্যাঘ্রের অধিকারী দেবতা দক্ষিণ রায়ের ও ইসলামের গাজী মিয়াঁর কাহিনীর মিলন হিন্দু মুসলমান সমন্বয়ের উদাহরণ।

হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ধর্মিতার উদাহরণস্বরূপ প্রবন্ধকার লক্ষ্মণসেন কর্তৃক মুসলমান প্রচারককে ভূমিদান, প্রথম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতা জফর খাঁ ও দরাপ খাঁর গঙ্গাস্তোত্র রচনার উল্লেখ করলেও, চট্টগ্রাম-রোসাঙের বিশুদ্ধ মানববিষয়ক মুসলমানী সাহিত্যের আলোচনা কেন করেননি, তা বিস্ময়ের। চট্টগ্রাম রোসাঙের কবিকুল শিরোমণি দৌলত কাজী ও আলাওল তাঁদের কাব্যের মাধ্যমে মুসলমানী ও হিন্দু ভাব ভাষা ও পুরাণ ঐতিহ্যের মিলন সাধনেই অগ্রসর হয়েছিলেন—একথা আজ ইতিহাস-গতভাবে সত্য। কেননা এসকল কাব্যে মুসলমানী ধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে হিন্দু পৌরাণিক প্রসঙ্গের বহুল অবতারণা আছে। তাছাড়া, আলাওল রচিত রাধাকৃষ্ণ পদ, সৈয়দ সুলতানের রাধাকৃষ্ণ প্রেমাত্মক লোকসঙ্গীত ইত্যাদি এবং সত্য ও প্রেমের ফারসী সাহিত্যিক প্রভাব ও সুফী ধর্মচেতনা যে বাংলাদেশে নবীন অভ্যুদয়ের সূচনা করেছিলো তা অবিসংবাদিত। প্রসঙ্গত, বাউল-মুর্শিদী-মারিফতী-লোকগীতিও উল্লেখ করা

উচিত। কেননা, এই সমস্ত লোকগীতিকায় যে সাম্প্রদায়িক ধর্মবুদ্ধি নিরপেক্ষ চেতনার বিমিশ্রতা ও ভাবনার সমস্পর্শিতা রয়েছে, তা অবশ্যই স্মরণীয়।

● প্রবন্ধকার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধে নানা বিষয় আলোচনার পরিপূরকরূপে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। বাংলাদেশ মূলত কৃষির দেশ, কৃষি, মৎস্যশিকার ও গোচারণ ব্যতীত বাঙালির অন্য কোনো জীবিকা ছিল না বললেই চলে। বাঙালি জাতি বাণিজ্যপ্রিয় বণিক জাতিতেও পরিণত হতে পারে নি; যেভাবে আরবদেশ, ফিনিশীয় অঞ্চল ও কায়রো নগরী বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হতে পেরেছিলো, বাংলাদেশ সেই জাতীয় বাণিজ্য কেন্দ্রও হতে পারেনি। বাংলাদেশের বণিকেরা যে জাহাজে করে ব্রহ্ম, মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, চীন, সিংহল, গোয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশে গমনাগমন করতেন এমন প্রমাণ ইতিহাসে দুর্লভ নয়। কিন্তু তবুও বাঙালি জাতি পৃথিবীর অন্যতম বণিক জাতি হয়ে উঠতে পারে নি, তার অন্যতম কারণ, বাংলাদেশ পৃথিবীর বাণিজ্য পথের এক প্রান্তে অবস্থিত। গঙ্গা ও তাম্রলিপ্ত যে মস্ত বড় দুটি বন্দর ছিল, তার উল্লেখ পাওয়া যায় পেরিপ্লাস-এর গ্রন্থে, টলেমির বিবরণে, জাতকে এবং ফাহিয়েন ও হিউয়েন সাঙের বিবরণে। অন্যত্র এর কোনো বিশেষ উল্লেখ নেই। তাম্রলিপ্ত এবং মধ্যযুগের প্রারম্ভে সপ্তগ্রাম বন্দর থেকে দঃ পূঃ এশিয়ার দ্বীপগুলিতে দক্ষিণ ভারতের উপকূল বেয়ে সিংহলে ও পশ্চিম উপকূল বেয়ে সুরাষ্ট্র ও ভৃগুকচ্ছ পর্যন্ত যে বাণিজ্য তরী যাতায়াত করতো তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অভ্যন্তর বাণিজ্যও প্রচলিত ছিল। কিন্তু তবুও বাংলাদেশের সভ্যতা কৃষিমূলক গ্রামীণ সভ্যতা বলে এখানে গুজরাট, রাজস্থান, তক্ষশীলা, মথুরা, দিল্লী ইত্যাদির মতো নগর ওঠে নি। বাঙালীরা বরাবরই কৃষিজীবী এবং মনে হয়, তারা এ ব্যাপারে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর উত্তরপুরুষ এবং দ্রাবিড়রা এ ব্যাপারে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় জাতি নাগরিক সভ্যতার অধিকারী এবং তারাই মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার স্রষ্টা, তবুও বাঙালি জাতির উপর তাদের প্রভাব নাগরিক সভ্যতার দিক থেকে নেই বললেই হয়। বাঙালি যে কৃষিজীবী এবং তাদের সভ্যতা যে মূলত কৃষিমূলক গ্রামীণ সভ্যতা, এর প্রমাণ পাওয়া যায়—বিভিন্ন লেখমালায়, ডাক ও খনার বচনে, হিউয়েন সাঙের বিবরণে, লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া, তর্পণদীঘি ইত্যাদি তাম্রশাসনে মঙ্গলাচরণ শ্লোকে ধান্যোপজীবী বাঙালীর আকৃতি ধ্বনিত হয়েছে। শুধু ধানই নয়, কৃষিজীবী সভ্যতার ধারকরূপে বাঙালি ধান উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে আখ, সরষে, বাঁশ, আম, পান, গুবাক, নারিকেল ইত্যাদি উৎপাদনে দক্ষ ছিল। এলাচ লবঙ্গ, তেজপাতা ইত্যাদি যে উৎপাদিত হতো তার উল্লেখ আছে সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' গ্রন্থে। কৃষি উৎপাদনে বাঙালির স্থান অবিসংবাদিত হলেও, বাঙালির বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি খ্রীষ্টপূর্ব শতকেও যে প্রসারিত হয়েছিল তার প্রমাণ আছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, চীন ও ইতালীয় পরিব্রাজকদের বৃত্তান্তে। কারু, তক্ষণ অলংকার,

লৌহ, মৃৎ, কাষ্ঠ, হস্তি দন্ত, কাংস্য শিল্পে এবং নৌশিল্পে বাঙালির গৌরবময় বৃত্তান্ত কারোর অজানা নয়। কিন্তু সুনীতিকুমার তাঁর প্রবন্ধে এ সমস্তের কোনো উল্লেখ করেন নি। বাংলাদেশের ও বাঙালির অর্থনৈতিক সভ্যতার ইতিহাস বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থে। বাংলাদেশের প্রাচীন কাল থেকে তুর্কী বিজয় পর্যন্ত বিভিন্ন দলিল ও তাম্রপত্র আলোচনা করলে দেখা যায় যে গুপ্ত রাজাদের আমলে প্রাচীন তাম্রলিপিগুলিতে যে সমস্ত রাজকর্মচারী ও জনপ্রতিনিধিদের উল্লেখ আছে তাঁরা হলেন—নগর শ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক, প্রথম বা জ্যেষ্ঠ কায়স্থ ইত্যাদি। অর্থাৎ উল্লিখিত ব্যক্তিরা সকলেই বণিক বা ব্যবসায়ী শ্রেণীর ব্যক্তি। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, গুপ্ত রাজাদের আমলে বণিক ও শেঠদের প্রাধান্য ছিল বেশি। প্রজাসাধারণ বা কৃষিজীবীদের পক্ষ থেকে তেমন লোক নেওয়া হত না। কিন্তু পরবর্তীকালে পাল ও সেন রাজাদের আমলে পল্লীগ্রামের কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা স্থান লাভ করেছেন। গুপ্ত এবং পাল-সেন রাজাদের আমলে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক শ্রেণীবিন্যাসের এই পার্থক্যের কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"প্রাচীন বাংলার সমৃদ্ধি যাহা ছিল, তাহা বহুলাংশে নির্ভর করিত ব্যবসা-বাণিজ্যেরই উপর। তাহা ছাড়া পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত দেখিতেছি, ভূমিদান বিক্রয়ের দলিলগুলিতে স্থানীয় অধিকরণে যাহাদের আহ্বান করা হইতেছে, সেই পাঁচজনের মধ্যে দুইজনতো রাজকর্মচারীই—বিষয়পতি স্বয়ং এবং প্রথম কায়স্থ বা জ্যেষ্ঠ কায়স্থ, বাকি তিন জনের মধ্যে দুইজন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিনিধি—নগরশ্রেষ্ঠী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠীগোষ্ঠীর যিনি প্রধান তিনি এবং প্রথম সার্থবাহ অর্থাৎ বণিকদের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি; অবশিষ্ট যিনি রহিলেন, তিনি প্রথম কুলিক অর্থাৎ শিল্পি-গোষ্ঠীর প্রতিনিধি।** রাষ্ট্রেও কতকটা আধিপত্য এই বণিক ও ব্যবসায়ীরাই করিতেছেন রাষ্ট্রের অন্যান্য ব্যাপারেও 'প্রধান ব্যাপারিণ' যাঁহারা তাঁহাদের সাহায্য লওয়া হইতেছে, মহত্তর অর্থাৎ সমাজের অন্যান্য গণ্যমান্য লোকেদের সঙ্গে সঙ্গে। * * * ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে এই সব শ্রেষ্ঠী ও বণিকদের হাতে যে অর্থাগম হইত, তাহার ফলেই ইহারা রাষ্ট্রের আধিপত্য লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। * * * অষ্টম শতক হইতে দেখা যাইবে বঙ্গীয় সমাজ ক্রমশ কৃষি নির্ভর হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে এবং কৃষকেরাই সমাজসৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। বণিক ও ব্যবসায়ী সমাজের প্রতি-পত্তিও হ্রাস হইয়াছে। রাষ্ট্রের অধিষ্ঠানাদিকরণগুলিতে শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, কুলিক ও ব্যাপারী প্রভৃতিদের যে আধিপত্য পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে দেখা যায় অষ্টম শতকে ও তাহার পর আর তাহা নাই। * * * শিল্পী, বণিক ব্যবসায়ী সমাজে তাহা হইলে নিশ্চয়ই ছিলেন; কিন্তু অষ্টম শতকের পূর্বে শ্রেণী হিসাবে তাঁহাদের যে প্রাধান্য রাষ্ট্রে ও সমাজে ছিল, সেই প্রাধান্য ও আধিপত্য সপ্তম শতকের পর হইতেই কমিয়া গিয়াছিল বণিক ও ব্যবসায়ী বৃত্তিধারী যে সব বর্ণের তালিকা উদ্ধার করা হইয়াছে, ইহারা সকলেই ক্ষুদ্র বণিক ও ব্যবসায়ী, স্থানীয় দেশান্তর্গত ব্যবসা-বাণিজ্যেই যেন ইঁহাদের

স্থান। প্রাচীনতর কালের, অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের এবং হয়তো তাহারও আগেকার কালের শ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহরা কোথায় গেলেন? ইঁহাদের উল্লেখ সমসাময়িক সাহিত্যে বা লিপিতে নাই কেন? ঠিক এই সময় হইতেই অর্থাৎ মোটামুটি অষ্টম শতক হইতেই প্রাচীন বাংলার সমাজ কৃষিনির্ভর হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে, এবং ক্ষেত্রকর কর্ষকরাও বিশেষ একটি শ্রেণীরূপে গড়িয়া উঠেন, এবং সেই ভাবেই সমাজে স্বীকৃত হন। অষ্টম শতকের আগে তাহাদের সুনির্দিষ্ট শ্রেণী হিসাবে গড়িয়া উঠিবার কোন প্রমাণ নাই। শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর পক্ষে হইল ঠিক ইহার বিপরীত। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত দেখি—বোধহয় খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতক হইতেই—বিশেষভাবে শ্রেণী হিসাবে তাঁহাদের উল্লেখ না থাকিলেও রাষ্ট্র ও সমাজে ইঁহারাই ছিলেন প্রধান, তাঁহাদেরই আধিপত্য ছিল অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের অপেক্ষা বেশী। ইহার একমাত্র কারণ, তদানীন্তন বাঙালী সমাজ প্রধানত শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর। এই তিন উপায়ই ধনোৎপাদনের প্রধান তিন পথ, এবং সামাজিক ধন বণ্টনও অনেকাংশে নির্ভর করিত ইহাদের উপর। কৃষিও তখন ধনোৎপাদনের অন্যতম উপায় বটে, কিন্তু প্রধান উপায় শিল্প-ব্যবসা বাণিজ্য, অষ্টম শতক হইতে সমাজ অধিকতর কৃষিনির্ভর, এবং উত্তরোত্তর এই নির্ভরতা বাড়িয়াই গিয়াছে। শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য ধনোৎপাদনের প্রধান ও প্রথম উপায় আর থাকে নাই, এবং সেইজন্যই রাষ্ট্রে ও সমাজে ইহাদেরও প্রাধান্যও আর থাকে নাই, ব্যক্তি হিসাবে কাহারও কাহারও মর্যাদা স্বীকৃত হইলেও শ্রেণী হিসাবে সপ্তম শতকপূর্ব মর্যাদা আর তাঁহারা ফিরিয়া পান নাই। লক্ষণীয় যে, অনেক শিল্পী ও বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মধ্যম সংকর বা অসৎশূদ্র পর্যায়ভুক্ত; যাঁহারা উত্তম সংকর বা সংশূদ্র পর্যায়ভুক্ত তাঁহাদেরও মর্যাদা করণ-কায়স্থ, বৈদ্য-অম্বষ্ঠ, গোপ, নাপিত প্রভৃতির নীচে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের সাক্ষ্যে দেখিতেছি, শিল্পী, স্বর্ণকার, সূত্রধর ও চিত্রকর এবং কোনো কোনো বণিক সম্প্রদায়কে মধ্যম সংকর পর্যায়ে স্থান দেওয়া হইয়াছে। বল্লালচরিতের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, বণিক ও বিশেষভাবে সুবর্ণ বণিকদের তিনি সমাজে পতিত করিয়া দিয়াছিলেন। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, রাষ্ট্রে ও সমাজে ইহাদের প্রাধান্য থাকিলে, ধনোৎপাদন ও বণ্টন ব্যাপারে ইহাদের আধিপত্য থাকিলে এইরূপ স্থান নির্দেশ বা অবনতিকরণ কিছুতেই সম্ভব হইত না।"

● বাঙালী সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম রূপের প্রকাশ শুধুমাত্র কীর্তন গানে বা সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র টোলে নয়; এ সংস্কৃতি সমন্বয়ধর্মী—এখানে জ্ঞানভক্তি, মানসিক আধ্যাত্মিক উভয় মানসবৈশিষ্ট্যের পরিচয় মুদ্রিত আছে। বাঙালি যেমন রসের পূজারী তেমনি রূপের পূজারীও বটে; দর্শনশাস্ত্রে তার পারঙ্গমত্ব যেমন স্বীকার্য, তেমনি বৈজ্ঞানিক রূপেও বাঙালির আবির্ভাব চিরস্মরণীয়। অর্থাৎ বাঙালি আবেগ ও যুক্তিকে, রূপ ও রসকে একই বৃন্তবন্ধনে বিকশিত করে সমন্বয়ধর্মী ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছে। খ্রীস্টীয়

যোড়শ শতক থেকে চৈতন্যদেবের সমন্বয়ধর্মী চিন্তাধারার উত্তরাধিকারী বাঙালি শ্রেয় ও প্রেয়র চিন্তায়, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনের মেলবন্ধনে অনিঃশেষ জীবনীশক্তির পরিচয় প্রদান করেছে। বহির্জগতের সঙ্গে বাঙালির সংযোগ তুর্কী ও পাঠান সুলতানদের আমলে খুব বেশি ছিল না। মোগল সাম্রাজ্যে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করায় সমগ্র ভারতের সঙ্গে বাঙালির যোগ সাধনের পথ খোলা থাকলেও, বাঙালি হিন্দু মুসলমান উভয়েই জাগ্রতচিত্ত ঔৎসুক্যের সঙ্গে বহির্জগতে সংযোগ স্থাপনে ব্রতী হয় নি। গ্রামীণ জীবনের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই প্রকৃতিতে, সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে, জীবনদর্শনে প্রায় সমদৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিল, মুসলমান তার পৃথক অস্তিত্বের কথা ঘোষণা না করে মূলতঃ বাঙালি জাতিরূপেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সমগ্র বাংলাদেশ বহিরাগত জাতির সভ্যতা সংস্কৃতির দ্বারা প্রবলভাবে আলোড়িত হলো। ইংরেজের বিশ্বগ্রাসী নাগরিক সভ্যতা বাঙালির গ্রামীণ সভ্যতার দরজায় আঘাত করার ফলে বাঙালির জীবনসংস্কৃতি মুহূর্তমধ্যে মধ্যযুগীয় জীবনবোধ পরিত্যাগ করে আধুনিক জীবনের রাজপথ অবলম্বন করলো। ইউরোপীয় সভ্যতার চিত্তদূতরূপী ইংরেজের সঙ্গে মিলন হওয়ার ফলে বাঙালির নবজন্মান্তর হলো আর এই সভ্যতার সঙ্গে বোঝাপড়ার ভার মূলত গ্রহণ করতে হয় বাঙালি হিন্দুকে। বাঙালি জাতির এই মানসমুক্তির কালে জাতির জীবনে রামমোহনের ন্যায় যুগন্ধর মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্পন্ন হলো। রামমোহন রায় প্রাচীন সংস্কৃতি-ভাষা-সাহিত্য ইত্যাদি সর্বসম্পদের নবীনতর ব্যাখ্যা প্রদান করে যেমন ভারত ও বাংলাকে বক্ষা করে উত্তরাধিকারের সুমহান ঐতিহ্যের পীঠভূমিতে উত্তীর্ণ করলেন, তেমনি মধ্যযুগীয় জীবন ও সমাজের অন্ধতমসা বিদীর্ণ করে সহস্রাংশুবর্ষী সূর্যের আবির্ভাব ঘোষণা করলেন। রামমোহন প্রদর্শিত পথেই বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র আবির্ভূত হলেন। ভারতীয় সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের শাশ্বত ঐতিহ্য না হয়ে তাঁরা ইউরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ আহরণের উপদেশ প্রদান করে বাঙালি তথা ভারতীয় জনগণকে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ঐতিহ্য সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করলেন। কিন্তু বাংলাদেশ তথা ভারতের জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ মুসলমান সমাজ এই সমন্বয়ের ও সাংস্কৃতিক মিলন প্রচেষ্টার কর্মযজ্ঞে কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেনি। ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের ও সাধারণ মানুষের অনেক সুযোগ-সুবিধা সংকুচিত হওয়ায়, তারা ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কৃতিকেও গ্রহণ করতে পারল না। পূর্বতন মুসলমান সাম্রাজ্যের অস্তমিত গৌরব স্মরণ করে অথবা উর্দু কবিতার নবরচিত উদ্যানে তারা জীবনের সার্থকতা অন্বেষণে সচেষ্ট হলো। ধর্মকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে সংহতি শক্তি ও গৌরব পুনরুদ্ধারের যে আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছিল তার ফলশ্রুতি স্বরূপ ওয়াহাবী আন্দোলন দেখা দিল (১৮২০—'৭০ খ্রীঃ)।

কিন্তু এই ওয়াহাবী আন্দোলনকে মুসলমানদের গৌরব পুনরুদ্ধারের আন্দোলন বলা যায় কিনা তা বিতর্কিত। কেননা ভারতবর্ষে বেরিলির সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে মক্কার ওয়াহাবিবাদ প্রসার লাভে সক্ষম হলেও, বাংলায় এর উদ্দেশ্য ছিল বেআইনী সমস্ত করের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়া ও ইংরেজ রাজত্বের উৎখাত করা। যাহোক্, সিপাহী বিদ্রোহের ফলে, [ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম] মোগলরাজ্যপাটের আশা চিরতরে বিলুপ্ত হলে, হিন্দুদের সহযোগিতায় মুগ্ধ ইংরেজ তাদের প্রতি অধিকতর কৃপাপরবশ হলো। ইংরেজ আপন রাজশক্তিকে অটুট রাখার উদ্দেশ্যে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ বাড়িয়ে তুললো। উভয়ের মধ্যে অসুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ও সন্দেহের দৃষ্টিতে উভয়ের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করার প্রবণতা উভয়ের মধ্যে দেখা দিল। ইংরেজ কৃপাপুষ্ট হিন্দু যখন অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্ত ; তখন ইংরেজ মুসলমানদের প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করলো। ফলে ভারতের ইতিহাসে আধুনিক কালের সর্বাপেক্ষা জটিল সমস্যা - হিন্দু মুসলমান সমস্যার আবির্ভাব হলো।

দীর্ঘকাল ঘোষিত এবং অনুসৃত সংস্কৃতি সমন্বয়াদর্শ উল্লিখিত সমস্যার ফলে আঘাত প্রাপ্ত হয়। মুসলমানরা আর হিন্দুসংস্কৃতির অনুচর হতে চায় না। বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ পোষণ করা তাদের কাছে ইসলামপরিপন্থী বলে মনে হলো। বাঙালি মুসলমান সীমিত জীবনদৃষ্টি পরিত্যাগ করে ভারত তথা বহির্জগতের মুসলিমদের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করতে সুরু করেছে। স্বীয় জাতীয়তা, ঐতিহ্য সংস্কৃতিতে আর আস্থাবান না থেকে বহির্জগতের ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি তাদের আকর্ষণ ক্রমবর্ধিত। ফলে মানসিক ব্যর্থতায় তারা পীড়িত। এই সুযোগে পাকিস্তানের আদর্শকে বাঙালি মুসলমানের মানস উদ্যানে রোপন করে তাকে পূর্ণায়ত করার প্রচেষ্টায় রত সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম নেতৃবৃন্দ। ফলে, বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক নতুন যুগ সন্ধির আবির্ভাব হয়েছে। ইংরেজ তার শাসনশক্তি অটুট রাখার মানসে বাঙালি মুসলমানকে প্রকৃত মুসলমান করতে সচেষ্ট হয়েছে। আরব ও পারস্যের ইসলামী সংস্কৃতির আবাহন ও বাংলা ভাষার উর্দুকরণ প্রচেষ্টা এর অন্যতম ফলশ্রুতি। বাংলার সমন্বয়বাদী সংস্কৃতিকে ইসলামীকরণের প্রচেষ্টা নির্ভরশীল তার জীবনীশক্তির উপর; তবে একথা যথার্থ যে, এই প্রচেষ্টা অভিনন্দনীয় নয়। যদি বাংলাদেশে সমন্বয়বাদী সংস্কৃতির পরিবর্তে ইসলামিক সংস্কৃতির প্রাদুর্ভাব ঘটে তবে বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে তার আপোষ অবশ্যম্ভাবী। কেননা, একই জাতির মধ্যে পরস্পরবিরোধী সংস্কৃতির অবস্থান অসম্ভব ও অবাঞ্ছিতও বটে। উভয়কেই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। মুসলমান লেখক মনে করলে আরবী ফার্সি শব্দ বাংলায় ব্যবহার করবেন ; আবার হিন্দুদেরও ইসলাম ধর্ম-সংস্কৃতি বিষয়ক আরবী ফার্সি শব্দ শিখে নিতে হবে। ভাষায় যদি আরবী ফার্সি শব্দ এসেও যায় তাতে চিন্তার কোনো কারণ নেই।

ভাষা আপন প্রাণশক্তির প্রভাবে হয় তাকে গ্রহণ করবে; নয় পরিত্যাগ করবে। মুসলমান লেখকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত আরবী ফার্সী শব্দে যদি সাহিত্যে প্রকৃত রসসৃষ্টি হয়, তবে তা অবশ্যই গ্রহণীয় হবে।

ভাষাগত এই সমন্বয়বাদিতা ব্যতীত প্রাবন্ধিক আর একটি অনিবার্য সত্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে শিক্ষাগত উন্নতির কথা বলেছেন। কারণ শিক্ষার উন্নতির ফলে শ্রেণীগত পার্থক্য কমে এলে ভাষাগত পার্থক্য অবলুপ্ত হয়ে যায়। যদি দুটি ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্য রচনাশৈলী বিরাজিত থাকে তবে তা ভারতের পক্ষের খণ্ড-ছিন্ন বিক্ষিপ্ততা-বিরোধের নামান্তর মাত্র হবে, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের এক সূত্রে গ্রথিত না হলে তা পরাধীনতার নিগড়রূপে পরিগণিত হবে। লেখক বিশ্বাস করেন যে, এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। আধুনিক তুর্কীস্থান ও ইরানের ভাষাগত সংস্কার পর্যালোচনা এর পক্ষে রায় দেয়। তাছাড়া বাঙালিহিন্দুও ইসলামী সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল এবং তার ফলশ্রুতি রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন সাধনায় এবং গিরিশচন্দ্রের কোরানের অনুবাদে প্রকাশিত।

প্রবন্ধের প্রায় সমাপ্তিতে লেখক বাঙালি জাতির বিপর্যস্ত সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় তীব্র বেদনাবোধ করেছেন। সমাজসচেতন প্রবন্ধকার আদর্শগত বিপর্যয় ও যুদ্ধের ফলে জাত অর্থনৈতিক বিভীষিকাকে বাঙালি জাতির উপর প্রচণ্ড আঘাত বলে মনে করেছেন। রক্তশোষক বণিক এবং অকর্মণ্য ও উচ্চাদর্শহীন শাসক সম্প্রদায়ের হৃদয়হীনতা যে পঞ্চাশের মন্বন্তরের কারণ—লেখক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা ঘোষণা করতেও ইতস্তত করেন নি। এই সমস্ত বিপর্যয়ের জন্য প্রাবন্ধিক বাঙালি জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। এমনকি যে বাঙালি সংস্কৃতি দীর্ঘকাল ধরে সমন্বয়ী আদর্শে চালিত তারও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লেখক বিচলিতচিত্ত। দু'হাজার বছরের অধিক কাল ধরে উত্তর ভারত ও বিহার থেকে আগত আর্য ভাষা আগমনে বাঙালি জনগণের যে সমভাষিতামূলক জাতীয়তার সূত্রপাত এবং সেই স্মরণাতীত কাল থেকে বিশ শতক পর্যন্ত যে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির জয়যাত্রা অব্যাহত, প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাঙালি জাতির সেই সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করলেও বিপন্ন করতে পারে নি; সেই বাঙালি জাতি পঞ্চাশের মন্বন্তরে তার মধ্যবিত্ত কৃষক-শিল্পী ও শ্রমজীবী নিয়ে প্রায় বিলুপ্তির পথে। তাই লেখকের আক্ষেপ 'ইহার ফলে বাঙ্গালীর সংস্কৃতি কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহার স্থিরতা নাই।'

কিন্তু তবুও প্রাবন্ধিক আশাবাদী; তিনি বিশ্বাস করেন জাতির ভাষা-সাহিত্যের মধ্যে জাতির প্রাণ ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্ন থাকে। ভাষা ও সাহিত্যের দ্বারা জাতি পুনর্জীবিত হয়। জাতির জন্মগত প্রকৃতি, তার ইতিহাস ও আভ্যন্তর আত্মা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বুঝে জাতিকে আবার জাগ্রত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর এটাই হলো ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। প্রবন্ধের সমাপ্তিতে জাতীয় জীবনে আশার বাণী উচ্চারণকারী প্রাবন্ধিক ইতিহাসবিদ সাহিত্যিকদের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে সমাজচেতনার পরিচয় দান করেছেন।

যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা : অন্নদাশঙ্কর রায় ।।

[অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা' প্রবন্ধটি ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে রচিত। প্রবন্ধটি লেখকের 'শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য প্রবন্ধ গ্রন্থটিতে কুড়িটি প্রবন্ধ আছে। 'যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা' প্রবন্ধটি দশম প্রবন্ধ।]

● লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় প্রবন্ধটির নামকরণ 'যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা' করলেও প্রবন্ধটি মূলত কিন্তু ভাষাসমস্যাকেন্দ্রিক; কেননা প্রবন্ধটির মাত্র তিনটি অনুচ্ছেদে (প্রথম তিনটি) রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ণয় প্রসঙ্গে ধর্মের কথা এনেছেন। প্রবন্ধটি প্রধানত ভাষা সমস্যাকেন্দ্রিক বলে প্রবন্ধটি পাঠের পটভূমিকা স্বরূপ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের ভাষা সমস্যার মূলকেন্দ্রবিন্দুসম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়া উচিত।

আমরা জানি যে, ভারত স্বাধীন হওয়ার ছ'বছর পরে ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য একটি সরকারী কমিশন গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। সেই বছর ডিসেম্বর মাসে গঠিত রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে তার প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দের ৩১ আগস্ট কমিশনের প্রতিবেদনভিত্তিক একটি খসড়া আইন লোকসভায় অনুমোদিত হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসে প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধন নিষ্পন্ন হয়। ১৯৫৬-এর নভেম্বর মাস থেকে প্রশাসনিক ও আঞ্চলিক বিভাগগুলিতে সংশ্লিষ্ট নতুন আইন চালু হয়। এভাবে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্র নতুনভাবে অঙ্কিত হলে এবং নতুন রাজ্যগুলি গঠিত হলে কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নানা কারণে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। নতুন প্রশাসনিক বিভাগ ও জাতিভিত্তিক রাজ্য গঠনের ফলে আঞ্চলিকতার কারণে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ১৯৫৬-এর প্রশাসনিক ও আঞ্চলিক বিভাগ সংস্কার ভারতের জাতি সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান দিতে পারে নি। বিশেষভাবে বহুভাষাভাষী অঞ্চলগুলি যেসব প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, সেখানে ভাষাভিত্তিক নতুন রাজ্য গঠনের সংগ্রাম অব্যাহত ছিল এবং এপ্রসঙ্গে বোম্বাই, আসাম, পাঞ্জাব ইত্যাদির নাম করা চলে।

বোম্বাই রাজ্যে মহারাষ্ট্র থেকে গুজরাটকে বিচ্ছিন্ন করার আন্দোলন শুরু হয় ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে এবং সেই ব্যাপক গণ-আন্দোলনের ফলে ১৯৬০-এ রাজধানী বোম্বাইসহ মহারাষ্ট্র এবং রাজধানী আমেদাবাদসহ গুজরাট রাজ্য গঠিত হয়। পাঞ্জাবেও পাঞ্জাবী ভাষাভাষীদের রাজ্য ও শিখদের বাসভূমি গঠন নিয়ে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল ১৯৫৬-তে পাঞ্জাব ও পেপসু নিয়ে নতুন পাঞ্জাব রাজ্য গঠিত হলে পঞ্জাবীকে রাজ্যের সরকারী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল এবং হিন্দী দ্বিতীয় সরকারী ভাষার মর্যাদা লাভ

করে। সরকারী কাজকর্মে জেলাপর্যায়ে পাঞ্জাবের জেলাগুলিতে পঞ্জাবী ও হরিয়ানায় হিন্দী ব্যবহৃত হত। পরবর্তীকালে পাঞ্জাব দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং হরিয়ানা হিন্দীভাষাভাষী রাজ্য রূপে পৃথক মর্যাদা পায়।

ভারতবর্ষে জাতিভিত্তিক রাজ্য গঠনের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী ভাষার প্রসঙ্গটিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে সংবিধানসভা দেবনাগরী হরফে লেখা হিন্দীকে ভারতের সরকারী ভাষার এবং ইংরেজিকে আগামী পনেরো বছর পর্যন্ত দ্বিতীয় ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছিল।

১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে বি. জি. খেরের নেতৃত্বে সরকারী ভাষা কমিশন গঠিত হয়। কমিশনকে বলা হয় যে, কমিশন যেন অবিলম্বে ভারতের প্রজাতন্ত্রগুলিকে হিন্দীর ব্যাপকতর ব্যবহার সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির কাছে নিজ নিজ সুপারিশ প্রদানের পরামর্শ দেয়। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে কমিশন রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবেদন পেশ করে এবং ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে রাষ্ট্রপতি সেই প্রতিবেদন পার্লামেণ্টে পেশ করেন। কমিশন সংবিধানে বিধিবদ্ধ ভাষা সংক্রান্ত নীতি সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিকে দেশের আপামর জনগণের শিক্ষা-মাধ্যম রূপে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ঘোষণা করে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। বেশির ভাগ রাজ্যের সংখ্যাগুরু জনগণের কথ্যভাষা হিসেবে সরকারী ভাষারূপে হিন্দীর সম্ভাবনাও কমিশন স্বীকার করে। কমিশনের এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও ভাষা-সমস্যা নিয়ে বিতর্ক বিরোধের অবসান ঘটল না। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে ভাষাভিত্তিক প্রশাসনিক ও আঞ্চলিক বিভাগগুলি পুনর্গঠনের সময় সরকারী ভাষার প্রশ্নটি বিতর্কমূলক হয়ে দেখা দেয়। ভারতবর্ষের বহু অংশেই কমিশনের প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়।

১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থের নেতৃত্বে সরকারী ভাষার প্রশ্নটি পুনর্বিবেনার জন্য একটি পার্লামেণ্টারী কমিটি গঠিত হয়। সরকারী ভাষা সংক্রান্ত কমিশনের প্রতিবেদন সম্পর্কে কমিটিকে তার মতামত রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করতে বলা হয়। কমিটি ১৯৫৯-এ রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা প্রতিবেদনে সুপারিশ করে যে, ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দের পর হিন্দী সরকারী ভাষা হলেও ইংরেজি পার্লামেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষে দ্বিতীয় সরকারী ভাষা হিসেবে যতদিন প্রয়োজন ততদিন কার্যকরী থাকবে এবং এই ব্যবস্থাই সমীচীন হবে। অবশ্য ক্রমশ ইংরেজি থেকে হিন্দীতে উত্তরণের একটি পরিকল্পনাও এই কমিটি পেশ করে। ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে পার্লামেণ্টের এক অধিবেশনে ঘোষণা করা হয় যে, সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য ইংরেজির স্থলে হিন্দী প্রচলনের ব্যাপার মুলতুবী রেখেছেন। তবে এই সঙ্গে সিদ্ধান্তও হয় যে, হিন্দীতে বিশেষ পরিভাষা প্রণয়নের উদ্যোগ সম্প্রসারিত হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হিন্দীকে তাদের শিক্ষার মাধ্যম রূপে ব্যবহার করবে।

উল্লিখিত আলোচনার পটভূমিকায় 'যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা' প্রবন্ধটি পঠনীয়।

স্বাভাবিকভাবে প্রবন্ধটি সমসাময়িক সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত। লেখকের প্রবন্ধ-সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য এখানে ক্রিয়াশীল। অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধ সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য ও তার পিছনে ক্রিয়াশীল প্রধান শক্তিটি হলো লেখকের সামাজিক চৈতন্যবোধ, যার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে অন্নদাশঙ্কর বলেন—'যদিও আমার প্রধান কাজ সৃষ্টি, একটির পর একটি করি আর একটুর পর একটু মুক্ত হই, তবু আমাকে কখনো কখনো সৃষ্টির কাজ সরিয়ে রেখে দেশের ও কালের ভাবনার ভাগ নিতে ও দিতে হয়। নইলে আমি হব পলায়নবাদী।' দেশের ও কালের ভাবনার ভাগ দেওয়া ও নেওয়ার বোধ থেকেই অন্নদাশঙ্করের অধিকাংশ প্রবন্ধের জন্ম এবং আলোচ্য প্রবন্ধটিও এই কর্তব্যবোধ ও সমসাময়িক প্রয়োজন থেকে জাত। তার প্রবন্ধের কাজই হলো সমস্যা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলা। সমস্যার সমাধান একদিন না একদিন হয়ে যায়, কিন্তু তাঁর প্রবন্ধগুলি সমসাময়িকতা উত্তীর্ণ হয়ে ঐতিহাসিক মূল্য অর্জন করে। আর এইখানেই সমালোচ্য প্রবন্ধটির গৌরব। কেননা, সেই ১৯৬২-তে রচিত প্রবন্ধটি আজও তার সামাজিক তথ্য ও ঐতিহাসিক বোধ নিয়ে আমাদের আলোড়িত করে।

● বস্তুসংক্ষেপ :

যে দেশে বহু ধর্মমত প্রচলিত আছে, সেই দেশের মূলনীতি কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী পাকিস্তান হয়েছে ধর্মীয় রাষ্ট্র; আর ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের মত ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হয় নি। ভারতে সমস্ত ধর্মকেই সমান সত্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে ভারত সেকুলার বা ধর্ম-নিরপেক্ষ বলে সমস্ত ধর্মের প্রতি সে সমদর্শী মনোভাব পোষণ করে। [১]

বর্মাও ধর্মনিরপেক্ষতার যুক্তি অবলম্বন করলেও সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে উ নু ও তাঁর দল বর্মাকে বৌদ্ধ রাষ্ট্র রূপে ঘোষণা করলেন। ফলে অন্যান্য পার্বত্য জাতি আংশিক স্বাতন্ত্র্যের দাবী ঘোষণা করলে প্রধান সেনাপতি ক্ষমতা দখল করে নির্বাচিত শাসনতান্ত্রিক সরকার ধ্বংস করলেন; বৌদ্ধরাষ্ট্র লোপ পেলো। পাকিস্তানেও নির্বাচিত সরকারের পরিবর্তে সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তবে ইসলামী রাষ্ট্র লোপ পায় নি। পাকিস্তানে গণতন্ত্র ফিরে এলে পাকিস্তানী জনগণ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মর্যাদা উপলব্ধি করবে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সকলের সমান অধিকার, সেখানে কেউ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক নয়। গণতন্ত্র না থাকলে দেশ একনায়কতন্ত্রের পদানত হয়। [২]

ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়ায় এখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বেশ মজবুত। বার্মা বা পাকিস্তানের মত তার দশা হয় নি। যদি কেউ মনে করেন যে, ভারত ফ্যাসিস্ত শাসিত হিন্দু রাষ্ট্র হোক্—তবে ভারতের দশা হবে বার্মা ও পাকিস্তানের মতো। [৩]

বহু ধর্মমতের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে বহু ভাষাভাষীর প্রসঙ্গও এসে পড়ে। যে দেশে বহু ভাষা বিরাজিত তার মূল নীতি কী হওয়া উচিত এ প্রসঙ্গে বেলজিয়ম ও সুইট-জারল্যাণ্ড ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিয়েছে। বহু ভাষাভাষী ভারতও ভিন্নভাবে দিয়েছে। কোন পদ্ধতি সঠিক, তাই বিচার্য। [৪]

১৮৩০ সালে স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে বেলজিয়মের আবির্ভাব হলেও তার রাষ্ট্র ভাষা ছিল ফরাসী। অনতিকাল পরে ফ্লেমিশ ভাষীদের আন্দোলন আরম্ভ হলে ১৮৯৮ সাল থেকে ফ্লেমিশ ভাষাও বেলজিয়মের রাষ্ট্রভাষারূপে পরিগণিত হয়। ফলে, বেলজিয়মে এখন রাষ্ট্রভাষা দুটি। [৫]

সুইটজারল্যাণ্ডে ১৮৭৪ সালের শাসনতন্ত্রে জার্মাণ, ফরাসী ও ইটালিয়ানকে রাষ্ট্র-ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সেখানে উপরদিকের কাজকর্মের ভাষা এই তিনটি হলেও, নীচের দিকের কাজকর্ম চলে জেলা অনুসারী ভাষায়। তা ছাড়া সর্বত্র ইংরেজি ভাষারও প্রচলন আছে। [৬]

এক সময়ে ইউরোপে এমন মতবাদ প্রচলিত ছিল যে, একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রধর্ম হবে। এর ফলে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। অবশ্য একটা দেশের একটা রাষ্ট্র-ভাষা হবে—ইউরোপে এ ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক, আর এর ফলে আলসাস লোরেনের লোক জার্মাণ ও ফরাসীদের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছে। [৭]

ভারতবর্ষ বহু ভাষাভাষী ও বহু ধর্মের দেশ হওয়ায় অনেকে বহু ধর্মের প্রতি সম-দর্শিতার ভাব স্বীকার করে নিলেও, দেশের রাষ্ট্রভাষা একটাই হবে—এমন মতবাদ পোষণ করেন। পরাধীন ভারত একটি বিদেশী ভাষার দ্বারা ঐক্যসূত্রে গ্রথিত ছিল বলে অনেকে মনে করেন যে, রাষ্ট্রভাষা একটাই হওয়া উচিত। কিন্তু এ বক্তব্য গ্রহণীয় নয়, কেননা সকলের সম্মতি, সুবিধা ও ন্যায়বোধের ভিত্তিতে বিষয়টির বিচার করা উচিত। ভাষানীতি ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের দ্বারা একটি ভাষা চাপিয়ে দিলে তার সমাধান অপরিণামদর্শী হয়। ইতিমধ্যেই তামিলদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী উঠেছে। ভাষাগত বিরোধে ভারত আবার বিচ্ছিন্ন হবে—এমন আশংকা অসঙ্গত নয়। [৮]

অধিকাংশ লোক চায় বলেই হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করা উচিত হবে না। সকলের ন্যায়বোধ তাতে চরিতার্থ হবে না। পাকিস্তানে ধর্মের ব্যাপারে যা হয়েছে, ভারত-বর্ষে ভাষার ব্যাপারে তা হবে—এটা অনভিপ্রেত। ধর্মকে যেমন, ভাষাকেও তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের দ্বারা নির্ণয় করা অনুচিত। ভারত ধর্মের ব্যাপারে যে বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে ভাষার ব্যাপারেও সেই বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে হবে। [৯]

ভারতে ভাষাসমস্যা কিন্তু হিন্দী বনাম ইংরেজি ভাষাকেন্দ্রিক নয়, সমস্যাটা হলো হিন্দী বনাম অন্যান্য ভারতীয় ভাষা। ইংরেজি ভাষাকে সরাবার পর হিন্দীর একাধিপত্য অনেকেই মেনে নেবে না। ইংরেজিকে যেমন ঘাড় থেকে নামানো হয়েছে তেমনি তারা হিন্দী ভাষাকেও নামাতে চাইবে। কেননা, হিন্দী যাদের মাতৃভাষা নয়, তারা

বুঝতে পারবে যে, প্রত্যেকটি হিন্দীভাষী অন্য ভাষাভাষীদের থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে আছে। [১০]

ইংরেজি ভাষার পর একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দীর স্বপ্ন দেখা অযৌক্তিক। হিন্দীর সঙ্গে অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা উচিত। তা সম্ভব না হলে এমন একটি ভাষাকে হিন্দীর সঙ্গে সমবন্ধনীভুক্ত করা হোক্ যাতে সকলের ন্যায়বোধ চরিতার্থ হয়। বিদেশি ভাষা বলে ইংরেজিকে যদি দূর করতে হয় তবে হিন্দীর বন্ধনীভুক্ত হতে পারে—এমন ভাষা অহিন্দীভাষীদের দ্বারা স্থির হওয়া উচিত। [১১]

ইংরেজির মতো কোনো ভাষাই ভারতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত নয়। শুধু বিদেশি বলেই ইংরেজি ভাষা যদি পরিত্যাগ করতে হয়, তবে পার্লামেণ্ট, আর্মি, নেভি, পুলিশ স্কুল, কলেজ, ব্যাংক, স্টক এক্সচেঞ্জ সবই তো পরিত্যাগ করতে হয়। অনেক সত্যেরও উৎপত্তি যে ইংলণ্ডে সেই সত্যগুলিকেও বাদ দিতে হয়। আর স্বদেশি ভাষায় অনুবাদ করলেও বস্তুর বস্তুসত্তা অপরিবর্তিতই থেকে যায়। [১২]

পরাধীনতার কালে ইংরেজি ভাষার সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা বর্তমানে নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। বর্তমানে সব ছাত্রকেই একটা স্তর পর্যন্ত ইংরেজি শিখতে হয়। শিক্ষণীয় ভাষারূপে ইংরেজিতে যদি আপত্তি না থাকে তবে প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায় ইংরেজি ভাষাকে মাধ্যম রাখাতে আপত্তি ওঠা উচিত নয়। আর যদি হিন্দী ভাষাকে অন্যতম মাধ্যম করা হয়, তবে বাংলা, তামিল, কন্নড, মালায়ালমকেও সমমর্যাদা প্রদান করতে হবে। [১৩]

জাতীয় মর্যাদার জন্য হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষা হলেও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য ইংরেজি ভাষা অবশ্যই গ্রহণীয়। শুধু হিন্দীর পরিবর্তে, বাংলা, উর্দু, মারাঠি, গুজরাতী ইত্যাদি প্রায় সমস্ত ভাষাকেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যম করা হোক্। বিদেশি বলে ইংরেজিকে তাড়িয়ে, শুধু স্বদেশী বলেই হিন্দী বরণীয় নয়। তার সঙ্গে অন্যান্য আন্তঃরাজ্য ভাষাকেও সমমর্যাদা দান করতে হবে। জাতীয়তার জন্য এই সূত্র গ্রহণীয়। [১৪]

একটা দেশের একটা রাষ্ট্রভাষা থাকা উচিত সূত্রানুযায়ী হিন্দীকে ভারতের একচ্ছত্র ভাষা করবার জন্য যাঁরা বদ্ধপরিকর তাঁদের মনে রাখা উচিত যে একাধিক রাষ্ট্রভাষা বেলজিয়াম বা সুইসদের ঐক্যহানি ঘটায় নি। [১৫]

বিদেশির এবং বিজেতার ভাষা বলে ইংরেজিকে বিদায় দিলে স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হবে, এমন ধারণা করে হিন্দীকে মাত্র সরকারী ভাষারূপে স্বীকার করে নিলে অন্যান্য ভাষার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। তা না হলে ভারতে প্রচলিত সমস্ত ভাষাকেই মর্যাদা প্রদান করা হোক। ভারতে যতগুলি ভাষা, ততগুলি রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত, নচেৎ অমীমাংসিত সমস্যা একদিন প্রকাশ হবে এবং বহুভাষী দেশ বহুরাষ্ট্র সমন্বিত হবে। [১৬]

ইউরোপীয়দের আগমন না ঘটলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষ বহু

রাষ্ট্রে বিভক্ত হতো এবং যে যার সুবিধামতো স্বদেশি ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করতো। এমনকি সবাই মিলে যদি কনফেডারেশন গড়ে তুলত তাহলে হয়তো কোনো একটি ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে পরিগণিত হতো না। এমনকি ১৯৪৭-এ জিন্না যদি ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনায় সম্মতি জানাতেন তবে সম্মিলিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা নিশ্চয়ই কোনো একটি হতো না। গান্ধী বা জিন্না কেউই হিন্দীর একচ্ছত্র দাবী স্বীকার করতেন না। ঐক্যের জন্য হয় যমজ ভাষাকে সম্মিলিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা করতে হতো ; নচেৎ ইংরেজিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাষ্ট্রভাষা রাখতে হতো। [১৭]

দেশ ভাগ হওয়ার জন্যই হিন্দী এবং উর্দু দুটি রাষ্ট্রের একচ্ছত্র ভাষা হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমান উপলব্ধি করেছে, উর্দুভাষী মুসলমানদের শোষণের স্বরূপ। বাঙালি মুসলমানরা কিন্তু উর্দুভাষীদের এই ভাষাগত শাসন, শোষণ ও অত্যাচার মেনে নেবে না। এর ফলে হয়তো পাকিস্তান রাষ্ট্র দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যেতে পারে। [১৮]

পূর্বপাকিস্তানীদের বিরোধ আসলে উর্দুভাষীদের একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে, উর্দুভাষার বিরুদ্ধে নয়। ভারতের অনেকেও এমন ভাবছেন যে, ভারতের শাসক ও ধনিক শ্রেণী হবে হিন্দীভাষাভাষীরা। মহাত্মা গান্ধী ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ চেয়েছিলেন ; তা কিন্তু বাস্তবায়িত হয় নি। কেননা, শিল্পায়ন বিকেন্দ্রীকরণের অন্তরায়। হিন্দীভাষী-দের ধনাধিক্য ও ভোটাধিক্যের উপর কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে ছেড়ে দিলে সেটা গণতন্ত্রের মতো দেখায় বটে ; কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত উত্তর ভারতের মাথাভারী গণতন্ত্রে পরিণত হয়। হিন্দী ভাষার একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে ভারতের অন্য ভাষাভাষীদের সংগ্রাম হিন্দী ভাষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়, এ সংগ্রাম হিন্দীভাষী শাসক ও ধনিক সম্প্রদায়ের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। [১৯]

ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, দেশ খণ্ডবিখণ্ড হলে স্বাধীনতা রক্ষিত হয় না। সুতরাং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতিগত মিলনের জন্য চাই ভাষাগত স্বাধীনতা ও সমমর্যাদা। কিন্তু হিন্দী ভাষার একচেটিয়া আধিপত্য তার বিরোধী। জাতীয় সংহতির জন্য চাই হিন্দীভাষী ও অহিন্দীভাষীদের মধ্যে আত্মিক মিলন—যা সম্ভব হতে পারে অন্যান্য ভাষার সমমর্যাদায় ও সহচর ভাষার স্বীকৃতিতে। [২০]

ইংরেজি শব্দের আগে বিদেশী বিশেষণ যদি সমস্যার কারণ হয় তবে আন্তর্জাতিক শব্দের ব্যবহার যথাযথ বলে মনে হয়। স্বাধীন রাষ্ট্র যদি কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তবে আন্তর্জাতিক ভাষা ব্যবহার করলে কোনো সমস্যা হতে পারে না। তামিলদের কাছে হিন্দী বিদেশী : হিন্দী শেখা সহজ হলেও হিন্দীতে শিক্ষণীয় বিষয় ইংরেজির থেকে কম। [২১]

হিন্দী ভারতের বহুল প্রচলিত ভাষা বলে কাজ কারবার চালাবার জন্য হিন্দী ভাষা অবশ্যই শিক্ষণীয়। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান সুখের হলেও, সমস্যাটা এই

যে, ধর্মের ক্ষেত্রে ভারত নিরপেক্ষ হলে ভাষার ক্ষেত্রে হতে পারেনি। ভারত হিন্দু রাষ্ট্র নয় একথা সত্য, কিন্তু ১৯৬৫ সালে হিন্দী ভারতের একমাত্র সরকারী ভাষা হওয়ায় ভারতকে হিন্দি রাষ্ট্র বলতে কোনো বাধা নেই। ফলে হিন্দীভাষীরাই ভারতে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। সংবিধান রচনার কালে গণপরিষদের সদস্যরা কিন্তু হিন্দীকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে একমত হননি। প্রায় সমসংখ্যক ভোট পেলেও হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে ঘোষণা করে গণপরিষদের মর্যাদা রক্ষা করা হয় নি। [২২]

ভারতের সংবিধানে কোনো ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষা বলা হয় নি; হিন্দীকে সরকারী ভাষা বলা হয়েছে। রাষ্ট্রভাষা, জাতীয় ভাষা ইত্যাদি আখ্যা সমস্ত ভাষারই প্রাপ্য কোনো একটি ভাষার নয়। লোকের মুখে মুখে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা রূপে পরিচিত হয়েছে। লোকমুখে হিন্দী যখন রাষ্ট্রভাষারূপে পরিচিত তখন ইংরেজিকে তার সহচর ভাষা করতে আপত্তি হওয়া উচিত নয়। তবে হিন্দীভাষীরা ইংরেজি কেন, অন্য কোনো ভাষাকেই সহচর ভাষারূপে মেনে নিতে চান না। [২৩]

হিন্দী এবং ইংরেজি ভাষা পাশাপাশি অবস্থান করলে ভাষা বিনিময়ের অভাব হবে না। শুধু ইংরেজি বা হিন্দী কেন, সংস্কৃত বা উর্দুতেও ভাব বিনিময় হতে পারে—যদি সেরকম মনোভাব থাকে। [২৪]

ভাববিনিময় যে কেবলমাত্র একটি ভাষায় হবে তা যথাযথ নয়। গান্ধীজী সাধারণত হিন্দীতে ভাববিনিময় করলেও তিনি নোয়াখালিতে বাংলায়, তামিলদের সঙ্গে তামিলে এবং পশ্চিমা মুসলমানদের সঙ্গে উর্দুতে ভাববিনিময় করতেন।

এমনকি স্বাধীন ভারতে সংস্কৃতভাষী বিদ্যানুরাগীদের সম্মেলন হয় ইংরেজিতে। এমনকি লালা লাজপত রায়ের 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার ভাষা ছিল উর্দু। [২৫-২৭]

সরকারী ভাষা না হলেও পশ্চিমা হিন্দু ও শিখদের স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করা যায় উর্দুতে। সরকারী ভাষারূপে ইংরেজি স্বীকৃত না হলেও তার কদর থাকবে দীর্ঘদিন। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের লোকেরা টোল বা মাদ্রাসার পরিবর্তে হাইস্কুলে লেখাপড়া করতে চায়। আসলে ইংরেজকে হটালেও ইংরেজিকে হটানো খুব সহজ নয়। [২৮]

রাষ্ট্র ভাষার প্রয়োজনে না হলেও স্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক করার জন্য বা করতে সাহায্য করার জন্য ইংরেজি ভাষার থাকা উচিত। বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হলে বাংলাই হয়তো রাষ্ট্রভাষা হতো; কিন্তু সৃষ্টি ও সমালোচনার আদর্শ তুলে ধরার জন্য ইংরেজিকে সহচর ভাষারূপে রাখতে হতো। কেননা, ইংরেজের যুগ গেলেও ইংরেজির যুগ যায় নি। [২৯]

ইংরেজি ভাষা বাংলাকে এগিয়ে দিতে না পারলে তার কোনো গুরুত্বই থাকবে না। ইংরেজি সাহিত্য যদি অন্তঃসারশূন্য, অবক্ষয়ী হয়, জলন্ত বিবেক যদি নির্বাপিত হয় তবে ইংরেজির আদর সুচিরস্থায়ী হবে না। আপনা থেকেই সে চলে যাবে। জোর করে ইংরেজি শেখানো অন্যায়; অবশ্য শিক্ষণীয় ভাষারূপে ইংরেজির অবস্থান অনুচিত। [৩০]

ইংরেজির পশ্চাদ্‌পসরণ যেমন অসম্ভব নয়; তেমনি হিন্দীর অগ্রসরণও সম্ভব। হিন্দী প্রয়োজনে উর্দু ভাষাকেও আত্মসাৎ করতে পারে। হিন্দী ব্যাকরণ সরল হলে, রোমক / বাংলা লিপিতে হিন্দী বই-পত্রিকা মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হলে তার প্রসার বাড়বে। [৩১]

ইংরেজির দীপশিখা নির্বাপিত হলে যে হিন্দী, বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলি প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠবে—এমন ধারণা করা যুক্তিহীন। ইংরেজির দীপ যতদিন উজ্জ্বল আছে ততদিন অন্য ভাষাগুলির প্রাণশক্তি বাড়িয়ে নেওয়া উচিত। অকালে ইংরেজি ভাষার দীপ নিভিয়ে দিলে হয়তো নিজেদের ভাষার রাজ্যেও অন্ধকার নেমে আসতে পারে। [৩২]

● প্রবন্ধ বিশ্লেষণ ঃ

প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা' প্রবন্ধে সমাজ ও ইতিহাসজাত অভিজ্ঞতাকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। যদিও প্রবন্ধটিকে বহু ধর্ম ও বহুভাষা কেন্দ্রিক নামকরণে উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও আলোচ্য প্রবন্ধটিতে কিন্তু ভাষাগত-সমস্যার কথাই বিশেষভাবে আলোচ্য। ধর্ম সম্পর্কিত আলোচনা সূত্রাকারে গ্রথিত হয়েছে এবং প্রবন্ধটির বহুলাংশ ব্যয়িত হয়েছে ভাষা সম্পর্কিত আলোচনায়। প্রবন্ধটিতে অন্নদাশঙ্কর মূলত তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছেন— ১. বহু ধর্মাবলম্বী ও বহুভাষাভাষী দেশের মূলনীতি। ২. হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি। ৩. ইংরেজি ভাষার সমর্থনে যুক্তি। প্রথমাংশে প্রাবন্ধিক অন্যান্য আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের উল্লেখ করলেও, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের সামাজিক ঐতিহাসিক ও ভাষাগত পটভূমিকায় তার আলোচনা করতে চেয়েছেন। প্রবন্ধের দ্বিতীয় ও তৃতীয়াংশকে পরস্পরের পরিপূরক বলা যেতে পারে।

ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নকালে শাসনতন্ত্রের রচয়িতারা ভাষাসমস্যা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। বিশাল ভারতের বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে। ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্যের জন্য একটি সরকারী ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। পৃথিবীর অন্য কোনো রাষ্ট্রে ভাষাসমস্যা সম্ভবত এত গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করে নি এবং ভাষাকে কেন্দ্র করে জাতীয় জীবনে সংকট ঘনিয়ে ওঠে নি। গণপরিষদে সরকারী ভাষাকেন্দ্রিক আলোচনার সময় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা সমস্যা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ ভারত, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি অ-হিন্দীভাষী অঞ্চল তীব্র বিরোধিতা করে। হিন্দীকে সরকারী ভাষা করা হলে হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং সরকারী চাকুরীতে অ-হিন্দীভাষীদের তুলনায় হিন্দীভাষীরা সুযোগ পাবে। তাছাড়া, দীর্ঘকাল ব্যবহৃত ইংরেজি ভাষাকে সরকারী কাজকর্মে নিষিদ্ধ করলে প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হবে।

ইংরেজি ভাষা আন্তর্জাতিক জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশের চাবিকাঠি; অতএব ইংরেজি ভাষা না থাকলে আন্তর্জাতিক জগতের নতুন সামাজিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, ভাষাতাত্ত্বিক ইত্যাদি গবেষণার সুফল থেকে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হবে। ইংরেজি ভাষার পরিবর্তে হিন্দী সরকারী ভাষা হলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যা দেখা দেবে। বিপরীতপক্ষে হিন্দী ভাষার সমর্থকগণ সর্বভারতীয় হিন্দীভাষাকে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক সর্ত বলে মনে করেছিলেন। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ইংরেজি ভাষা অপেক্ষা হিন্দী ভাষাই গ্রহণীয়। এই সমস্ত যুক্তির ঘূর্ণাবর্তে নানা সমস্যার আবির্ভাব হয়। প্রাবন্ধিক তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে ভারতের ভাষাসমস্যার স্বরূপ নির্ণয় করতে চেয়েছেন এবং ভবিষ্যত রূপরেখা প্রদানেও সচেষ্ট হয়েছেন।

● 'যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায় প্রবন্ধের মূলকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত সমস্যার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ও আলোকপাত করতে চেয়েছেন যে দেশে বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন ধর্ম প্রচলিত সে দেশে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন নীতি গ্রহণীয় সে সম্পর্কে প্রাবন্ধিক অন্যান্য কয়েকটি রাষ্ট্রের উল্লেখ করে ভারতের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধের প্রথমাংশে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে লেখক বহু ধর্ম প্রচলিত রাষ্ট্রের মূলনীতি আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। বহুধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রের ধর্মনীতি সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ ভারতরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রসঙ্গত পাকিস্তান ও বর্মার তুলনা করেছেন। ভারতের শাসনতন্ত্রে ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে অভিহিত করা হয়েছে। এই ধর্মনিরপেক্ষতার মূল কথা হলো কোনোপ্রকার রাষ্ট্রীয় ধর্মের (state religion) অনুপস্থিতি। ভারত রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ করার অর্থ সরকার কোনো ধর্মকে বিশেষ কোনো সুবিধা প্রদান করবে না। প্রত্যেক ধর্মের প্রতি সমান ব্যবহার করবে। সংবিধানের ১৫ ও ২৬ ধারায় প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মস্বীকার, ধর্মপ্রচার ও ধর্মাচরণের অধিকারকে মেনে নেওয়া হয়েছে। ২৭ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের জন্য কোনো ব্যক্তিকে কর দিতে বাধ্য করা যায় না। ২৮ ধারায় বলা হয়েছে, সরকারী অর্থের উপর নির্ভরশীল কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মসংক্রান্ত শিক্ষা দেওয়া চলে না। ভারতরাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে ভেঙ্কটরমন বলেছেন—'The state is neither religious, nor irreligious, nor anti-religious, but is wholly detached from religious dogmas and activities and thus neutral in religious matters.' অর্থাৎ রাষ্ট্র কোনো ধর্মের পরিপোষকতা করে না, কোনো ধর্মের বিরোধীও নয়, এমনকি অধার্মিকতাকে প্রশ্রয় দেয় না। সমস্ত প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্পর্করহিত থেকে ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকাই রাষ্ট্রের প্রকৃত

ভূমিকা। ভারত ধর্ম সম্পর্কে যে ভূমিকা পালন করে তাকেই যথার্থভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রকৃতি বলা চলে। ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভারতরাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না। এখানে ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা ও স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। অবশ্য ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ (secular) রাষ্ট্ররূপে অভিহিত না করে 'অসম্প্রদায়িক রাষ্ট্র' (Non-communal State) রূপে অভিহিত করার পক্ষপাতী।

বহুধর্ম প্রচলিত রাষ্ট্রের মূলনীতি কী হওয়া উচিত এ সম্পর্কে প্রবন্ধকার কোনো বিতর্কিত বক্তব্যের অবতারণা না করে বলেছেন যে, যে দেশে বহু ধর্ম প্রচলিত সে দেশের মূলনীতির রূপায়ণ দু'ভাবে করা যেতে পারে। প্রথম উদাহরণ হলো পাকিস্তান, যেখানে ইসলাম ধর্ম রাষ্ট্রের ধর্ম; অর্থাৎ পাকিস্তান রাষ্ট্রে ধর্মসম্পর্কে শাসনতন্ত্রে নিরপেক্ষতার কথা ঘোষণা করা হয় নি। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছানুসারে পাকিস্তান হয়েছে ইসলামী রাষ্ট্র। দ্বিতীয় উদাহরণ হলো ভারতবর্ষ—যেখানে সে ভিন্নপথ অবলম্বন করে সমস্ত ধর্ম সম্পর্কে সমদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। ভারত তার আপন ঐতিহ্য সংস্কৃতি অনুযায়ী কোনো বিশেষ ধর্মসম্পর্কে পক্ষপাতিত্বমূলক মনোভাব দেখায় নি। ভারতের কাছে সমস্ত ধর্মই সমান ও সত্য। কোনো একটি ধর্মের পরিপোষকতা করা ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিরোধী। ধর্মের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ নিরপেক্ষ অর্থাৎ secular—সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি মমতাবশত ভারতবর্ষ বিশেষ একটি ধর্মকে রাষ্ট্রধর্মে পরিণত না করে সকলকেই নিজ নিজ বিশ্বাসানুযায়ী ধর্মাচরণের অধিকার প্রদান করেছে। সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু নির্বিশেষে সর্বোদয়ের বিচারে সকলকে সমদর্শিতার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার যে মহান আদর্শ ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের জন্মলব্ধ উত্তরাধিকার ভারত সেই পথ অনুসরণ করে প্রগতিশীল বিশ্বে তার মর্যাদার আসন চিরস্থায়ী করেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে ভারতবর্ষ অগ্রসর। কেননা সে ধর্ম সম্পর্কে কোনো বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ না করে শাশ্বত মানবঐতিহ্যের অপরিম্লান ঘোষণায় রত থেকেছে।

ধর্মের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকার নীতি বর্মাও গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু উ নু এবং তাঁর দল সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে আইন পাশ করিয়ে নিলেন যে বর্মা রাষ্ট্রহিসেবে ধর্মনিরপেক্ষ না থেকে বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে গ্রহণ করবে। অর্থাৎ তার সেকুলার চরিত্রের বিশেষত্ব বিনষ্ট হলো। সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছায় এ ঘটনা ঘটলেও পরিণাম হলো অশুভ এবং শান, কারেন প্রভৃতি পার্বত্য জাতির তরফ থেকে স্বাতন্ত্র্যের দাবী ঘোষিত হলো। রাষ্ট্রবিপ্লবের এই অশুভ মুহূর্তে সামরিক বাহিনীর প্রধান ক্ষমতা দখল করে নির্বাচিত শাসনতান্ত্রিক সরকার ধ্বংস করলেন। বৌদ্ধ রাষ্ট্র লোপ তো হলোই, উপরন্তু গণতান্ত্রিক বিধিবিধান নির্বাসিত হলো। ধর্মীয় মৌলবাদ গণতন্ত্র ধ্বংস করার সহায়ক সর্তরূপে উপস্থিত হলো। রাষ্ট্র যদি ধর্মনিরপেক্ষ হয় তবে গণতন্ত্রের মর্যাদা বাড়ে; ভিত দৃঢ় হয়। পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সর্বজনের

ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যদি কোনো রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ না হয়, একটি বিশেষ ধর্মের পোষকতা করে তবে অন্য ধর্মাবলম্বীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয় এবং তার অনিবার্য পরিণতিরূপে একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। যারা অপরের সমানাধিকার মানে না তারা আত্মকর্তৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার এই যে, ভারত ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে গণতন্ত্রকে দৃঢ় করেছে। অনেকেই অবশ্য ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি এবং তাঁরা ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র রূপে দেখতে চান। আর সেই হিন্দু রাষ্ট্র যদি ফ্যাশিষ্ট শাসিত হয়, তাহলেও তাঁদের আপত্তি নেই। ইতিহাস যদি তাঁদের সেই বাসনা পূরণ করে তবে ভারতবর্ষের দশা হবে পাকিস্তান বা বর্মার মতো। ভারতের সুচিরবাহিত ঐতিহ্য সুচিরলালিত সংস্কৃতি বিনষ্ট হবে। ভারতের বিস্মৃত হবে প্রিয়দর্শী অশোকের সমদর্শিতার নীতিকে. সর্বধর্ম ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মানবতার যে চূড়ান্ত ও সর্বোন্নত পরিচয় ভারত তা থেকে ভ্রষ্ট হবে। অদূর ভবিষ্যতে এখানেও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের পরিবর্তে সামরিক একনায়কতন্ত্রের পদধ্বনি শোনা যাবে।

/লেখক অন্নদাশঙ্কর যে কত দূরদর্শী, ইতিহাস ও সমাজসচেতন ছিলেন আলোচ্য প্রবন্ধে তার পরিচয় প্রকাশিত। ১৯৬২ তে প্রবন্ধটি লিখিত হলেও শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে তার আবেদন নিঃশেষিত হয় নি। সমাজসচেতন দায়বদ্ধ লেখকরূপে অন্নদাশঙ্কর ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি থেকে আমাদের সাবধান করতে চেয়ে ধর্মীয় মৌলবাদের অমোঘ অভিশাপ থেকে আমাদের বাঁচাতে চেয়েছেন। আর এই সতর্কবাণী উচ্চারণের জন্যই তিনি একালের অন্যতম স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।/

● বহু ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রের মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনার পর প্রাবন্ধিক ভারতের ভাষা সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। ভাষাসম্পর্কিত আলোচনাকে দুটি অংশে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমাংশে লেখক হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তির অবতারণা করেছেন। দ্বিতীয়াংশে ইংরেজি ভাষাকে সহচর ভাষারূপে অনির্দিষ্টকাল বহাল রাখার পক্ষে যুক্তির অবতারণা করেছেন।

বহু ভাষাভাষী রাষ্ট্রের মূলনীতি কী হওয়া উচিত তা এখনও বিতর্কিত। বহু ভাষাভাষী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ভাষা কী হবে, সহচর ভাষারূপে কোনগুলি বিরাজিত থাকবে—এ সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে এখনও পর্যন্ত উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নি। বহুধর্মের দেশ ভারতবর্ষ ধর্মের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার আদর্শ গ্রহণ করলেও ভাষার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা যথাযথ নয়। যে দেশে বহু ভাষা সে দেশের মূলনীতি কী হওয়া উচিত তার উদাহরণ বেলজিয়াম ও সুইট্‌জারল্যাণ্ড। ১৮৩০-এ বেলজিয়াম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হলে সেখানকার রাষ্ট্রভাষা হয় ফরাসী। কিছুকাল পরে ফ্লেমিশ ভাষা-ভাষীরা ফরাসীর সমান মর্যাদা লাভের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করে এবং ১৮৯৮-তে ফরাসী ও ফ্লেমিশ উভয় ভাষাকেই বেলজিয়ামের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করা হয়। সুইট্‌জারল্যাণ্ডেও ১৮৭৪-এর শাসনতন্ত্রে জার্মান, ফরাসী ও ইটালিয়ান ভাষাকে

তাদের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া জেলাওয়ারী ভাষায় কাজকর্ম চালানো হয় এবং সর্বত্র ইংরেজির প্রচলনও আছে। বেলজিয়াম ও সুইটজারল্যাণ্ড একাধিক ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও প্রায় সমস্ত ভাষাকে সমমর্যাদা দান করেছে; কিন্তু ভারতবর্ষ হিন্দী ভাষার একচ্ছত্র অধিকারের দ্বারা যেন ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করতে চাইছে। ভারতের শাসনতন্ত্রের ৩৪৩ ধারায় দেবনাগরী হিন্দীকে ভারতের সরকারী ভাষা বলা হয়েছে। তাছাড়া শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পনেরো বছর পর্যন্ত ইংরেজি ভাষা পূর্বের মত সরকারী কার্যে ব্যবহৃত হবে—এমনও বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে নানা ব্যবস্থার মাধ্যমে হিন্দী সম্প্রসারণের প্রবণতার ফলে হিন্দীর বিরুদ্ধে অহিন্দীভাষীরা তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৩ সালের সরকারী ভাষা আইনে বলা হয় যে, ১৯৬৫ সালের পরবর্তী অধ্যায়েও ইংরেজি হিন্দীর সঙ্গে কেন্দ্রের সরকারী ভাষারূপে ব্যবহৃত হবে; ইংরেজিকে সহযোগী সরকারী ভাষার মর্যাদা প্রদান করা হয়।

ভারতের রাষ্ট্রভাষা কী হবে সে সম্পর্কে মতদ্বৈধতা আছে। অনেকে মনে করেন যে, একটি দেশের রাষ্ট্রধর্ম একটি না হলেও রাষ্ট্রভাষা অন্তত একটিই হওয়া উচিত। কেননা, পরাধীনতার কালে একটি ভাষার বন্ধনে আবদ্ধ ভারত এক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত ছিল। সুতরাং একাধিক ভাষা যদি রাষ্ট্রভাষা হয় তাহলে ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্নতা প্রবণতা দেখা দেবে। লেখক কিন্তু এই মতবাদকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করেন না এবং তাঁর মতে, কোনো একটি বিশেষ ভাষার আধিপত্য সকলের উপর চাপিয়ে না দিয়ে সমস্ত আঞ্চলিক ভাষাকে সমমর্যাদা দান করা উচিত। একটি ভাষা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতবাদের জোরে সকলের উপর চাপিয়ে দিলে তা এক ধরনের অগণতান্ত্রিক প্রবণতার প্রতি ইঙ্গিত দান করে। একটি দেশের রাষ্ট্র ভাষা একটিই হওয়া উচিত—এ চিন্তা একভাষা দেশের বেলায় যতখানি প্রযোজ্য, বহুভাষী দেশের সম্পর্কে ততখানি প্রযোজ্য নয়। হিন্দী ভারতের বহুল প্রচলিত ভাষা বলেই তাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে এই যুক্তি অনুবাদ অনেকে ভারতের ন্যায় বহুভাষী দেশে একটি ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে চাইছেন। আসলে পাঁচজনের মুখে মুখে হিন্দী রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়েছে। কেননা, ভারতীয় সংবিধানে কোনো ভাষাতেই রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষা রূপে আখ্যাত করা হয় নি। হিন্দীকে বলা হয়েছে সরকারী ভাষা। কেউ কেউ এমনও মনে করেছেন যে, ইংরেজি ছিল শাসক সম্প্রদায়ের ভাষা, তা বিদেশি; সুতরাং ইংরেজের বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ভাষাও বিতাড়িত হওয়া উচিত এবং তার পরিবর্তে হিন্দী ভাষাকে ভারতের একমাত্র ঐক্যসূত্ররূপে গ্রহণ করা উচিত। হিন্দীর সহজবোধ্যতাও রাষ্ট্রভাষারূপে তার দাবীর অন্যতম কারণ রূপে পরিগণিত হওয়া উচিত।

প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর তাঁর 'যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা' প্রবন্ধে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে ব্যবহারের বিপক্ষে স্বীয় মতামত প্রদানের কালে বেশ কয়েকটি

প্রণিধানযোগ্য বক্তব্যের অবতারণা করেছেন। সর্বজনবোধ্যতার জন্য হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করতে চাইলেও হিন্দীর পিছনে সকলের সম্মতি নেই। ভাষাগত ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত চূড়ান্ত নয়। হিন্দীকে যদি জোর করে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তবে ভারতে ভাষার ব্যাপারে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক সৃষ্টি হবে। তামিল, কাশ্মীরী বা নাগারা হিন্দীকে মেনে নেবে না। সমস্যাটা কিন্তু হিন্দী বনাম বাংলা বা তামিল ভাষার দ্বন্দ্ব নয়; সমস্যাটা হলো, হিন্দী বনাম অহিন্দী ভাষাভাষীদের দ্বন্দ্ব। হিন্দী ভারতের একচ্ছত্র ভাষা হবে, কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র ভাষা হবে—এটা গ্রহণীয় নয়। কেননা, যাদের মাতৃভাষা হিন্দী নয় তারা হিন্দীভাষীদের থেকে নানা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়বে। হিন্দী ইংরেজির উত্তরাধিকারী-রূপে সারা ভারতের একচ্ছত্র ভাষার অধিকার দাবী করতে পারে না। সমস্ত আঞ্চলিক ভাষাকে যদি রাষ্ট্রভাষা করা সম্ভব নাও হয়, তবে এমন একটি ভাষাকে হিন্দী ভাষার সমবন্ধনীভুক্ত করতে হবে যাতে সকলের ন্যায়বোধ চরিতার্থ হয়। স্বদেশী ভাষা বলেই হিন্দী গ্রহণীয় এমন ধারণা ঠিক নয়। হিন্দীতে শিক্ষণীয় বিষয়ও অনেক কম আছে। অন্যান্য সমস্ত দিক উপেক্ষা করেও বলা যায় যে, হিন্দীর ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদসুলভ মনোভাব অহিন্দীভাষীদের কাছে একটি বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ শ্রেণীর আধিপত্য বলে মনে হয়েছে।

ইংরেজ আমলে যাকে 'vernacular' বলা হতো এখন তাই হয়েছে 'regional' বা আঞ্চলিক ভাষা। এই আঞ্চলিক বিশেষণটি যথার্থ নয়; কেননা এক অর্থে সব ভাষাই আঞ্চলিক (ইংরেজি এবং অংশত ফরাসি ভাষা ব্যতীত)। ইতালিয়ান, নরওয়েজিয়ান, জাপানি ইত্যাদি ভাষাকেও কেউ আঞ্চলিক ভাষা বলে না। ভারতের কোনো একটি ভাষা যদি আঞ্চলিক হয়, তাহলে সব ভাষাই আঞ্চলিক ভাষা। অথচ দেখা যাচ্ছে, একটি আঞ্চলিক ভাষাকে অর্থাৎ হিন্দীকে গুরুত্ব দিয়ে অন্যান্য ভাষাগুলির অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রের উদাহরণ দিয়ে ভারতবাসীকে 'নেশনে' পরিণত করার জন্য সাধারণ ভাষারূপে হিন্দীর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তা ঐক্যের পরিবর্তে অনৈক্য ও বিভেদের পথকেই প্রশস্ত করবে। কেননা, ভারত জাতিগত ও স্থানগত বৈচিত্র্যকে অস্বীকার না করে, সমীকরণের পরিবর্তে বৈচিত্র্যের ছন্দকে মেনে নিয়েছে। চারিদিকে আত্মচেতনা অত্যন্ত তীব্র বলে প্রত্যেক ভাষার মর্যাদা স্বীকার করে নিতে হবে। প্রসঙ্গত আমরা বুদ্ধদেব বসুর 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের অন্তর্গত 'ভাষা ও রাষ্ট্র' প্রবন্ধটি স্মরণ করতে পারি—'এই বৈচিত্র্যের অর্থ বিরোধ নয়, বিচ্ছেদ নয়; এই বৈচিত্র্যই ভারতের ঐতিহ্য ও ভবিতব্য, তার চিন্ময় সম্পদ। বিভিন্ন পক্ষের বৈশিষ্ট্য লোপ করে দিয়ে মিতালি গড়ে ওঠে না; চারিত্রিক ঐশ্বর্য বিকশিত হলেই সত্যিকার মিলন সম্ভব হয়। * * * বিহারি, আসামি, উড়িয়া, মলয়ালি যে কোনো জাতির বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হলে তাতে ভারতেরই অঙ্গহানি হবে। আজ ভারতের প্রত্যেক ভাষা পূর্ণ স্বাধীনতা চায়, চায় আত্মবিকাশের চরম

অধিকার, নিজেকে ফলিয়ে তুলতে চায় বৃহত্তম কর্মজীবনে। সেই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে ব্যাহত করে রাজ্যের সীমানা কমিয়ে বা বাড়িয়ে দিতে চাইলে মানুষের মর্মস্থলে আঘাত করা হয়।'

● **স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষার স্থান সম্পর্কে লেখকের মতামত**

আলোচ্য প্রবন্ধের দ্বিতীয় বিতর্ক। তিনি ইংরেজি ভাষাকে হিন্দীর সহাবস্থানে বিশ্বাসী এবং হিন্দীর সহচর রূপে ইংরেজি ভাষাকে রাখার পক্ষে। তাঁর মতে, ইংরেজি ভাষা ভারতের সকল প্রান্তে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ইংরেজি ভাষা থেকে আমরা যে অজস্র শব্দকে বাংলা ভাষায় গ্রহণ করেছি। [যেমন—আর্মি, নেভী, পুলিশ, স্কুল, কলেজ, ল্যাবরেটরী, ব্যাঙ্ক, সিনেমা, রেডিও, টিভি ইত্যাদি] তাই নয়; ইংরেজের সাংবিধানিক আদর্শ, সংসদীয় গণতন্ত্র, আইন ইত্যাদি অনেক আদর্শকেও গ্রহণ করেছি। পরাধীনতার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার সম্পর্ক থাকলেও স্বাধীন ভারতে ইংরেজি শিখতে তেমন কোনো আপত্তি নেই। সেইজন্য লেখক মনে করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যম রূপে ইংরেজির থাকা উচিত। একমাত্র ইংরেজি ভাষা প্রতিযোগিতার মাধ্যম থাকলেই যোগ্যতম প্রার্থী বাছাইয়ের সম্ভাবনা থাকবে। মুঘল সাম্রাজ্যের পর ইউরোপীয়রা না এলে ভারতে বহু সংখ্যক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতো, এবং অনেক স্বদেশী ভাষাই রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি পেতো। হিন্দীর সার্বভৌমত্ব সমস্ত হিন্দু এবং উর্দুর সার্বভৌমত্ব সমস্ত মুসলমান মেনে নিতো না। কোনো ভাষাকে অপরের উপর চাপিয়ে দিলে তা মেনে নেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। উর্দুকে জোর করে রাষ্ট্রভাষা রূপে চাপানোর ফলে পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত যে ভেঙে গেলো তা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। হিন্দীভাষার ক্রমপ্রসারণবাদ অনেকের কাছে গ্রহণীয় বলে মনে হয় নি, যুদ্ধটা হিন্দী ভাষার বিরুদ্ধে নয়; যুদ্ধটা হলো 'হিন্দী ভাষার একচেটিয়া অধিকারবাদের বিরুদ্ধে; আর সেইজন্যই ইংরেজিকে সহচর ভাষা রূপে অনির্দিষ্টকাল বজায় রাখাই উচিত। ইংরেজি বিদেশি বলেই যদি, পরিত্যাজ্য হয় তবে বিদেশির পরিবর্তে 'আন্তর্জাতিক' বিশেষণটি ব্যবহার করা যেতে পারে। ভারত যদি 'কমনওয়েলথ' নামক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তাহলে 'আন্তর্জাতিক' ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে তার দোষ কোথায়? একটিমাত্র ভাষায় অর্থাৎ হিন্দীতে ভাববিনিময় হবে—এমন ধারণা ভুল। স্বয়ং গান্ধীজী নানা অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে ভাববিনিময়ের জন্য নানা ভাষা শিক্ষা করতেন। ইংরেজি ভাষাসাহিত্যের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি আমাদের হস্তগত হবে, ইংরেজি ভাষা আদর্শ মান ঠিক করতে আমাদের সাহায্য করবে। মনে রাখতে হবে, ইংরেজের যুগ গেলেও, ইংরেজির যুগ যায় নি। ফলে ইংরেজি হিন্দীর সহচর ভাষা রূপে এখনও বেশ কিছুকাল রাখা উচিত বলে লেখক মনে করেন।

আলোচ্য বক্তব্যের সারসত্য আবর্তিত হয়েছে স্বাধীন ভারতে ইংরেজি ভাষার স্থানকে কেন্দ্র করে। জাতীয় জীবনের শিক্ষা-সাংস্কৃতিক-সামাজিক ও রাজনৈতিক

জীবনে ইংরেজি ভাষার সর্বাতিশায়ী প্রভাবকে মেনে নিলেও একথাও ঐতিহাসিক সত্য যে. ইংরেজি শিক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনে বিপুল ব্যর্থতা বহন করে এনেছে। দেশে সার্বজনীন শিক্ষার প্রবাহকে রুদ্ধ করেছে ; মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে জাতির সংহতি শক্তিকে বিনষ্ট করেছে। ইংরেজি শিক্ষার কুফলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মহাত্মা গান্ধী উচ্চারণ করেছিলেন—'Among the many evils of forcign rule this ilighting impositon of a foreign language upon the youth of the country will be counted by history as one of the greatest. It has estranged them from the masses.' তবুও একথা সত্য যে, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই বাঙালী তথা ভারতবাসী নবজাগ্রত ইউরোপের চিৎপ্রকর্ষের সম্মুখীন হয়েছিল এবং দেশবাসীর আচার বিচারের সংস্কারের অচলায়তনকে বিধ্বস্ত করে যুরোপের জঙ্গমশক্তিই ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছিল। সুতরাং স্বাধীনতার পর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হলেও ইংরেজি ভাষার স্থান সম্পর্কে বিতর্ক আজও শেষ হয় নি। অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ইংরেজি গ্রহণীয় না বর্জনীয় সে সম্পর্কে মতামত প্রদান করতে হবে। তবে এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রয়াত মৌলানা আবুল কালাম আজাদের অভিমত প্রণিধানযোগ্য—'ইংরেজি ভাষা এতকাল ধরিয়া আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ও সরকারী কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে উহা আর সেই স্থানটি দখল করিতে পারে না। ভারতীয় কোনো একটি ভাষাকেই ধীরে ধীরে তাহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কিন্তু সর্বক্ষেত্র হইতেই রাতারাতি যদি ইংরেজীকে নির্বাসিত করা হয় তাহা হইলে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে অবশ্যই বিপর্যয় দেখা দিবে।'

● প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা' প্রবন্ধে ভারত রাষ্ট্রের ধর্মীয় সংকট অপেক্ষা ভাষাসংকটের উপরেই গুরুত্বপ্রদান করেছেন। কেননা, প্রবন্ধটির অত্যন্ত সীমিত অংশে ধর্মসংকটের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। একথা অবশ্য ঠিক যে, বর্তমানে ধর্মকে কেন্দ্র করেই ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা ক্রমবর্ধিত। সমগ্র প্রবন্ধে প্রতিফলিত ভাষাসংকট সম্পর্কিত সমস্যা আলোচনা করে একটি সমন্বয়-বাদী সিদ্ধান্তে আসাই বর্তমান অনুচ্ছেদের লক্ষ্য।

যে কোনো জাতির জীবনে তার ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাতীয় জীবনের সুষ্ঠু ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের সঙ্গে ভাষার প্রশ্নটি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। জাতির মর্মমূলে জড়িত এই ভাষা ভারতরাষ্ট্রে এক স্থায়ী সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ভারতীয় মহাজাতির ঐক্যসংহতি আজ নানা কারণে বিঘ্নিত। আর্যসংস্কৃতির দিনে সংস্কৃত ভাষা সর্বভারতীয় ভাষার গৌরব অর্জন করেছিল। মুসলমান আমলে ফার্সী ভাষা রাজ-ভাষারূপে প্রাধান্য পেলেও তা সকলের মুখের ভাষা ছিল না। সুতরাং সাধারণ মানুষ উক্ত রাজভাষাকে স্থানীয় হিন্দী ভাষার সঙ্গে মিশিয়ে এক নতুন ভাষা গড়ে তুললো

আরবী হরফে ; হিন্দী ব্যাকরণের গঠনে আরবী-ফার্সী শব্দের গরিষ্ঠতা নিয়ে এই নতুন ভাষা উর্দু নাম নিয়ে আজো বহুজনের ভাষা। ইংরেজ তার জ্ঞানবিদ্যার অতুল সম্পদ নিয়ে এলো ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে -আর সেই ভাষা বিক্ষিপ্ত ভারতকে ঐক্যের বাঁধনে বেঁধেছে—এমন মনে করা যেতে পারে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের শাসনতন্ত্রে একটি জাতীয় ভাষার প্রয়োজন অনুভূত হলো এবং নীতিগতভাবে হিন্দীকেই সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি জানানো হলো। হিন্দী ভাষার সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সর্বজনবোধ্যতা, সর্বভারতীয় যোগাযোগ ইত্যাদির জন্য হিন্দীকে সরকারী ভাষা করলেও এর স্বরূপটি কী? সাধারণত যাকে আমরা হিন্দী বলে জানি তা অনেকগুলি ভাষার একটি সমন্বিত রূপ। উর্দু, হিন্দুস্থানি, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, গুজরাটী মৈথিলী, মগহী ইত্যাদি নানাপ্রকার ভাষা এর মধ্যে স্বতন্ত্র মহিমা নিয়ে বিরাজিত। তাছাড়া উত্তরভারতে 'বাজারিয়া হিন্দী' ও খড়ীবোলী হিন্দী' নামে একধরনের হিন্দী প্রচলিত আছে।

১৯৫৫ সালে ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত সরকারী ভাষা কমিশন ১৯৫৬ সালে তাদের সুপারিশ রাষ্ট্রপতির কাছে দাখিল করেন, যদিও সে সুপারিশ সর্ববাদীসম্মত হয় নি। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মাদ্রাজ রাজ্যসভার সদস্য ডঃ সুব্বারায়ণ কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে পৃথকভাবে নিজেদের মতামত জ্ঞাপন করেন। মূল রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছিল, ১৯৬৫ সালের ২৫ জানুয়ারির পর থেকে পার্লামেন্টে ইংরেজি ভাষার পরিবর্তে কেবল হিন্দী ব্যবহৃত হোক। ডঃ চট্টোপাধ্যায় ও সুব্বারায়ণ তাঁদের স্বতন্ত্র প্রতিবেদন হিন্দী ভাষাকে অহিন্দীভাষীদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। যে পদ্ধতিতে হিন্দী প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা গণতন্ত্রের বিরোধী এবং একে ভাষার সাম্রাজ্যবাদী নীতি বলা চলে। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে, হিন্দী ও ভারতের একটি আঞ্চলিক ভাষা, এবং এর ঐতিহ্যগত, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক গৌরবমর্যাদা খুব বেশি কিছু নয়। হিন্দীর চেয়ে নানাভাবে পরিপুষ্ট ও উন্নত ভাষা ভারতে বিরাজিত। সুতরাং হিন্দীকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা বলা অনুচিত। সুতরাং জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে হিন্দী চালু করলে গোটা রাষ্ট্রে ভীষণ বিপর্যয় দেখা দেবে এবং ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে হিন্দীভাষীগণ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীতে পরিণত হবে। সমৃদ্ধতর আঞ্চলিক ভাষাগুলি উপেক্ষিত হবে। ক্ষমতার জোরে হিন্দী ভাষা চালু করার প্রয়াসের বিরুদ্ধে স্বয়ং চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীও বলেছিলেন—হিন্দী ভাষার সুষ্ঠু বিবর্তন ও স্বাভাবিক ভাবে গ্রাহ্যতার পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ইংরেজি ভাষাই শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারী স্থানে বহাল থাকুক। ভাষা সম্পর্কিত নানা সমস্যার ফলে কেউ কেউ মনে করেছেন, হিন্দী ইংরেজীর সমকক্ষ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত ইংরেজিকে ভারতের সরকারী ভাষা করা হোক। কেউ কেউ প্রশাসনিক ও শিক্ষা ব্যাপারে ইংরেজি ভাষাকে চিরস্থায়ী করে রাখার পক্ষপাতী। অবশ্য কোনো স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একটি বিদেশী ভাষাকে

চিরকাল রাষ্ট্রভাষারূপে বজায় রাখা জাতীয় অবমাননার নামান্তর। কেউ কেউ সরকারী ভাষা ব্যাপারে একাধিক ভারতীয় ভাষা ব্যবহারের কথা ভেবেছেন। বর্তমান পৃথিবীর অনেক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে যদি দ্বিভাষিক-ত্রিভাষিক ব্যবস্থা চালু থাকতে পারে তাহলে ভারতে সেই ব্যবস্থা চালু করতে আপত্তি কোথায় ? কেউ মনে করেছেন, ভারতবর্ষকে কয়েকটি ভাষা অঞ্চলে ভাগ করে নেওয়া হোক এবং সেই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা উন্নত ভাষাটিকে প্রতিনিধিস্থানীয় ভাষা বলে স্বীকার করে নেওয়া হোক। নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাদেশিকতা বর্জন করতে হবে এবং ভাষাগত বিদ্বেষভাব পোষণ করা চলবে না। কেউ কেউ সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণের পক্ষে; কিন্তু সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণমুখিতা, দীর্ঘকালীন অব্যবহার্যতা, সীমিত ব্যবহার এর রাষ্ট্রভাষারূপে প্রচলনের অন্তরায়। ভারতরাষ্ট্রের ভাষাসমস্যা একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। অদূর ভবিষ্যতে ভারতরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের মাতৃভাষা এবং ইংরেজি ও হিন্দীর স্থান কীরূপ হবে তা গভীরভাবে চিন্তার বিষয়। কোনো ভাষাগত বিদ্বেষ বা অন্ধমোহ নয়; জাতীয় জীবনের বৃহত্তম কল্যাণই সকলের কাম্য। হিন্দী ভাষার অত্যুৎসাহী সম্প্রসারণবাদী নীতি বর্জনীয়; আঞ্চলিক ভাষার যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করতে হবে; প্রত্যেক ভাষাকে বিকশিত হবার সুযোগ দিতে হবে,—তাহলেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আসবে। ভাষার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিহারের মধ্যে ভারতরাষ্ট্রের কল্যাণ নিহিত—এই চিন্তায় উদ্বোধিত হয়ে ভারতের ভাষানীতি নির্ধারিত হোক্।

সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্ব : বিনয় ঘোষ ॥

[বিনয় ঘোষের 'সংস্কৃতিব সামাজিক দূরত্ব' প্রবন্ধটি লেখকের 'বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ব' (১৯৭৯) গ্রন্থের তৃতীয় প্রবন্ধ। গ্রন্থটিতে বাংলার লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধগুলি পৃথকভাবে বিভিন্ন সময়ে লিখিত হলেও সমাজবিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলি আলোচিত। 'সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্ব' প্রবন্ধটিতেও সমাজবিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণ অবলম্বিত হয়েছে।]

● সেই সুদূর অতীতকাল থেকে মানুষ নিজেকে তৈরী করার জন্য জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের চেষ্টা করে চলেছে। তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি স্বরূপ বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ জীবনে তার বিপুল পরিবর্তন এসেছে। মানুষ সুসংবদ্ধ জীবনাচরণ ব্যতীত অতিরিক্ত কোনো জিনিষের প্রতি মনোনিবেশ করতে চেয়েছে। বাহ্যসভ্যতার ভিতরের প্রাণ প্রকাশিত হয়েছে। এই ভিতরের প্রাণই হলো সংস্কৃতি। কিন্তু কিভাবে এই সংস্কৃতির জন্ম, বিবর্তন তার কোনো পরিচ্ছন্ন রূপ আজ পর্যন্ত অনেকের জানা নেই। সমাজ ও সংস্কৃতির সম্পর্ক, কালে কালে তার পরিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কিত আলোচনা নেই বললেই হয়। বিনয় ঘোষই সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি যিনি সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত ধারাবাহিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁর আগে এমন ধারাবাহিক পরিচ্ছন্ন সমাজ সংস্কৃতি, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি কেন্দ্রিক আলোচনায় অন্য কেউ সম্ভবত প্রবৃত্ত হন নি ; যদিও বিচ্ছিন্ন আলোচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বিনয় ঘোষের লেখার যে দৃষ্টিভঙ্গি এখানে প্রতিফলিত তা হলো সামাজিক-ঐতিহাসিক বোধ। তিনি ক্ষেত্র অনুসন্ধান করেই ক্ষান্ত হতেন না, বিষয়ের ঐতিহাসিক দিকটিও আলোচনা করতেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যে বৈজ্ঞানিক সমাজমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন বিনয় ঘোষের তা ছিল। ফলে তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধের ন্যায় সমালোচ্য প্রবন্ধটিও যুক্তিসমৃদ্ধ। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক থেকে তাঁর গবেষণা বাংলা লোকসংস্কৃতিমূলক আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছে।

সমালোচ্য প্রবন্ধটির নাম 'সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্ব' হলেও লেখক শুধুমাত্র উক্ত আলোচনাতে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তিনি সংস্কৃতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সাধারণ আলোচনা করেছেন। আঞ্চলিক সংস্কৃতি ধারার ইতিহাস বিশ্লেষণ কালে তিনি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে বাংলার সংস্কৃতির প্রান্তীয়তা আলোচনা করেছেন। দরবারী সংস্কৃতি ও গ্রামীণ সংস্কৃতির আলোচনাতে তাঁর যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পাঠককে একটি সাধারণ সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায়। সামাজিক দূরত্ব সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কেন সৃষ্টি হয়, বাংলার সমাজে সংস্কৃতির 'ভার্টিকাল' প্রসারের অন্তরায়

কী ইত্যাদি সম্পর্কেও লেখক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলন, মিশ্রণ, সংস্কৃতির অনিবার্য সংকট ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করে বিনয় ঘোষ একটি নিরপেক্ষ, সমাজমনস্ক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিচয় প্রদান করেছেন, তাই প্রবন্ধটিকে স্মরণীয় করে তুলেছে।

● বস্তুসংক্ষেপ

একটা বিশিষ্ট রীতি অনুযায়ী বিশেষ সামাজিক পরিবেশে সংস্কৃতির রূপায়ণ হয়। বিভিন্ন যুগের সাংস্কৃতিক উপাদানেব উদ্ভব, প্রসার, মিলন, সংঘাত ইত্যাদির মধ্যে সংস্কৃতির সামগ্রিক রহস্য বোমাঞ্চ লুকায়িত থাকে। বঙ্গ সংস্কৃতির সেই রূপায়ণ জানার আগে সংস্কৃতির কয়েকটি সাধাবণ বৈশিষ্ট্য জানা দরকার। [১]

কোনো জাতি, দেশ বা অঞ্চলের সংস্কৃতি ধারার ইতিহাসে যে তিনটি বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয় তাকে সাংস্কৃতিক উপাদানের স্থিতি, সৃষ্টি ও লয় বলে অভিহিত করা হয়। অতীত কালের সংস্কৃতির যে উপাদান মানুষ দীর্ঘকাল ধরে বয়ে নিয়ে চলে, সজ্ঞানেও ত্যাগ করা চলে না তাকে সংস্কৃতির স্থিতি বলে। অনেক রীতিনীতি অভ্যাস, আচার-ব্যবহার, উৎসব-অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করলে অতীতের সন্ধান পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের আধিপত্য সত্বেও এই জাতীয় প্রবণতা বিদুরিত হয় না। [২]

যুগে যুগে সমাজের প্রয়োজনে নব নব সাংস্কৃতিক উপাদান উদ্ভাবিত হয় এবং তার ঘাত-প্রতিঘাতে পুরাতনেব ভাঙন ও নতুনের গঠনকার্য শুরু হয়। এর ফলে এক-জাতীয় 'কালচার কমপ্লেক্সে'র সৃষ্টি হয়। এর ফলে পূর্বের উপাদানের বিন্যাস পরিবর্তিত হয়। সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্ভাবন ও বিলোপের ফলে মৌল সংস্কৃতির তাৎপর্যান্তর ঘটে। নতুন সামাজিক পরিবেশে পুরাতন সংস্কৃতির অনেক উপাদানের লয় পাওয়াকে লয়শীলতা বলে। [৩]

সাংস্কৃতিক স্থিতির একটা বড় দিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে রূপায়িত হয়। সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সদগুণের প্রবাহকে আশ্রয় করে ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। তাছাড়া, সংস্কৃতির কালিক ও ভৌগোলিক প্রবাহও আছে। ভৌগোলিক গতিকে ডিফিউশন বলে; কালিক গতিগুলো ভার্টিকাল, আর ডিফিউশনের গতি হরাইজেন্টাল। সংস্কৃতির গভীরতা হলো ট্র্যাডিশন, আর প্রসারতা হলো ডিফিউশন। একটির গতি দেশান্তরের দিকে; অন্যটির গতি কালান্তরের দিকে। [৪]

উদ্ভাবন ও প্রসারণ—সংস্কৃতির দুটি প্রাণধর্ম। সামাজিক বা ঐতিহাসিক অবস্থান্তরের জন্য নতুন সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্ভব হয়। যদি তার গতিপথ কোনো কারণে রুদ্ধ হয়, নব্য সংস্কৃতির প্রসারে বাধা হয় তবে যে অনুন্নত সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তাকে প্রান্তীয় সংস্কৃতি বলে। [৫]

সংস্কৃতির প্রসারণের গতি হল কেন্দ্র থেকে প্রান্তের দিকে। অবশ্য এর কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। অনেক সময় দেখা যায়, কেন্দ্রের কাছাকাছি অঞ্চল অনেক

অনগ্রসর। কোনো উন্নত সংস্কৃতি কেন্দ্রের সীমানার মধ্যে যদি অনুন্নত অঞ্চল থাকে তবে তাকে 'ইন্টার্নালি মার্জিন্যাল' বলে। [৬]

প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, বাংলার সংস্কৃতিতে এই প্রান্তীয়তার সমস্যা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। দু'জাতীয় প্রান্তীয়তা এখানে বর্তমান। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এর কারণ। এই দু'জাতীয় বিচ্ছিন্নতা দূর করতে না পারলে জাতীয় উন্নয়নের কর্মসূচী ব্যাহত হতে বাধ্য। [৭]

প্রায় প্রত্যেক দেশে কালে যুগসংস্কৃতির বড় বড় কেন্দ্র থাকে। মধ্যযুগে রাজা বাদশাদের দরবার ও শাসন কেন্দ্রই ছিল প্রধান সংস্কৃতির কেন্দ্র। একে দরবারী সংস্কৃতি বলা হতো। দরবারী সংস্কৃতি ব্যতীত ছিল গ্রামীণ সংস্কৃতি বা ফোক্ কালচার। এই দুটি ধারা স্বতন্ত্রভাবে প্রবাহিত হতো। যোগাযোগের অভাবে দরবারী সংস্কৃতি তেমনভাবে গ্রামীণ সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করতো না। বাংলার গ্রামসমাজ আত্মকেন্দ্রিক ও স্বনির্ভর ছিল এই বিচ্ছিন্নতার জন্য। আধুনিক যুগে যানবাহনাদির ও যোগাযোগের ফলে রাজধানীর সংস্কৃতি অতিদূর গ্রামাঞ্চলেও বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অনেক গ্রামে, বিশেষত হাওড়া জেলাতে এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে প্রাচীন-কালের ভাবনা মানসিকতা প্রচলিত। বর্তমান গতির যুগে এই প্রান্তীয় মানসিকতা ত্যাগ না করলে, গ্রাম শহর নগরের মত সচল না হলে জাতির সংস্কৃতি সর্বসাধারণের সম্পদ রূপে পরিগণিত হবে না। নাগরিক সংস্কৃতির মন্দ অংশ গ্রামীণ সংস্কৃতিকে আরও বিষময় করে তুলবে। [৮]

বাইরের প্রান্তীয়তা যেমন গড়ে ওঠে ভৌগোলিক দূরত্বের জন্য তেমনি আভ্যন্তর প্রান্তীয়তা গড়ে ওঠে সামাজিক দূরত্বের জন্য। অবশ্য একথা ঠিক যে, ভৌগোলিক দূরত্ব কমার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক দূরত্ব কমতে থাকে। নতুন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে ওঠার কালে তা জনতার উপরস্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। তাই বিভিন্ন যুগে মুষ্টিমেয় লোক সমসাময়িক সংস্কৃতির ধারক হয়।

প্রত্যেক যুগে যে মুষ্টিমেয় লোক গতিশীল সংস্কৃতির ধারক হন তাঁদেরই সমসাময়িক বলা হয়। নবসংস্কৃতির বেশির ভাগ উদ্যম তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে তা সঞ্চারিত হয় না। ফলে সাধারণ লোকের সঙ্গে সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের তুলনায় সেই সামাজিক দূরত্ব আধুনিক যুগে আরও বেশি। সংস্কৃতির অগ্রগতি হলেও, শ্রেণীগত-জাতিগতবর্ণ দূরত্বের অবসান হয় নি বলে বৃহত্তম জনগোষ্ঠী সংস্কৃতির সাধারণ সম্পদ থেকে বঞ্চিত। [১০]

ব্রিটিশ আমলে বাংলার সমাজে আধুনিক যুগসংস্কৃতির প্রসার না হওয়ায় বাংলার গ্রাম সমাজের সঙ্গে নাগরিক সমাজের ব্যবধান বেড়েছে। বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতি যুগসংস্কৃতির প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমশ বিলুপ্ত হয়েছে। আধুনিক লোকমানসের বিকাশের যে স্বাভাবিক গতি বিকেন্দ্রকরণের দিকে বাংলার গ্রাম-সমাজে তার কোনো

চিহ্নই নেই। [১১]

আধুনিক সংস্কৃতির স্বাভাবিক গতি হলো সামাজিক দূরত্ব লোপের দিকে। বঙ্গ সংস্কৃতিতে তার কোনো লক্ষণই নেই। এখানে সংস্কৃতি প্রসারের সবচেয়ে বড় বাধা হলো জাতিবর্ণধর্ম সম্প্রদায়গত সামাজিক বৈষম্য। পাশ্চাত্ত্য দেশে এই বিষমতা বিরল। সংস্কৃতির প্রসারের পথে এই বাধাগুলি যতদিন না বিদূরিত হচ্ছে ততদিন পযন্ত মানসিক বিকেন্দ্রকরণ সম্ভব নয়। [১২]

পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন জাতিবর্ণ উপজাতির সামাজিক স্তরবিন্যাস অত্যন্ত দৃঢ় ও গভীর বলে গ্রামীণ সংস্কৃতির নিটোল চেহারা প্রায়ই চোখে পড়ে না। নানা পরস্পর বিরোধী ধারা-উপধারা মিশ্রিত থাকার ফলে, ধ্যান ধারণা, রীতি-নীতিতে পার্থক্য থাকার ফলে গ্রামীণ সংস্কৃতিব নির্দিষ্ট রূপ দুর্লক্ষ্য থাকে। গ্রামীণ সংস্কৃতি কতকগুলি বাঁধাধরা বৈশিষ্ট্য নয়; সেখানে আছে নানা জাতিবর্ণগত স্তরবিন্যাস, বিভিন্ন জনস্তরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্ব। শহরে বসতিবিন্যাসে শ্রেণীপ্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, আর গ্রামাঞ্চলে জাতিবর্ণসম্প্রদায় গত সামাজিক দূরত্ব। গ্রামীণ উৎসব বা পালপার্বণে তা লক্ষিত না হলেও, বিভিন্ন জনস্তরের মানসিক দূরত্ব যে এখনও ঘোচেনি তা গ্রাম-জীবন পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায়। এই সামাজিক দূবত্ব মানসিক ব্যবধানেবই প্রকার ভেদ। [১৩]

বাংলার গ্রামসমাজের ও গ্রামীণ সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা জটিল সমস্যা হলো কুল, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়গত অজস্র ভেদাভেদ। স্থানিক দূবত্ব দূর হলেও এই মানসিক দূরত্ব যদি দূর না হয় তবে গ্রামাঞ্চলে উন্নত জাতিবর্ণের পাশাপাশি অনুন্নত উপজাতি বর্ণের অস্তিত্ব থাকবে। [১৪]

যানবাহনের উন্নতি ও বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সংস্কৃতির প্রসারলাভ ঘটতে পারে। সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র থেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও দূরপ্রান্তে সাংস্কৃতিক উপাদানের ক্রমবিস্তার ঘটতে পারে। এর সঙ্গে সঙ্গে জনগোষ্ঠীর মানসিক ব্যবধানও দূর করতে হবে। যানবাহন ও যোগাযোগের সঙ্গে যদি আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোক শহর নগরের মূলকেন্দ্র থেকে সুদূর প্রান্তবর্তী গ্রামে উপনীত হয়, তবে সুসমঞ্জসে সামগ্রিক রূপায়ণ ঘটা সম্ভব। [১৫]

বঙ্গসংস্কৃতির রূপায়ণে মানসিক ও সামাজিক দূরত্বের সমস্যার সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন আলোচ্য। তাহলো বঙ্গসংস্কৃতিতে দুই বা ততোধিক সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাত ও মিলনমিশ্রণ। সংস্কৃতির সান্নিধ্যজাত মিলনমিশ্রণ ও সমন্বয়কে 'অ্যাকালচারেশন' বলে। [১৬]

'অ্যাকালচারেশন'-এর সঙ্গে 'ডিফিউশনের' সাদৃশ্য আছে। কেননা, উভয়ক্ষেত্রেই দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শ আবশ্যক। অবশ্য 'অ্যাকালচারেশন'-এর জন্য দরকার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য যার ফলে সংস্কৃতির মিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটতে পারে। দুটি ভিন্ন-জনগোষ্ঠীর দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে, ভিন্নদেশাগত লোকের স্থায়ী বসতি স্থাপনের

ফলে বা বিজয়ী জাতির সংস্কৃতি বিজেতাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার ফলে সাংস্কৃতিক মিলন-মিশ্রণ ঘটতে পারে। [১৭]

বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে তথা ভারত সংস্কৃতির ইতিহাসেও এই মিশ্রণ কম নয়। নানা জাতি-উপজাতি-ধর্ম-সংস্কৃতির মিলন, সান্নিধ্য, সংঘাত মিশ্রণ বর্ণ সংস্কৃতিতে ঘটেছে। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির মিশ্রণের সঙ্গে লোকায়ত স্তরে ইসলামিক সংস্কৃতির প্রভাবও সংলক্ষ্য। বাংলা দেশের সাঁওতাল, মুণ্ডা, বাউরী প্রভৃতি উপজাতির সংস্কৃতিতে উন্নত হিন্দুর সংস্কৃতির বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। শাক্ত-বৈষ্ণব-শৈব-তান্ত্রিকরাও পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বেশি হওয়ার জন্য এখানকার মানুষ সংকীর্ণচিত্ত বা অনুদার নয়। বাংলার সংস্কৃতি এই কারণে সজীব। তবে এই সজীবতা, প্রাণময়তাকে চিরস্থায়ী করতে হলে বাংলার লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে প্রয়াস চালাতে হবে, সামাজিক মেলামেশা আরও ব্যাপক করতে হবে। ভৌগোলিক ও সামাজিক দূরত্বের বাধাগুলিকে দূর করতে হবে। যদি এই পদ্ধতিগুলি অবিলম্বে গ্রহণ করা না যায় তাহলে বাঙালী সংস্কৃতি যে অনিবার্য সংকটের সম্মুখীন হবে তা থেকে সহজে উদ্ধার পাওয়া যাবে না। [১৮]

● প্রবন্ধ বিশ্লেষণ

বিনয় ঘোষের 'সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্ব' প্রবন্ধটি সমাজ-সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্ব কেন গড়ে ওঠে সেই বিষয়ে আলোচনা করতে চেয়েছেন। সংস্কৃতির উদ্ভব, মিলন, মিশ্রণ, সংঘাত, প্রাধান্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ সামাজিক প্রতিক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকে প্রাবন্ধিক সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধের এই তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রটি গড়ে উঠেছে বঙ্গ-সংস্কৃতির রূপায়ণগত দিককে কেন্দ্র করে। প্রাবন্ধিক মূলত যে সমস্ত বিষয়কে এই প্রবন্ধের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেগুলি হল—১. সংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ২. বাংলার সংস্কৃতির প্রান্তীয়তার কারণ—প্রসঙ্গত দরবারী সংস্কৃতি ও গ্রামীণ সংস্কৃতি। ৩ সামাজিক দূরত্ব বা 'ডিসট্যান্সিয়েশন'। ৪. সংস্কৃতির সান্নিধ্যজাত মিলনমিশ্রণ ও সমন্বয় বা 'অ্যাকালচারেশন'। প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ বিচ্ছিন্নভাবে নয়, পরস্পরের সঙ্গে যুক্তভাবেই আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধকার সমগ্র বিষয়টি বাংলা তথা ভারত সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেছেন।

● প্রবন্ধের সূচনাতে লেখক সংস্কৃতির কোনো সংজ্ঞা দান না করে সংস্কৃতির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে চেয়েছেন। যেহেতু প্রবন্ধটির বক্তব্য সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সেইজন্য লেখক সম্ভবত সংস্কৃতি বা culture-এর কোনো সংজ্ঞা দিতে চান নি। তবে সংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনার পূর্বে সংস্কৃতির কয়েকটি সংজ্ঞা দেখে নেওয়া যায়। সংস্কৃতি হলো—১. "All that which is non-biological and socially transmitted in a society,

including artistic, social, ideological and religious patterns of behaviour, and the techniques for mastering the environment. The term culture is often used to indicate a social grouping that is smaller than Civilization but larger than an industry."

—E. B. Tylor

২. "Customs, informations, skills, domestic and public life in peace and war, religion, science and art……it is manifest in the transmission of past experience to the new generation."—Gustav Klemm.

৩. "……Capabilities and habits acquired by man as a member of society." —Tylor.

এই যে সংস্কৃতি বিশেষ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে তার রূপায়ণ হয় এবং এই রূপায়ণের বিশিষ্ট রীতি আছে। বিভিন্ন যুগে যে সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্ভব ঘটে, প্রাধান্যও প্রসার হয়, মিলন-মিশ্রণ ঘটে ও সংঘাত ঘটে এবং তার গ্রহণ-বর্জন-বিলোপ ইত্যাদির মধ্যে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সমস্ত তত্ত্ব সংগুপ্ত থাকে। বঙ্গসংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক রূপায়ণের রীতি ও তার সামাজিক প্রতিক্রিয়ার বিষয় লক্ষ্য করা যায়। সেই বিষয় আলোচনার পূর্বে লেখক সংস্কৃতির তিনটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। বিজ্ঞানীরা এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকে সাংস্কৃতিক উপাদানের স্থিতি, সৃষ্টি ও লয় রূপে অভিহিত করেছেন। ইংরেজীতে এদের যথাক্রমে Persistence, Invention এবং Loss বলে।

অতীতকালে সংস্কৃতির যে সমস্ত উপাদান মানুষ সহজে পরিত্যাগ করতে পারে না, সজ্ঞানে পরিত্যাগ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়, বংশপরম্পরায় দীর্ঘকাল সংস্কৃতির যে উপাদানগুলিকে মানুষ বহন করে চলে তাকে সাংস্কৃতিক উপাদানের স্থিতি বলে। আমাদের অনেক অভ্যাস, আচার-ব্যবহারের, রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা, পূজা-পার্বণ উৎসব-অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে অতীত সংস্কৃতির অনেক উপাদান লক্ষ্য করা যায়। মানুষের মনোলোকে এই সমস্ত উপাদান যেন অতীতকালের বহু মৃত ধ্যানধারণার মত বিরাজিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, অতীতকালের 'গুরুবাদ' অন্যতম উপাদানরূপে ভিন্নভাবে সাধু-পীরদের আস্তানা থেকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র, তাবিচ-কবচের প্রভাব বিজ্ঞানের আধিপত্যের যুগে কমলেও একেবারে লোপ পায় নি। অতীত সংস্কৃতির এই যে দীর্ঘস্থায়ী বৈশিষ্ট্য একেই স্থিতি বা persistence বলা হয়।

সংস্কৃতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো উদ্ভাবন, আবিষ্কার বা সৃষ্টি। ইংরেজীতে একে বলা হয় Invention· E. B. Tylor তাঁর 'Dictionary of Anthropology'-তে Invention বলতে বুঝিয়েছেন—"A change or adjustment in objects or

particles so that a new kind emerges. Every change in human activity which is deliberate and designed is an invention. The change according to Dixon, is always new and basically better. Invention may apply to non material as well as to material culture.' বিভিন্ন যুগে সমাজের তাগিদে নতুন নতুন সাংস্কৃতিক উপাদান উদ্ভাবিত হয় এবং তার ঘাত-প্রতিঘাতে ধীরে ধীরে পুরাতন ধারা ভেঙে যায়, লুপ্ত হয় ও নতুন একটি ধারা গড়ে ওঠে। নতুন ও পুরাতন উপাদান সংমিশ্রণের মাধ্যমে, মিলন-মিশ্রণের মাধ্যমে নতুন 'কালচার-কমপ্লেক্সের' সৃষ্টি হয়। নতুন ও পুরাতনের মিলন ও মিশ্রণে জাত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হলে পূর্বের উপাদানের বিন্যাস বা সন্নিবেশ পরিবর্তিত হয় এবং তার ফলে উপাদান অন্তর্গত ও সন্নিবেশগত তাৎপর্যও পরিবর্তিত হয়। এই কারণে সংস্কৃতিকে Configuration বলে। Configuration কথার অর্থ বাহ্যিক গঠন। কিন্তু এখানে শব্দটি একেবারেই বাচ্যার্থে ব্যবহৃত হয় নি। একে বিশেষার্থে বলা চলে তাৎপর্যান্তর। সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্ভাবন ও বিলোপের ফলে সমষ্টি থেকে উপাদানগত যোগ বিয়োগই ঘটে না, মৌল সংস্কৃতির তাৎপর্যান্তর ঘটে। Configuration-কে 'basic intregative theme of a culture' বলা হয়েছে। E. B. Tylor তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে বলেছেন—'The cultural configuration might be viewed as the palarizing element that gave a distinctive flavour to each element of a culture.' নতুন সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশে পুরাতন সংস্কৃতির অনেক অনাবশ্যক উপাদান বিলুপ্ত হয়। একে সংস্কৃতির লয়শীলতা বলে। সংস্কৃতির পরিবর্তনশীলতার পরিচায়ক হল সৃষ্টিশীলতা ও লয়শীলতা। এই দুটি বৈশিষ্ট্য স্থিতিশীলতা অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী। কেননা সৃষ্টিশীলতায় নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনার ইঙ্গিত থাকে; আর লয়শীলতায় পুরাতনকে পরিত্যাগ করে নতুন পথে অগ্রসরণের বিপুল সম্ভাবনা থাকে। সেই কারণে প্রাবন্ধিক মন্তব্য করেছেন যে, সৃষ্টিশীলতা ও লয়শীলতায় মিলিত শক্তি স্থিতিশীলতা অপেক্ষা অনেক বেশি।

Tradition বা ঐতিহ্যকে সাংস্কৃতিক স্থিতিরই অন্যতম দিক বলা যেতে পারে। [Tradition—transmission of knowledge or belief from one generation to another ; tale, belief, custom etc. so transmitted.]। ঐতিহ্য অর্থাৎ পরম্পরাগত উপদেশ, ধারণা, জীবনাচরণ সম্পর্কিত তত্ত্ব ও তথ্যাবলী। সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণের প্রবাহকে আশ্রয় করেই ঐতিহ্যের প্রত্যয় গড়ে ওঠে। 'সংস্কৃতির কালিক প্রবাহকেই ঐতিহ্য বলা যেতে পারে। 'সংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রবাহকে ডিফিউসন' বলে। 'ডিফিউসন' অর্থাৎ প্রসারণের গতি। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গতি কালিক বলে তা হয় ভার্টিকাল অর্থাৎ ঊর্ধ্বাধ; 'ডিফিউসনে'র গতি ভৌগোলিক বলে তা হয় 'হরাইজন্টাল' অর্থাৎ অনুভূমিক। সাংস্কৃতির

গভীরতাকে ঐতিহ্য বা ট্র্যাডিশন এবং প্রসারতাকে 'ডিফিউসন' বলে। প্রথমটির অর্থাৎ ঐতিহ্যের গতি কালের দিকে; আর প্রসারণের গতি দেশ থেকে দেশান্তরে। বাংলাদেশের উত্তর থেকে দক্ষিণে অথবা পূর্ব থেকে পশ্চিমে সংস্কৃতির যে প্রবাহ তাকে প্রসারণ বলা চলে। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কায়স্থ বৈশ্য বণিক গোপ মাহিষ্য অথবা হিন্দু মুসলমান ইত্যাদি নানা জাতিবর্ণগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সমস্ত কৌলিক বা সাম্প্রদায়িক সংস্কারের অস্তিত্ব দেখা যায় সেগুলিকে ঐতিহ্যগত সংস্কার বলা চলে। বিজ্ঞানীরা 'সাংস্কৃতিক প্রসারণ'কে 'inter societal transmission of culture in space' বলেন; এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে 'intra-societal transmission of culture in time' বলেছেন।

উদ্ভাবনকে যদি সংস্কৃতির ধর্ম বলা যায় তবে প্রসারণকে সংস্কৃতির প্রাণশক্তিরূপে নির্দেশ করতে হয়। সামাজিক বা ঐতিহাসিক অবস্থান্তরের জন্য নতুন সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্ভব হয়; অথচ তার প্রসারের গতিপথ রুদ্ধ হয়ে যায় নানা কারণে, তা সমান গতিতে সমাজের সর্বস্তরে প্রবাহিত হতে পারে না--এর ফলে নানা সংকটের আবির্ভাব হয়। যদি ভৌগোলিক কারণে, সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থানের জন্য নব্য সংস্কৃতির প্রসারে বাধা সৃষ্টি হয় তাহলে অনেক সময় কেন্দ্র বহির্ভূত অঞ্চলের সংস্কৃতি উন্নত হতে পারে না, অনুন্নত থাকে। সংস্কৃতির দিক থেকে অনুন্নত সেইসব অঞ্চলকে—অঞ্চলের সংস্কৃতিকে 'মার্জিন্যাল কালচার' বা 'প্রান্তীয় সংস্কৃতি' রূপে অভিহিত করা হয়।

সংস্কৃতির প্রসারণের গতি হলো কেন্দ্র থেকে প্রান্তের দিকে। অবশ্য এই গতির কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কেন্দ্র থেকে বাইরের প্রান্তের ব্যবধান যত বেশি হবে, সংস্কৃতির প্রসারে তত বিলম্ব হবে—এমন ভাবার কারণ নেই; অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। অনেক সময় এমনও দেখা গেছে যে, কেন্দ্রের নিকটবর্তী অঞ্চল দূরের তুলনায় অনেক অনুন্নত, অনগ্রসর সংস্কৃতির দিক থেকে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, কলকাতা শহরের সীমানা থেকে পাঁচ সাত দশ মাইলের মধ্যে অবস্থিত হাওড়া, চব্বিশ পরগণা জেলার বহু গ্রামাঞ্চল বর্ধমান, মুর্শিদাবাদের তুলনায় অনেক অনুন্নত ও অনগ্রসর। আবার, কলকাতা শহরেও এমন অনেক পাড়া বা অঞ্চল আছে যেখানে শহরের উন্নত শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে নি। কোনো উন্নত সংস্কৃতি কেন্দ্রের সীমানার মধ্যে যদি এই জাতীয় কোনো অনগ্রসর বা অনুন্নত অঞ্চল থাকে তবে সেই অঞ্চলকে 'ইণ্টার্নালি মার্জিন্যাল' বলা হয়। সংস্কৃতির এই যে আন্তর্প্রান্তিকতা তা ঘটতে পারে যানবাহন বা চলাচল ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য: অথবা সমাজের শ্রেণীগত পার্থক্য বা জাতি বর্ণগত দূরত্বের জন্য। প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে দেখা যায়, বাংলার সংস্কৃতির এই 'মার্জিন্যালিটি' বা 'প্রান্তিকতা'র সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

● সংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনার পর প্রবন্ধকার বাংলার সংস্কৃতির প্রান্তীয়তার সমস্যার কারণ অনুসন্ধানে ও স্বরূপ সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন এবং প্রসঙ্গতঃ

দরবারী সংস্কৃতি ও গ্রামীণ সংস্কৃতির আলোচনাও করেছেন। পূর্ববর্তী আলোচনার প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলার সংস্কৃতির অন্যতম সমস্যা হলো প্রান্তীয়তার সমস্যা —যা অত্যন্ত বিপুল ও ব্যাপক সমস্যা। বাংলার সংস্কৃতিতে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ - দু'জাতায় প্রান্তীয়তাই বিরাজিত। বাইরের প্রান্তীয়তার কারণ অনুসন্ধান করলে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্বকে দায়ী করতে হয়। আর ভিতরের প্রান্তীয়তার কারণের জন্য সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও ব্যবধান দায়ী। এই দুই প্রকারের বিচ্ছিন্নতা ও ব্যবধান দূর করতে পারলে বাংলার সংস্কৃতির প্রান্তীয়তার সমস্যা বিদূরিত হবে। বাংলা দেশের বিভিন্ন সমাজিক স্তরে ও ভৌগোলিক অঞ্চলে সাংস্কৃতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারলে জাতীয় উন্নয়নের পথ সুগম হবে; নচেৎ ব্যর্থতা অনিবার্য। স্বীয় সমাজের প্রতি, সমাজস্থ মানুষের প্রতি দরদ-ভালোবাসা নেই, দেশের ভাবকে দূরে সরিয়ে রেখে সমাজমানসের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাশীল না হওয়ার একটি দীর্ঘবিচ্ছেদরেখা আমাদের জাতীয় জীবনে বিচ্ছেদ ও ব্যবধানের বীজ নিত্য বপন করে চলেছে। জাতি-বর্ণ সম্প্রদায়গত ভেদ প্রথা সমাজকে ক্রমশ দুর্বল করে তুলছে; শিক্ষিত অশিক্ষিতর ভেদ ক্রমবর্ধমান—ফলে সংস্কৃতির প্রান্তীয়তার সমস্যা বিকটরূপ ধারণ করছে। আলোচ্য প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রাবন্ধিক স্বাভাবিকভাবে দরবারী সংস্কৃতি ও গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রত্যেক যুগেই যুগসংস্কৃতির কতকগুলি বড় বড় কেন্দ্র থাকে। মধ্যযুগে রাজা বাদশাহদের দরবার ও শাসনকেন্দ্রই ছিল প্রধান সংস্কৃতিকেন্দ্র। বাংলাদেশের গৌড়, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি ছিল দরবারকেন্দ্রিক সংস্কৃতিকেন্দ্র। দরবারী সংস্কৃতি হলো, 'কোর্ট কালচার', এই দরবারী সংস্কৃতি বা 'কোর্ট কালচার' ব্যতীত গ্রামীণ, সংস্কৃতি বা 'ফোক কালচারের' ধারাও প্রবাহিত ছিল। অবশ্য রাজদরবার বা রাজধানী থেকে বাইরের গ্রামাঞ্চলে যে সংস্কৃতির আলোক বিচ্ছুরিত হতো না এমন নয়। তবে সেই বিচ্ছুরণকে দৈবঘটনা বলা যেতে পারে। প্রাগাধুনিক সাহিত্য-সংস্কৃতি ছিল মূলত রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতাকেন্দ্রিক। ডঃ শুসকিং তাঁর 'The Sociology of Literary taste' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেছেন—'...the history of literature is in large part the history of the beneficence of individual princes and aristocrats...In the middle Ages much of the principal art kept entirely within the ganera outlook of the bread giver...The world is, seen through the spectacles of the tewdal lord.' অনাধুনিক যুগে যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কোনো সুযোগসুবিধা ছিল না। যোগাযোগের অভাবের ফলে বাংলার গ্রামীণ সমাজ ছিল বিচ্ছিন্ন; ফলে গ্রামসমাজে আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বনির্ভরতা গড়ে উঠছিল। শুধু প্রাগাধুনিক কালেই নয়, আধুনিক কালেও রাজধানীই যুগ সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র; তবে মধ্যযুগের সঙ্গে বর্তমান কালের পার্থক্য এই যে, যানবাহন ও যোগাযোগের সুবিধার জন্য অনেক সাংস্কৃতিক উপকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত উপকেন্দ্র থেকে সংস্কৃতির ধারা

গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত হলেও একথা সত্য যে, এখনও পশ্চিমবঙ্গে প্রান্তীয় অঞ্চলের সংখ্যা অনেক বেশি। কলকাতা শহর থেকে পঁচিশ ত্রিশ পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে এখনও সপ্তাহে দু-একদিন চিঠি বিলি করা হয় এবং ডুলিতে করে লোক যাতায়াত করে। হাওড়া জেলাতে এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে কথা বললে মনে হয় সভ্যতার আদিকালের প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সঙ্গে যেন কথা বলা হচ্ছে। এসমস্ত তথ্য কিন্তু অনুমাননির্ভর নয়, প্রবন্ধকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। কলকাতাকে কেন্দ্র করে ত্রিশ-চল্লিশ মাইলের মধ্যে বৃত্ত অংকিত হলে, কয়েকটি বড় বড সংস্কৃতি কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রের মধ্যে এই জাতীয় কয়েকটি প্রান্তীয় অঞ্চল দেখা যাবে। এগুলি অবশ্য ভৌগোলিক প্রান্তীয়তার নিদর্শন। বাংলার সমাজজীবনের অচল অনড়তা বিজ্ঞানের গতির যুগে এখনও বিদূরিত হয় নি। বাংলার গ্রামজীবনের অচলায়তন ভাঙতে না পারলে, গ্রাম শহর নগরের মতো সচল ও গতিশীল না হলে জাতির সংস্কৃতির সর্বসাধারণের সম্পদ না হয়ে মুষ্টিমেয় লোকের ভোগবিলাসের সামগ্রী হয়ে থাকবে। তার থেকেও মারাত্মক ক্ষতিকর হবে নগর-শহরের পাঁচমিশালি সংস্কৃতির তলানি প্রান্তীয় অঞ্চলের জীবন-যাত্রাকে বিষাক্ত করে তুলবে। নাগরিক সংস্কৃতিব সদর্থক সুস্থ দিকের পরিবর্তে মন্দটুকু গ্রামীণ সংস্কৃতিকে আবও বিষক্রিয়ায় জর্জরিত করে তুলবে।

উন্নত সংস্কৃতিকেন্দ্রের এই ভৌগোলিক প্রান্তীয়তা ব্যতীত বঙ্গসংস্কৃতির আভ্যন্তর প্রান্তীয়তাও সুপ্রচুরভাবে বিবাজিত। বহির্বঙ্গ দিকটির তুলনায় এই আভ্যন্তর ব্যবধান আরও বেশি বিপজ্জনক। বাইরের প্রান্তীয়তার কারণ ভৌগোলিক দূরত্ব, যানবাহনাদির যোগাযোগেব অসুবিধা, আর আভ্যন্তর প্রান্তীয়তার মূল কারণ সামাজিক দূরত্ব। ভৌগোলিক দূরত্ব, যোগাযোগ ও যানবাহনাদির অসুবিধা দূর করা সম্ভব হলেও সামাজিক দূবত্ব সহজে দূব করা যায় না। অবশ্য একথা ঠিক যে ভৌগোলিক দূরত্ব ঘুচে গেলে সংস্কৃতির আনুভূমিক প্রসারণের গতি বাড়লে বিভিন্ন স্তরের সামাজিক দূরত্ব কমতে থাকে। সমাজবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন, সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসারণ তার ঊর্ধ্বাধ গভীরতাকে প্রভাবিত করলেও তা হয় অত্যন্ত মন্থর গতিতে; কারণ সমাজের শ্রেণীবিন্যাস ও জাতি বর্ণবিন্যাসের উপর সংস্কৃতির ঊর্ধ্বাধ প্রসারণ প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। নতুন সংস্কৃতির ঐহিক ও মানসিক উপাদান কেন্দ্র থেকে প্রান্তের দিকে প্রসারিত হওয়ার কালে তা সেই যুগের সচেতন সমাজমানসের উপরিতলে সীমাবদ্ধ থাকে, সমাজের খুব গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে সমাজের মুষ্টিমেয় মানুষই সমসাময়িক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়।

● প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী Lewis Mumford এই কারণেই বলেছেন যে, প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক দেশে মুষ্টিমেয় একশ্রেণীর লোক তাঁদের কালের গতিশীল সংস্কৃতির প্রতিনিধি হন। যুগের বিচারে তাঁদেরই কেবল সমসাময়িক বলা হয়।

নবযুগে আবির্ভূত সংস্কৃতির ক্রিয়াকাণ্ডের তাঁরাই অংশীদার হন, বৃহত্তম জনসমাজের মধ্যেই নতুন সংস্কৃতির উদ্যম বিপুলভাবে সঞ্চারিত হওয়ার পরিবর্তে এক শতাংশ সঞ্চারিত হয় কিনা সন্দেহ থেকে যায়। যুগে যুগে যুগ সংস্কৃতির মুষ্টিমেয় প্রবর্তক-শ্রেণীর সঙ্গে বৃহত্তর লোকসমাজের ব্যবধান দুরতিক্রম্য হয়েছে। প্রাচীন যুগ অপেক্ষা মধ্যযুগে, মধ্যযুগ অপেক্ষা আধুনিকযুগে সেই ব্যবধান ক্রমবর্ধিত হয়েছে। সংস্কৃতির বাহনগুলির বিকাশ আগের যুগে তো হয়ইনি, আধুনিক জনশিক্ষার যুগেও তার বিকাশ নানাকারণে ব্যাহত হয়েছে। সে তুলনায় সংস্কৃতির অগ্রগতি বেগবান হয়েছে, সেই তুলনায় সমাজের শ্রেণীগত, জাতিবর্ণগত দূরত্বের অবসান হয় নি। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে প্রযুক্তির দাক্ষিণ্যে সংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রসাব বাডলেও সামাজিক গভীরতা বাডে নি। ফলে ভাবগত ও বাস্তব উপাদানগত সংস্কৃতির সম্পদ থেকে বৃহত্তর জনসমাজ ক্রমেই বঞ্চিত হয়েছে।

● বাংলাদেশের সমাজে আধুনিক যুগসংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রসারও ব্রিটিশ আমলে ব্যাহত হয়েছে। কেননা, ব্রিটিশ শাসকসম্প্রদায় তাদের স্বার্থের কারণেই সংস্কৃতির প্রযুক্তিগত উপাদানের বিকাশেব পবে নানাজাতীয় অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। প্রগতিপন্থী আধুনিকীকরণ সুরু হলেও তা মূলত সীমাবদ্ধ ছিল শহরাঞ্চলের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে। ফলে নাগরিক সমাজের সঙ্গে গ্রামসমাজের ব্যবধান নিত্যবর্ধিত হয়েছে, বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতিব আঞ্চলিক বৃত্তগুলি যুগসংস্কৃতিব চলমানতা থেকে, গতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পডেছে এবং ক্রমশ বিকৃত ও অনুন্নত হতে হতে ক্রমশ বিলুপ্তির পথে এগিয়ে গেছে। ট্রাইবাল যুগ থেকে মধ্যযুগেব সংস্কৃতির অনেক উপাদান গ্রামীণ সংস্কৃতির মধ্যে স্বচ্ছন্দ ভাবে মিশ্রিত হয়ে গেছে। আধুনিক যুগের সংস্কৃতির অন্যতম বিশিষ্টতা হলো মনের বিকেন্দ্রণ। আধুনিক লোকমানসের বিকাশের স্বাভাবিকগত বিকেন্দ্রণের দিকে হলেও তার কোনো চিহ্ন বাংলার গ্রামসমাজে লক্ষ্য করা যায় না। বাংলার সংস্কৃতির প্রান্তীয়তার এটাও অন্যতম কারণ।

● সমালোচ্য প্রবন্ধটিব কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্ব যাকে সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'Distantia tion' বলা হয়েছে। মানসিক বিকেন্দ্রণের মতো আধুনিক সংস্কৃতির স্বাভাবিক গতি হলো সামাজিক দূরত্বলোপের দিকে—যাকে সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা যায় social de-distantiation বাংলার সমাজের গতি কিন্তু সামাজিক দূরত্বলোপের দিকে নয়। বাংলা তথা ভারতীয় সমাজে সংস্কৃতির যে উর্ধ্বাধ প্রসার ঘটে না তার সর্বাপেক্ষা বড় কারণ জাতি-বর্ণ-ধর্ম-সম্প্রদায়গত সামাজিক বৈষম্য। এই বৈষম্যই সামাজিক দূরত্ব সৃষ্টির সবচেয়ে বড কারণ। বাংলাদেশে প্রচলিত এই জাতিবর্ণধর্মসম্প্রদায়গত সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধুনিক যুগের শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব। এর ফলে এক কঠিন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সংস্কৃতির উর্ধ্বাধ প্রসারের পথে এই বাধা দূরীভূত না হলে, সংস্কৃতির আনুভূমিক প্রসার কোনো সার্থকতা লাভ করতে পারবে না। বঙ্গ সংস্কৃতির রূপায়ণে জাতি বর্ণসম্প্রদায়ের এই সামাজিক দূরত্ব সর্বাপেক্ষা

শক্তিশালী ঐতিহাসিক কারণরূপে ক্রিয়াশীল। সংস্কৃতি বিচারের দিক থেকে এই সমাজস্তরের দূরত্ব যে এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে সে সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী Karl Mannheim-এর মতামত সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

Another important example of social distance is the vertical distance between hierarchical unequals···This is reflected in an enormous number of behaviour patterns developed by hierarchically stratified societies···In the sociology of culture the problem of vertical distance and distantiation is, of course, paramount. It is important to see that vertical distantiation may concern, not only the mutual relationship of two groups, but also the relationship between a person or group and inanimate objects of cultural significance.

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ সংস্কৃতির নিটোল রূপ যে সহজে চোখে পড়ে না তার অন্যতম কারণ বিভিন্ন জাতিবর্ণ উপজাতির সামাজিক স্তরবিন্যাস অত্যন্ত দৃঢ়। সেই সামাজিক স্তরবিন্যাসে অনেক পরস্পরবিরোধী ধারা-উপধারা-উপাদান মিশ্রিত আছে। জাতি-বর্ণভেদে একই উৎসবের ও একই বস্তুর সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া, আচার ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা ও রীতি-নীতির পার্থক্যও লক্ষ্যগোচর। গ্রামীণ সংস্কৃতি বলতে কতকগুলি বাঁধাধরা, যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়; গ্রামীণ সংস্কৃতির বিচার বিশ্লেষণে অগ্রসর হলে তার জটিলতায় বিস্মিত হতে হয়। এই জটিলতা ও বৈচিত্র্যের কারণরূপে লেখক গ্রামীণ সমাজের জাতিবর্ণগত স্তরবিন্যাস ও বিভিন্ন জন-স্তরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্বকে নির্দেশ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের অনেক গ্রামে বসতিবিন্যাসে বর্ণপ্রাধান্য থাকলেও, শ্রেণীপ্রাধান্য নেই। তবে শহরে বসতিবিন্যাসে শ্রেণী প্রাধান্য থাকলেও বর্ণপ্রাধান্য দুর্লক্ষ্য। গ্রামে একই বর্ণের জাতি-উপজাতি ধনী দরিদ্র একই অঞ্চলে বসবাস করে। জাতিবর্ণ ও সম্প্রদায়গত সামাজিক দূরত্ব আধুনিক শ্রেণীদূরত্বের চেয়ে অনেক বেশি দুস্তর। সামাজিক দূরত্ব দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মানসিক দূরত্ব রচিত হয়েছে। উৎসব-পার্বণের পারস্পরিক মেলামেশায় বা গ্রামজীবনের প্রীতির আবরণে এই মানসিক দূরত্ব সাময়িকভাবে আবৃত হলেও, জনস্তরের মানসিক দূরত্ব কোনক্রমেই বিদূরিত হয় না। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। বৈজ্ঞানিকভাবে এই সামাজিক দূরত্বকে মানসিক দূরত্বের ব্যবধান বা 'ডিসট্যান্টি-য়েশন' বলা যায়।' কুলজাতি বর্ণ ধর্মসম্প্রদায়গত অজস্র সংস্কারের কুয়াশা পরস্পরকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। একই অঞ্চলে দীর্ঘকাল বংশানুক্রমে থাকার ফলেও মানসিকভাবে তারা পরস্পরের কাছাকাছি নয়। বাংলা তথা ভারতের গ্রাম সমাজের ও গ্রামীণ সংস্কৃতির এ এক ভয়াবহ কঠিন সমস্যা। স্থানিক দূরত্ব দূর হলেও, এই মানসিক দূরত্ব যে সহজে দূর হবে—এমন বলা যায় না।

● সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্বের কারণগুলি বিশ্লেষণের পর প্রশ্ন জাগে, 'সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসার হলেই কি তার সামগ্রিক উন্নতি সম্ভবপর'? এই প্রশ্নের সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক ভাবে উপস্থিত হয়—সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসারের সঙ্গে ঊর্ধ্বাধ প্রসারের সম্পর্ক কি? সংস্কৃতি বিজ্ঞানের ধারণামত সাংস্কৃতিক উপাদানের ভৌগোলিক বিস্তরণ অনুভূমিক প্রসারের সঙ্গে জড়িত। যান্ত্রিক যানবাহনের উন্নতি, প্রযুক্তিগত কলাকৌশলের বিস্তার বিজ্ঞানের প্রগতি ইত্যাদির উপর ভৌগোলিক বিস্তার নির্ভরশীল। সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র থেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ও দূরপ্রান্তে সাংস্কৃতিক উপাদানের ক্রমবিস্তার হতে পারে। কিন্তু সাংস্কৃতিক উপাদানের ক্রমবিস্তার হলেও যে সমাজের ঊর্ধ্বাধ গতিশীলতা কম এবং স্তরীয় দূরত্ব খুব বেশী, সেই সমাজে সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রতিক্রিয়া নাও হতে পারে। যান্ত্রিক যানবাহনের সাহায্যে সাংস্কৃতিক উপাদানের বিস্তার ঘটালেও তা এমন ভাবে প্রভাবিত করবে না, যার ফলে দীর্ঘকালস্থায়ী সামাজিক দূরত্ব ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানসিক ব্যবধানের অবসান ঘটাতে পারে। মানসিক ব্যবধান দূরীকরণের জন্য চাই জনশিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার। যান্ত্রিক যানবাহনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার, শিক্ষাবিজ্ঞান সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের বিস্তার, জ্ঞানবিজ্ঞানালোকের প্রসার যদি শহর নগরের মূলকেন্দ্র থেকে গ্রামজীবনের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত উপনীত হয়. তাহলেই সংস্কৃতির অনুভূমিক গতির সঙ্গে ঊর্ধ্বাধ গতি বাড়বে এবং সংস্কৃতির সামগ্রিক সুষম রূপায়ণের ফলে জীবন সার্থক ও সুন্দর হবে।

● বাংলার সংস্কৃতির রূপায়ণে ভৌগোলিক প্রসার, সামাজিক ও মানসিক দূরত্ব আলোচনার পর লেখক সাংস্কৃতিক রূপায়ণের আর একটি উল্লেখ্য দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। এই দিকটি হলো সংস্কৃতির সান্নিধ্য জাত মিলনমিশ্রণ ও সমন্বয়ের দিক—যাকে বলা হয় 'Acculturation'। দুটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ধারার বাহক দুই বা ততোধিক জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য বা বনবাসের ফলে দুই বিরোধী সংস্কৃতির মিলন-মিশ্রণ বা সমন্বয় হতে পারে। Acculturation বলতে বোঝানো হয়—

(ক) 'The process by which culture is transmitted through continuous first hand contact of groups with different cultures, one often having a more highly developed civilization. The process may be unilateral or bilateral.' [Dictionary of Anthropology : E. B. Tylor]

(খ) 'We mean by acculturation the processes whereby societies of different cultures are modified through fairly close and long continued contact, but without complete blending of the two cultures.' [Cultural Sociology : Gillin and Gillin]

'অ্যাকালচারেশন' হলো একটি পদ্ধতিমাত্র যার দ্বারা সাংস্কৃতিক মিলন-মিশ্রণ ও সান্নিধ্যের ফলে সমন্বয়ধর্মিতার সৃষ্টি হয়। দুটি পরস্পরবিরোধী সংস্কৃতি দুই বা ততোধিক জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সান্নিধ্যের অত্যন্ত কাছাকাছি আসে এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে সমন্বয়ের সূচনা করে। এক অর্থে 'ডিফিউশনের' সঙ্গে 'অ্যাকালচারেশন'-এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রবাহ হলো ডিফিউসন যার গতি অনুভূমিক। অবশ্য 'ডিফিউশনের' জন্য সান্নিধ্যের বা পাশাপাশি অবস্থানের প্রয়োজনীয়তা নাও থাকতে পারে। একটা নতুন আদর্শ, সংস্কৃতির নতুন উপাদান কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে প্রসারিত হতে পারে। কিন্তু 'অ্যাকালচারেশনে'র জন্য পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য প্রয়োজন। সংস্কৃতির মিশ্রণ ও সমন্বয় তিন রকমের হতে পারে—প্রথমত, দুটি ভিন্ন জনগোষ্ঠী দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের ফলে পরস্পরের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। দ্বিতীয়ত, অন্যদেশ থেকে আগত লোকেরা স্থায়ী বসতি স্থাপন করে সাংস্কৃতিক সান্নিধ্য ঘটাতে পারে। তৃতীয়ত, বিদেশীরা দেশ জয় করে বিজেতাদের উপর তাদের সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে পারে। মূলত এই তিনভাবে সাংস্কৃতিক মিলন-মিশ্রণ হতে পারে।

বাংলার সাংস্কৃতিক রূপায়ণের ইতিহাসে এই সাংস্কৃতিক মিলন-মিশ্রণের সমন্বয়ের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। ভারত-সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কেও একই কথা প্রযুক্ত হতে পারে। এক অর্থে বাঙালি-সংস্কৃতিকে মিশ্রসংস্কৃতি বলা যেতে পারে। শুধু বাঙালি সংস্কৃতিই নয়, সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতি যে বিমিশ্র এবং সমন্বয়ধর্মী এমন চিন্তা সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সংস্কৃতি' প্রবন্ধেও ব্যক্ত হয়েছে। এখানে একই সঙ্গে মুক্তি আর অনপনেয় কর্মফল, জ্ঞান আর ভক্তি, নিষ্কাম কর্ম আর সকাম অনুষ্ঠান সমস্তই আছে। প্রাচীন ও নবীনের মিলন ও অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বয় ভারত তথা বঙ্গসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। ভাষা, ধর্ম, আচার, অনুষ্ঠান, লোকসংস্কৃতি ইত্যাদি প্রায় সর্বক্ষেত্রে এই সমন্বয়ধর্মিতা সংলক্ষ্য। বাঙালির ধর্মকর্মগত মানসজীবন অত্যন্ত জটিল এবং সেখানে নানা প্রভাব ও মিশ্রণক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। বাঙালির ধর্মকর্মের আদি ইতিহাস হলো বাংলার আদিবাসীদের পূজা, আচার-অনুষ্ঠান, ভয়, বিশ্বাস, সংস্কারের ইতিহাস। বাংলাদেশে প্রচলিত লোকধর্ম ও ধর্মপূজা মিশ্র সাংস্কৃতিক রূপের উদাহরণ। অন্-আর্য ধর্ম-কর্ম ব্যতীত তান্ত্রিকতা, সহজিয়া, বৌদ্ধ, নাথ, শৈব, শাক্ত ইত্যাদি নানা ধর্ম সংস্কৃতি বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবন গঠন করেছে। প্রাগার্য, আর্য, অন্-আর্য উপাদানের সঙ্গে ঐশ্লামিক উপাদানও মিশ্রিত হয়েছে। ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদ, সামাজিক সাম্য, উদার সর্বজনীন সুফী মতবাদ বাঙালির ধর্ম কর্ম সমাজ অধ্যাত্মজীবনে বিপুলভাবে প্রতি-ষ্ঠিত হয়েছে। ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার পরে দক্ষিণরায়ের পূজা ইসলামী ভাবনায় অনুরঞ্জিত হয়ে গাজী মিঁয়ার নামে বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। নিম্নবঙ্গে ব্যাঘ্রের অধিকারী দেবতা দক্ষিণ রায়ের ও ইসলামের গাজী মিঁয়ার মিলনের কাহিনী হিন্দু-মুসলমান

সমন্বয়ের উদাহরণ। শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারা ভারতে হিন্দু মুসলমান উভয় সংস্কৃতির সমন্বয়স্বরূপ পীরের দরগায় এবং মাজারে উভয় সম্প্রদায়েরই শিরনীসহ পূজার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। চট্টগ্রাম রোসাঙের কবিকুল শিরোমণি দৌলত কাজী ও আলাওল তাঁদের কাব্যের মাধ্যমে মুসলমানী ও হিন্দু ভাব-ভাষা, পুরাণ ঐতিহ্যের মিলন সাধনে অগ্রসর হয়েছিলেন। বাউল-মুর্শিদী মারিফতী লোকগীতিও বাঙালির সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতি চেতনার উদাহরণ।

সাংস্কৃতিক বিনিময়, মিশ্রণ, সমন্বয় ইত্যাদি যথোপযুক্ত হওয়ার ফলে জাতিবর্ণগত সামাজিক দূরত্ব সাধারণ মানুষকে অনুদারচিত্ত ও সংকীর্ণ করতে পারে নি। সামাজিক দূরত্বের জন্য বিভিন্ন জাতিবর্ণের মানসিক প্রসার রুদ্ধ হলেও 'অ্যাকালচারেশন'-এর ফলে সেই দূরত্ব অনেকখানি বিদূরিত হয়েছে। কোনো দেশের সাংস্কৃতিক প্যাটার্নের উপর যদি ঘন ঘন ভিন্ন সংস্কৃতির তরঙ্গাঘাত হয় তবে সে দেশের সংস্কৃতি সহজে জড়ত্বলাভ করতে পারে না। বাংলার সংস্কৃতি যে জাতিবর্ণধর্মসম্প্রদায়গত দূরত্ব সত্ত্বেও তার সজীবতা বজায় রাখতে পেরেছে তার অন্যতম কারণ সাংস্কৃতিক তরঙ্গাভিঘাত। অবশ্য এই সজীবতা সপ্রাণতা চিরস্থায়ী হতে পারে না, যদি সামাজিক দূরত্ব বিদূরিত না হয়। অতীতের লোকসংস্কৃতির যতই পুনরুজ্জীবন করা হোক্ না কেন, সমাজের উচ্চশ্রেণীর যতই উন্নতি ও প্রগতি হোক্ না কেন, অনিবার্য স্থবিরত্বকে দূর করার জন্য চাই সম্প্রদায়গত সামাজিক ও মানসিক ব্যবধানের দূরীকরণ। দিনে দিনে সংস্কৃতির মধ্যে এমন সব অসঙ্গতি, বিরোধিতা, বিকৃতি দেখা যাচ্ছে যা সামগ্রিক উন্নতির অন্তরায় হবে। সমাজকল্যাণের জন্য যুগসংস্কৃতির অনুভূমিক ও উর্ধ্বাধ প্রসারের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভৌগোলিক ও সামাজিক দূরত্ব দূর করার চেষ্টাও করতে হবে। বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ মানোন্নয়নের জন্য ও মুক্তির জন্য জাতিসম্প্রদায়-বর্ণধর্মগত ভেদাভেদ দূরীকরণই অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাহলেই জাতীয় জীবন এক মহতী বিনষ্টির ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাবে।

সমাজমনস্ক ও ইতিহাসের চেতনাসম্পন্ন লেখক বিনয় ঘোষ আলোচ্য প্রবন্ধে সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্বের মূল প্রশ্নগুলি যৌক্তিক নিপুণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির সমন্বয়ধর্মিতার দিক আলোচনা করেছেন। বাঙালি সংস্কৃতির উজ্জীবনের পন্থাও লেখক প্রসঙ্গক্রমে নির্দেশ করেছেন। সামাজিক দায়বদ্ধ লেখকরূপে বিনয় ঘোষ সংস্কৃতির যে পুঙ্খানুপুঙ্খ ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ করেছেন অস্বাভাবিকভাবেই প্রবন্ধটিকে মহার্ঘ্য করে তুলেছে এবং পাঠককে কালসচেতন হতে সাহায্য করেছে।

রাজা রামমোহন রায় : ভবতোষ দত্ত

[অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্তের 'রাজা রামমোহন রায়' প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় বিশ্বভারতী পত্রিকায় (কার্তিক পৌষ ১৩৭৯)। তখন প্রবন্ধটির নাম ছিল 'রাজা রামমোহন রায় এবং ভারতীয় অর্থনীতি'। পরবর্তীকালে প্রবন্ধটি 'অর্থনীতির পথে' (১৯৭৭) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং প্রবন্ধটি পরিবর্তিত নামকরণ হয় 'রাজা রামমোহন রায়'। প্রবন্ধটি ঐ একই নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'একালের প্রবন্ধ সঞ্চয়ন' (১৯৯২) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সঞ্চয়নে অন্তর্ভুক্তির কালে প্রবন্ধটির কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্জন করা হয় নি। 'রাজা রামমোহন রায়' প্রবন্ধটি ভবতোষ দত্তের 'অর্থনীতির পথে' গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ।]

● ভবতোষ দত্তের 'রাজা রামমোহন রায়' প্রবন্ধটি রামমোহন রায়ের অর্থনীতি-বিষয়ক ভাবনা-চিন্তাকে কেন্দ্র করে রচিত। ভারতে অর্থনীতি চিন্তার ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। অবশ্য প্রকৃত অর্থে সাম্প্রতিক বিশ্বে অর্থনীতি বিষয়ক চর্চাও খুব বেশী দিনের নয়; অন্তত জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত এর প্রাচীনত্ব নেই। সম্ভবত ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে আধুনিক অর্থনীতির ভিত গড়ে ওঠে এবং সম্ভবত অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-'৯০) তাঁর গ্রন্থে অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে মূলগত ঐক্য অনুসন্ধান করেন। অ্যাডাম স্মিথ কর্তৃক আলোচিত পথকেই সম্ভবত 'ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির পথ' বলা হয়। পরবর্তীকালে ম্যালথস (১৭৬৬—১৮৩৪), রিকার্ডো (১৭৭২—১৮২৩), জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬—'৭৩) প্রমুখের চর্চায় এই ক্লাসিক্যাল পথ পূর্তির রূপ পায়। ইংরেজি ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা যখন স্বীকৃত তখন রামমোহন রায় ভারতবর্ষে অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত করেন। প্রাচান ও মধ্যযুগের ভারতে অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থে মূলত রাজ্যশাসনের রীতি-পদ্ধতি, করনীতির কথা আলোচিত হতো। পরবর্তীকালে আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো, ভূমিরাজস্ব ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। সেই অর্থে রাজা রামমোহন রায়কে দেশের প্রথম আধুনিক অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ রচয়িতা বললে অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজ ক্লাসিক্যাল লেখকদের প্রামাণ্য রচনার অল্পকাল পরেই রামমোহন রায় (১৭৭২—১৮৩৩) তাঁর নিজের মতবাদ উপস্থাপিত করেন। রামমোহনের প্রতিভা বিচিত্রচারী ছিল এবং তিনি সমকালীন নানা বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কারমূলক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে লিপ্ত ছিলেন। সেইজন্য মনে হয় রামমোহন, স্মিথ, রিকার্ডো এবং মিলের অর্থনীতি সংক্রান্ত রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। রামমোহনের অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলির রচনাকাল ১৮৩১—'৩২। এই সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতায় বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার হারিয়েছে,

নতুন নতুন জিনিষ আমদানির ফলে বাণিজ্যের রূপ পরিবর্তিত হয়েছে, বাণিজ্যের প্রসারে ও বিদেশাগত দ্রব্যাদির আগমনের ফলে দেশী শিল্প মৃতপ্রায়—এমনই অবস্থায় রামমোহন রায়ের অর্থনীতি সংক্রান্ত মতামত ব্যক্ত হয়েছে। ১৮৩৩-এ কোম্পানীর সনদের নবীকরণের ব্যাপারে লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত পার্লামেণ্টারি যুক্ত কমিটির কাছে প্রদত্ত প্রতিবেদনে প্রকাশিত রামমোহনের অর্থনৈতিক চিন্তাই সমালোচ্য প্রবন্ধে ভবতোষ দত্ত অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রসঙ্গত রামমোহনের অন্যান্য প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও কাজকর্মের কথাও উল্লিখিত হয়েছে এবং রামমোহন সমকালীন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমস্যাও আলোচিত হয়েছে।

● বস্তুসংক্ষেপ

উনিশ শতকে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে বাঙালি জাতি যখন ক্রমশ আত্মবিস্মৃত হচ্ছিল, তখন রামমোহন রায় তাদের সামনে ভারতীয় চিন্তাধারার সম্পদ নতুন করে উপস্থাপিত করেন। তিনি পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে সমন্বয়ের চেষ্টাও করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি কবীর, দাদূ প্রমুখের ন্যায় 'ভারতপথিকের' ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 'ভারতপথিক' রামমোহন বহু বিষয়েই আমাদের জাতীয় জীবনে পথপ্রদর্শক ও পথিকৃৎ। [১]

রামমোহন রায় তাঁর সমকালে অনেক সামাজিক ও জাতীয় উদ্যোগমূলক ক্রিয়াকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি আত্মীয়সভা, ব্রাহ্মসমাজ, বেদান্ত কলেজের স্থাপয়িতা ; সতীদাহ নিবারণে ক্রিয়াশীল ; আবার ইংলণ্ডে থাকাকালীন ভারতবর্ষের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধের রচয়িতা। [২]

রামমোহন ভারতবর্ষের আর্থিক সমস্যার বিশ্লেষণে অবিসম্বাদিত পথিকৃৎ। তথ্যসন্ধান ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে তাঁরই পথ অনুসরণ করে অনেকেই ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন। [৩]

রামমোহনের পূর্ববর্তীকালে অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনায় কেউ রত হন নি। 'সমাচার দর্পণে' অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধ থাকলেও সেখানে সুসম্বদ্ধ তাত্ত্বিক বা বিশ্লেষণী আলোচনা ছিল না। অর্থনৈতিক সমস্যার বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনায় রামমোহনের পূর্বসূরী কেউ ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর প্রায় চার দশক পরে রামমোহনের উত্তরসূরীরা আত্মপ্রকাশ করেন। [৪]

রামমোহনের অর্থনীতি বিষয়ক রচনাগুলি ১৮৩১ থেকে ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে লিখিত। নতুন চার্টার অ্যাক্ট পাশ করাবার আগে পার্লামেণ্ট থেকে গঠিত সিলেক্ট কমিটিতে সাক্ষ্য দেবার জন্য রামমোহন রায় আমন্ত্রিত হন। সেই সময়ে রচিত রামমোহনের নিবন্ধমালা থেকে রামমোহনের অর্থনৈতিক চিন্তার স্বরূপ নির্ণীত হতে পারে। [৫]

সিলেক্ট কমিটি উত্থাপিত প্রশ্নমালার উত্তর ও রামমোহন কর্তৃক রচিত নিবন্ধগুলি

১৮৩২-এ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭-এ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক রামমোহনের ইংরেজি রচনাবলী প্রকাশিত হয়। ১৯৬৫-তে সুশোভন সরকারের সম্পাদনায় 'রামমোহন রায়, অন ইণ্ডিয়ান ইকনমি' প্রকাশিত হয়। রামমোহনের লিখিত অন্যান্য প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে অর্থনীতি সংক্রান্ত রচনাও কম নয়। [৬]

রামমোহন রায় সিলেক্ট কমিটির কাছে যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে লিখে পাঠিয়েছিলেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভারতের রাজস্ব ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, আর্থিক অবস্থা, লবণের একচেটিয়া কারবার ইত্যাদি। ১৮৩৩-এর ২০ আগস্টে নতুন চার্টার অ্যাক্ট আইনে পরিণত হয়, কিন্তু এই নতুন আইনের অনেক কিছুই রামমোহনের মনঃপূত হয় নি। সে সম্বন্ধে মতপ্রকাশের সুযোগ তিনি পাননি; কেন না তার অল্পদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। [৭]

রামমোহনের অর্থনৈতিক চিন্তার মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর সমসাময়িক কাল সম্পর্কে জানা উচিত। তাঁর কৈশোর থেকে যৌবনে উপনীত হওয়ার কালে দেশে নানারকম রাজস্ব ব্যবস্থার নানারকম পরীক্ষা চলছে। শিশুমৃত্যুর ফলে পূর্ব ভারতে বয়স্ক কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা কম। কর্ণওয়ালিস প্রজাদের দেয় খাজনার পরিমাণ বাড়ালেও খাজনা আদায় হচ্ছিল না। [৮]

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য চাষবাস বাড়লে জমিদাররা খাজনা বাড়ালেন। ১৮১২ সালে আইন করে জমিদারদের ক্ষমতা কমানো হলো, ১৮২২-এ সরকার রায়তদের খাজনা ঠিক করার সিদ্ধান্ত নিলেও, রায়তদের উপর ক্রমশ চাপ বেড়ে চলল। [৯]

রামমোহন ডিগবি নামক জনৈক কালেক্টরের অধীনে প্রায় দশ বছর কাজ করার ফলে রাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তিনি কলকাতা শহরে সমাজসংস্কারে, শিক্ষা প্রসারে, ভারতীয় দর্শনচর্চা প্রভৃতি নানাবিধ কর্মে অংশগ্রহণ করলেও, অর্থনীতি চর্চা কিভাবে করেছিলেন তার কোনো প্রমাণ নেই। [১০]

রামমোহন অ্যাডাম স্মিথ, ম্যালথস, রিকার্ডো প্রমুখের অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিনা জানা নেই। তবে তিনি করনীতি, শিল্পনীতি, মূলধন এবং উত্তর আমেরিকার উন্নতি সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলেছেন তাতে মনে হয় তিনি স্মিথ ও রিকার্ডোর তত্ত্ব সম্পর্কে পরিচিত ছিলেন। এমনকি ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যে মালথসের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। [১১]

১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর সনদ মঞ্জুর করার প্রাক্‌সর্তরূপে ইংলণ্ডে নিযুক্ত তথ্যানুসন্ধানী কমিটির পঞ্চম রিপোর্ট রামমোহন পড়েছিলেন। ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যে সমকালীন অর্থনীতিবিদ্‌দের চিন্তার প্রতিধ্বনি লক্ষ্যগোচর। ভারতে ইংরেজ ব্যবসায়ী ও শিল্পমালিকদের স্থায়ী বসবাস সম্পর্কে তাঁর ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের বক্তব্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। [১২]

রামমোহনের অর্থনৈতিক মতবাদ গঠিত হওয়ার মূলে ছিল তৎকালীন ভারতের ভূমিরাজস্ব ও কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কিত পটভূমি। এই সময় ভারতের কুটীর শিল্প অবনতির পথে, অথচ আধুনিক শিল্প আরম্ভ হয় নি। বস্ত্রশিল্পে ইংলণ্ড চমকপ্রদ উন্নতি লাভ করায় ভারতে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতবর্ষের কুটির শিল্প জাত দ্রব্যের আমদানি ইংরেজ বন্ধ করে দিয়েছিল। ভারতীয়দের মধ্যে কেউ কেউ ইংরেজদের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হলেন। এর ফলে ব্যাঙ্ক বা এজেন্সী হাউসের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো এবং বিদেশী ব্যাংকের ধরনে দেশি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলো। ১৮০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ব্যাংক অব বেঙ্গল'। পরবর্তীকালে নানা বিবর্তনের মাধ্যমে 'স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া' প্রতিষ্ঠিত হয়। [১৩]

কলকাতায় যে নবজাগ্রত শিক্ষিত সম্প্রদায় গড়ে উঠলো তারা হলো কোম্পানীর চাকুরিয়া, ব্যবসায়ী অথবা গ্রামের জমিদারিতে অনুপস্থিত শহরবাসীর মালিক। রামমোহন শেষোক্ত পর্যায়ভুক্ত। তাঁর লেখাতে আমদানি-রপ্তানি সমস্যার কথা থাকলেও সেখানে মূলত ভূমি ও কৃষির সমস্যা নিয়েই আলোচনা হয়েছে। তিনি মূলত প্রজাদের অনুকূলেও জমিদারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আলোচনা করেছেন। [১৪]

সিলেক্ট কমিটির কাছে তাঁর প্রতিবেদনে রামমোহন রায় কলকাতার সাধারণ শ্রমিক ও মিস্ত্রি জাতীয় শ্রমিকের আয় উল্লেখ করেছিলেন। সাধারণ লোকের আর্থিক অবস্থার বর্ণনায় তিনি বলেছেন যে, দরিদ্র শ্রেণী নুন আর ভাত ছাড়া অন্য কিছু খেতে পেত না, বাড়ি ছিল মাটি-খড়-নলখাগড়ার তৈরি; পরিধেয় বস্ত্র ছিল সামান্য। তবে সাধারণ লোক সবল ও নীতিপরায়ণ ছিল। [১৫]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমিকায় রামমোহন রায়তদের দুর্গতির চিত্র অংকন করেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে চাষীদের অধিকার রক্ষার কথা বললেও জমিদাররা তা মানেন নি জমিদাররা চাষীর অর্ধেক ফসল নিয়ে নিতেন, উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণে চাষী সুবিচার পেত না। [১৬]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করবার সময়ে আশা হয়েছিল যে, জমিদাররা পতিত জমিতে কৃষিকাজ করে উৎপাদন বাড়াবেন; আবাদী জমির আরও উন্নতি হবে; জমিদাররা রাজস্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন এবং কোম্পানিও সরকারের রাজস্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকবেন। কিন্তু রামমোহন দেখালেন, সমস্ত উদ্দেশ্যই সফল হয় নি এবং কৃষির সম্প্রসারণ ও উন্নতি চাষীরা করলেও তার ফলভোগ করেছেন জমিদাররা। [১৭]

রামমোহন এই সমস্যার সমাধানের জন্য যে সমস্ত সূত্র প্রদান করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম হলো জমি চাষ করে উৎপন্ন আয়ের পর্যাপ্ত অংশে চাষীর অধিকার, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এটি স্বীকৃত হয় নি। রামমোহন তীব্র ভাষায় একে আক্রমণ করেছিলেন। [১৮]

রামমোহনের অর্থনৈতিক সংস্কার প্রস্তাব তখন গৃহীত হয় নি। খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধে রামমোহনের প্রস্তাব গৃহীত হয় ১৮৫৯-এ এবং প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয় তারও

প্রায় ৩৬ বছর পরে। জমিদারের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো প্রজার সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব কেউ গ্রহণ করেননি। ধারণা এই রকম ছিল যে, রায়তকে স্থায়ী স্বত্ব দিলে আরও বহুস্তরের প্রজার সৃষ্টি হবে। পরবর্তীকালে ভূমিনীতি নির্ধারকেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে আরো অনেক ধাপের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যোগ না করে কর্ণওয়ালিসের ব্যবস্থাই তুলে দিলেন। রামমোহন তদানীন্তন ব্যবস্থার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছিলেন এবং এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। [১৯]

রামমোহন রায় প্রস্তাব করেছিলেন যে, প্রজাদের দেয় খাজনা বৃদ্ধি বন্ধ করতে হবে; জমিদারদের দেয় রাজস্বও কমানো উচিত। যে সমস্ত জায়গায় প্রজারা সরকারকে সরাসরি খাজনা দেয় তাও কমানো উচিত বলে তিনি মনে করেছিলেন। [২০]

রায়তের দেয় খাজনা না বাড়ালে এবং জমিদারের দেয় রাজস্বের পরিমাণ কমালে কোম্পানী-সরকারের আয়-ব্যয়ের ঘাটতি হতে পারে—রামমোহন একথা স্বীকার করে সরকারী আয় বাড়ানোর জন্য বিলাসদ্রব্য ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় জিনিষের উপর কর বসাবার জন্য বলেন। তাছাড়া তিনি ইংরেজ কর্মচারীর স্থলে ভারতীয় কর্মচারী নিযুক্ত করে ব্যয় কমানোর জন্য বলেন। [২১]

রামমোহন সরকারী ব্যয় কমানোর উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন যে, ইংরেজ কর্মচারীর পরিবর্তে ভারতীয় কর্মচারী নিয়োগ করলে খরচ কম হবে। কেননা, ভারতীয়দের তুলনায় ইংরেজ কর্মচারীদের অনেক বেশি মাইনে দিতে হতো। [২২]

রামমোহন তাঁর অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন যে, কালেক্টররা যে কাজের জন্য বেতন পেতেন তার প্রায় সবটাই অধস্তন ভারতীয় কর্মচারীদের দিয়ে করানো হতো। ভারতীয় কর্মচারীদের মাসিক তিনশো-চারশো টাকা বেতনে উক্ত কর্মে নিযুক্ত করলে খরচ কম হবে বলে রামমোহন মনে করতেন। অবশ্য সামরিক বিভাগে বা উঁচু পদে ইংরেজ নিয়োগ কমানো সম্ভব না হলেও বিচার ও অন্যান্য বিভাগে ভারতীয় নিয়োগ বাঞ্ছনীয়। [২৩]

পরবর্তীকালে রামমোহনের চিন্তাকেই জাতীয় কংগ্রেস 'ভারতীয়করণ' আন্দোলন নামে পরিচালিত করতে চায়। সম্প্রতি প্রশাসন ও বিচার বিভাগকেও পৃথক করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। রামমোহন দেখিয়েছিলেন যে, বোর্ড অব কণ্ট্রোল আর ইণ্ডিয়া হাউসের ব্যয়নির্বাহে, ইংরেজ কর্মচারীর ছুটির বেতনে, পেনসন, সরকারের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। তাছাড়া ইংরেজ কর্মচারীরা বছরে দু'কোটি টাকা এবং ব্যবসায়ীরা বিরাট লাভের টাকা ইংলণ্ডে প্রেরণ করতেন। [২৪]

রামমোহন এই অর্থনৈতিক অপচয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং পরবর্তীকালে অনেক অর্থনীতিবিদ্ এই 'আর্থিক বহিঃস্রোতের' বিরোধিতা করেছেন। রামমোহন অবশ্য বহির্বাণিজ্যে সমতা রক্ষার কথা না বলে ব্যয়সংক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার উপরই গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। [২৫]

ভূমিব্যবস্থা, সরকারী আয়-ব্যয়, অপব্যয় ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনার পর রামমোহন,

দ্বারকানাথের মতো ইউরোপীয়দের ভারতবর্ষে এসে বসবাসের সুযোগ করে দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, শিক্ষিত উন্নতমনা ইংরেজ ভারতবর্ষের কৃষি-বাণিজ্য শিক্ষায় মূলধন, বৈজ্ঞানিকতা, আধুনিকতা সঞ্চার করে ভারতকে উন্নত করবে। কিন্তু নবাগত ইউরোপীয়রা যে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে অথবা ভারতীয়দের শোষণ করতে পারে—এমন চিন্তা রামমোহনের মাথায় আসে নি ; আর এইখানেই তাঁর চিন্তার সীমাবদ্ধতা। [২৬]

পরবর্তীযুগের অর্থনীতিবিদরা রামমোহনের অনেক প্রস্তাব গ্রহণ করলেও, ভারতে ইউরোপীয়দের বসবাস সম্পর্কে কোনো কথা বলেন নি। কেননা, তাঁদের সামনে ইউরোপীয়দের উপনিবেশ স্থাপনের দৃষ্টান্ত ছিল দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকা। রামমোহন ভেবেছিলেন, ইংলণ্ড তার মূলধন ও শ্রমশিল্প নিয়ে যেভাবে উত্তর আমেরিকার উন্নতি করেছে, ভারতেও তাই অনুসৃত হবে। আফ্রিকার ছবি রামমোহনের চোখের সামনে ছিল না। স্থায়ী বসবাসকারী ইংরেজরা যে ভারতীয়দের শোষণ করবে এটা তিনি ভাবতে পারেন নি, যদি নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী তাঁর অজানা ছিলো, মনে হয় না। [২৭]

রামমোহনের সামগ্রিক মতবাদ কালের বিচারে গ্রহণীয় না হলেও তাঁর চিন্তাজাত লেখনীতেই ভারতের অর্থনীতিক আলোচনা বৈজ্ঞানিক রূপ পরিগ্রহ করে। জমিদারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে প্রজাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ব্যয় কমানো, শুল্ক বসানো, প্রশাসনে ব্যয় কমানো ইত্যাদির দ্বারা রামমোহন ভারতের অর্থনীতিকে একটা নির্দিষ্ট রূপ দিতে চেয়ে তাঁর বিশ্লেষণী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। [২৮]

রামমোহনের অর্থনীতি বিষয়ক রচনাগুলিতে যে পরিণত মননের ছাপ পাওয়া যায় তার প্রস্তুতিপর্ব আগেই আরম্ভ হয়েছিলো এমন মনে করা যেতে পারে। দেশের ও ইংলণ্ডের পত্রপত্রিকায় নানা বিদগ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রে, সরকারের কাছে আবেদন ও প্রতিবেদনে রামমোহনের অর্থনৈতিক মতবাদ প্রতিফলিত। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার অন্যতম দিক অর্থনৈতিক চিন্তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া গেলে প্রশাসনে ও অর্থনীতি বিষয়ক ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনা-চিন্তার পূর্বাঙ্গ আলোচনা পরবর্তীকালের প্রজন্মকে সাহায্য করবে বলে মনে হয়। [২৯]

● প্রবন্ধ বিশ্লেষণ ঃ

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও প্রাবন্ধিক ভবতোষ দত্ত তাঁর 'রাজা রামমোহন রায়' প্রবন্ধটিতে রামমোহনের সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতিকেন্দ্রিক উদ্যোগের আলোচনায় প্রবেশ না করে মূলত তাঁর অর্থনীতি সম্পর্কিত চিন্তার আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন। রামমোহন-জীবনের অন্যান্য দিকগুলি নানাভাবে আলোচিত হয়েছে, কিন্তু রামমোহনের অর্থনীতি-কেন্দ্রিক আলোচনা আজ পর্যন্ত প্রায় অনালোচিত থেকে গেছে। সেদিক থেকে প্রাবন্ধিক ভবতোষ দত্ত একটি উল্লেখযোগ্য কর্ম সম্পাদন করলেন। রামমোহনের অর্থনীতিসংক্রান্ত

রচনার সংখ্যা যথেষ্ট নয়; তাঁর অর্থনীতিসংক্রান্ত আলোচনাগুলি ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দেই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন সে ব্যাপারে কোনো আলোকপাত করা হয় নি। সুশোভন সরকার সম্পাদিত 'রামমোহন রায় অন ইণ্ডিয়ান ইকনমি' গ্রন্থে রামমোহনের অর্থনীতিসংক্রান্ত চিন্তার আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে লেখক রামমোহন রায়ের অর্থনীতির ভাবনা আলোচনা প্রসঙ্গে রামমোহন সমকালীন ভারতবর্ষের কথাও বলেছেন। রামমোহন যে দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে বিচার করতে চেয়েছিলেন, তার সীমাবদ্ধতাও লেখক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের অর্থনীতিসংক্রান্ত আলো-চনায় রামমোহনের প্রভাবও এখানে আলোচিত হয়েছে। 'রাজা রামমোহন রায়' প্রবন্ধটিতে লেখকের আলোচনা আবর্তিত হয়েছে নিম্নোক্ত প্রসঙ্গগুলিকে কেন্দ্র করে :. রামমোহন রায় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় ভারতবর্ষের আর্থিক সমস্যার বিশ্লেষণে অবিসম্বাদিত পথিকৃৎ। ২. রামমোহনের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার বাস্তব পটভূমিকা। ৩. সমকালীন ভারতবর্ষের ভূমিরাজস্ব ও কৃষিব্যবস্থা। ৪. রামমোহনের অর্থনৈতিক চিন্তার স্বরূপ ও তার সীমাবদ্ধতা। ৫. পরবর্তীকালের অর্থনৈতিক চিন্তায় রামমোহনের প্রভাব।

উদ্ধৃত বিভিন্ন বিষয়গুলির মূল কেন্দ্রবিন্দুতে কিন্তু বিরাজিত রামমোহনের অর্থনৈতিক চিন্তা। সুতরাং অন্যান্য বিষয়গুলি আলোচনার পরিপূরক রূপে এসেছে। আলোচনার বিষয়গুলি কোনটি কোনটির থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এবং আলোচনার সামগ্রিক ফলশ্রুতি থেকে সমগ্র ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক রূপরেখাও আমাদের কাছে ফুটে ওঠে। লেখক যুক্তি-বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে রামমোহনের অর্থনৈতিক চিন্তার স্বরূপ প্রকাশে অগ্রসর হয়েছেন; ভাবাবেগের বিন্দুমাত্র প্রকাশ সেখানে নেই। এমনকি পরবর্তীকালে যাঁরা অর্থনীতি সংক্রান্ত চিন্তা করেছেন, তাঁদের চিন্তার সঙ্গে রামমোহনের চিন্তাগত সাদৃশ্য নির্ণয়ে ব্রতী হয়েছেন।

● সমালোচ্য প্রবন্ধের প্রথমাংশে লেখক রামমোহনকে আর্থিক সমস্যার বিশ্লেষণে 'অবিসম্বাদিত পথিকৃৎ' বলেছেন। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে রামমোহনের যে অগ্রণী ভূমিকা ছিল, আর্থিক সমস্যার বিশ্লেষণেও তিনি সেই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। রামমোহন সামাজিক জড়ত্বপুঞ্জের ঊর্ধ্বে আরোহণ করে মুক্ত প্রাণের বার্তা এনেছেন বলে, ভেদবুদ্ধির অহংকার থেকে মুক্তিলাভের সাধনায় ব্রতী হয়ে মানবাত্মার মিলনের মহান মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন বলে রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'ভারতপথিক'। মধ্যযুগের 'ভারতপথিক' কবীর, দাদূর ন্যায় রামমোহন রায়ও ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তা ও দর্শনের পথ অবলম্বন করে সমসাময়িক দেশবাসীর দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও সভ্যতার 'হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে' ঝলমল চিত্ত হিন্দু কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে নি। পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতার মোহমুগ্ধ হিন্দু কলেজের ছাত্রদের কাছে রামমোহনের

বিপ্লববাণী বহ্নিদীপ্তি সৃষ্টি করলো। রামমোহন শিক্ষা, সমাজ, মানসমুক্তি ইত্যাদি প্রায় সর্বক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সঙ্গে ভারত-ঐতিহ্যের সমন্বয় সাধনে প্রবৃত্ত হয়ে ভারত তথা বাংলাদেশে নবজীবনের উদ্বোধন বাণী উচ্চারণ করলেন। রামমোহন ভারতবর্ষের শাশ্বত পথের পথিকই ছিলেন না, তিনি স্বয়ং যেমন যে পথে চলেছেন, তেমনি অন্যকেও সে পথে আকর্ষণ করেছেন। যেখানে পথ ছিল না, সেখানে তিনি নতুন পথের উদ্বোধনে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর বিপ্লবী মনোজীবনের সংস্পর্শে বাঙালীর নবজন্মান্তর হয়েছে। 'যুক্তি বাদের জয়ঘোষণা, মানবহিতবাদ, ভৌগোলিক সীমাসম্প্রসারণ, রাষ্ট্র ধর্ম-সমাজ সম্বন্ধে বাস্তবচেতনালব্ধ হিতৈষণা' রামমোহনকে 'নবযুগের প্রবর্তকরূপে' পরিণত করেছে। রামমোহন রায় বহু বিষয়েই বাঙালী জীবনের পথিকৃৎ, অর্থনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রেও তাঁকে পথিকৃৎ বলতে হবে, কিন্তু রামমোহনের এই দিকটির আলোচনা প্রায় উপেক্ষিতই রয়ে গেছে। রামমোহনকে আজ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে দার্শনিক রামমোহনরূপে, আত্মীয়সভা, ব্রাহ্মসমাজ, বেদান্ত কলেজের প্রতিষ্ঠাতারূপে; বাংলা গদ্যের অন্যতম স্রষ্টারূপে; ব্রাহ্মসমাজের গঠনে, ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে, সতীদাহ প্রথানিবারণে রামমোহনের ভূমিকা স্মরণীয়। রামমোহনের চিত্তধর্মের মধ্যে উনিশ শতকের বাঙালীর আত্মজাগরণের মূল রহস্য নিহিত। রামমোহনের কলকাতায় আগমনের কাল থেকে আরম্ভ করে তাঁর তিরোধান পর্যন্ত বিশ বছরের সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, এই সময়ে বাঙালীর মনোজগতে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করে রামমোহন জনসাধারণকে আলাপ আলোচনায় উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁরই উদ্যোগে 'ব্রাহ্মসভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠানই রামমোহনের আদর্শকে বরণ করে নিয়েছিল। রামমোহনের পূর্ববর্তী বাঙালী সমাজ কলকাতায় বিত্ত উপার্জন করতো, ব্যবসা-বাণিজ্য করতো, আর অবসর সময়ে কবির দল বেঁধে গান গেয়ে নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাপন করতো। রামমোহন সেখানে তন্দ্রাতুর সমাজদেহে জাগরণের শঙ্খধ্বনি ঘোষণা করলেন। আত্মীয় সভা, ব্রাহ্মসভা, বেদান্ত কলেজ স্থাপন প্রভৃতির দ্বারা জাতীয় জীবনের কর্মকাণ্ডে রামমোহনের অগ্রবর্তী ভূমিকা স্মরণীয়। সতীদাহ প্রথা নিরোধকল্পে সংবাদপত্রে তাঁর লেখনী ধারণ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ তাঁর বিপ্লবী মনোভাবের পরিচয় প্রদান করে। রামমোহনের আবির্ভাব, সংবাদপত্র পরিচালনা, মিশনারীদের মূঢ়তার বিরুদ্ধে রামমোহনের শাণিত যুক্তির প্রয়োগ প্রভৃতি বাঙালী জাতিকে জাগ্রত করে তুললো। রামমোহন সাহিত্যিক না হলেও তাঁর গ্রন্থাবলী বাংলা গদ্যের ভিত্তিস্বরূপ। তাঁর ভাষার প্রধান গুণ বোধগম্যতা, সরলতা ও ঋজুতা;—তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হয়েছিল। যুক্তির পারম্পর্য, বক্তব্য বিষয়ের স্পষ্টতা, আত্মনিষ্ঠা তাঁর রচনাকে জড়ত্বের বাহুপাশ থেকে মুক্ত করে মননশীলতার শীর্ষে স্থাপন করেছে। রামমোহনের মানবহিতবাদ, যুক্তিবাদ, আধুনিক মনন, সমাজসংস্কার, সাহিত্যকর্ম, রাষ্ট্রচেতনা, সতীদাহপ্রথা নিবারণ প্রচেষ্টা, ধর্মের নবতম

ব্যাখ্যা, সমন্বয়বাদী চিন্তাধারা, মুক্তমতি, সংস্কৃতিচিন্তা, সর্বোপরি অর্থনীতি সম্পর্কিত চিন্তা তাঁকে বাংলাদেশের নবজাগরণের পথিকৃতে—ভারতপথিকে—পরিণত করেছে—এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। জীবনের সর্বক্ষেত্রে রামমোহন নবজীবনের মাঙ্গলিকী যেমন সর্বপ্রথম গেয়েছিলেন, তেমনি অর্থনীতি সংক্রান্ত আলোচনায় তিনিই প্রথম পথিকৃৎ। তাঁর অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধাবলী আলোচনা করলে প্রমাণিত হয় যে তিনিই প্রথম ভারতীয় অর্থনীতির বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেন। তাঁর পূর্বসূরী এক্ষেত্রে দুর্লভ। রামমোহন তাঁর অর্থনীতিসংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি রচনা করেছিলেন ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে। তিনিই প্রথম মননের জগতে অর্থনীতি সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রপাত করেন এবং উনিশ শতকের শেষভাগে ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা যখন দাদাভাই নওরোজী, রমেশচন্দ্র দত্ত ও রাণাডের লেখনীতে নবজীবন লাভ করলো তখন দেখা গেল যে, রামমোহনের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁদের চিন্তার সাদৃশ্য অনেক—ইতিহাসের ধারাবাহিকতা স্বাভাবিকভাবে অক্ষুন্ন আছে। সেজন্য রামমোহনকে প্রাবন্ধিক ভবতোষ দত্ত অর্থনীতিসংক্রান্ত আলোচনায় পথিকৃৎ বলেছেন এবং পরবর্তী আলোচনায় আলোচ্য বক্তব্যের সত্যতা আরও দীর্ঘতর ও পরিণত রূপ লাভ করবে।

● রামমোহনের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার বাস্তব পটভূমিকা জানতে হলে রামমোহন সমসাময়িক আর্থ-সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হয়। ১৮১৩ থেকে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময় বাংলাদেশের সামাজিক রাষ্ট্রীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে পার্লামেণ্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ বিশ বছরের জন্য বাড়িয়ে দেয় এবং সনদে এমন কয়েকটি ধারা যুক্ত হয় যার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী ছিল। ১৮৩৩-এ সনদের মেয়াদ পুনরায় বৃদ্ধির সময় আরও কয়েকটি নতুন ধারা সংযোজিত হয়। ১৭৯৮—১৮২৩-এর মধ্যে বণিক ইংরেজ ধীরে ধীরে রাজশক্তি অর্জন করে। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রশক্তিকে খর্ব করে রাজনৈতিক একাধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মধ্যযুগীয় সামন্ত নরপতিগণের স্বাতন্ত্র্য বহুলাংশে বিনষ্ট হয়। মুসলমান শাসনের অবসানে দেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে যে ভাঙন সূচিত হয়েছিল তাকে রোধ করার ক্ষমতা ছিল না। উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে বণিক ইংরেজ শাসকে পরিণত হলো। এই সময় বা এর কিছু পরে সদ্যশিক্ষিত বাঙালী ইংরেজ শাসনকে আশীর্বাদ বলে মনে করেছিলো। অবশ্য মোহভঙ্গ হতেও দেরী হলো না। উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকের ইতিহাস হলো দেশব্যাপী জড়তার মধ্যে ইংরেজ বণিকের স্বার্থ আর লোভ; অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের রস শোষণ। কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের এই সর্বনাশা ভাঙনের দিক রামমোহন ব্যতীত কারোর নজরে পড়েনি। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ বৃদ্ধির কালে এমন একটি নতুন ধারা সংযোজিত

হলো যার ফলে ভারতবর্ষে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার বিলুপ্ত হলো। এর পেছনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ ছিলো। শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যে ইউরোপের বাজার পূর্ণ হয়; কিন্তু নেপোলিয়ন ইংরেজের অর্থনৈতিক ক্ষমতা হ্রাসের জন্য ইউরোপের বাজারে ইংলণ্ডের দ্রব্য নিষিদ্ধ করে দেন। ফলে, সাধারণ ইংরেজকে বাণিজ্যের অবাধ সুযোগ প্রদানের জন্য কোম্পানীর বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার বন্ধ করা হলো। এর ফলে কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে যন্ত্রবিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটলো এবং দেশীয় কারিগররা বৃত্তিচ্যুত হতে আরম্ভ করলো। অপর এক ধারায় ভারতে খ্রীস্টান মিশনারী সম্প্রদায়ের আগমনের বিরুদ্ধে বাধা না থাকায় দলে দলে খ্রীস্টান মিশনারীদের আগমন শুরু হলো এবং প্রকাশ্যে ধর্মান্তরীকরণ আরম্ভ হলো। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের নির্দেশ প্রদান করে। এর উদ্দেশ্য ছিলো ভারতীয়দের মান ও রুচি উন্নত করে বিলিতি দ্রব্যের দিকে তাদের আকৃষ্ট করা। এই ভাবে নানা পদ্ধতির সাহায্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসকশ্রেণীতে রূপান্তরিত হলো।

বাংলাদেশে এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া অনুভূত হওয়াতে বেণ্টিংক ভারতীয়দের শাসনবিভাগে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দেশীয় রাজকর্মচারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে কিছু কিছু শিক্ষিত বাঙালীকে আমিন ও মুনসেফের পদে নিযুক্ত করা হলে বাঙালীর মধ্যে চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হলো। কেউ কেউ ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করলো—ইংরেজ এইসব দেশীয় মুৎসুদ্দির সাহায্যে বাণিজ্য প্রসার করতে থাকে। ইংলণ্ড থেকে আগত সিভিলিয়ানদের সাহায্যে বিশাল প্রশাসন চালানো অসম্ভব দেখে ১৮২৯ থেকে হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে প্রচুর পরিমাণে চাকুরী প্রদান সুরু হলো। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের এই দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করে যথার্থই বলেছেন—'১৮১৩ হইতে ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দ, মোট ২০ বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ভারতের চতুঃসীমায় একটা স্থায়ী ও সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল। অবশ্য তাহার জন্য একটা দুর্মূল্য দিতে হইয়াছিল। তাহা হইল ভারতের স্বাধীন সামন্ততান্ত্রিক শক্তিসমূহের আত্মদান। একদিকে যেমন এইভাবে বিদেশী বণিকশক্তি ভারতে ও ভারতসীমান্তে স্বাধিকার স্থাপন করিল, ঠিক তেমনি বাঙালীর সমাজ জীবনেও নানা পরিবর্তন, বাদ-প্রতিবাদ ও সংস্কৃতির সংঘর্ষ প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল। শাসনগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্বিন্যাস শুরু হইল'।

১৮শ শতাব্দীতে বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্পকর্মে যে দক্ষতা অর্জন করেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। শুধু আভ্যন্তর বাণিজ্যেই নয়, পারস্য-তুরস্ক ও তিব্বতেও বাংলাদেশের বাণিজ্য প্রবাহ ছিল। 'এ শতকে বাংলার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের আশ্চর্য রকম উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। পলিমাটি দিয়ে গড়া বাংলার উর্বর জমি, প্রাকৃতিক

জলসেচ ব্যবস্থা শাস্ত ও পরিশ্রমী মানুষ বাংলার আর্থিক সমৃদ্ধির কারণ। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় বাজারের উপযোগী অনেকগুলি পণ্য বাংলাদেশে উৎপন্ন হত। এগুলি হল বিভিন্ন ধরণের সুতীবস্ত্র, মসলিন, রেশমবস্ত্র ও কাঁচা রেশম। ইউরোপীয় বাজারের চাহিদা অনুযায়ী এগুলির উৎপাদন অনেকগুণ বেড়ে যায় এবং এজন্য বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের পরিধিও বাড়ে। এ শতকের শেষদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও শিল্প বিপ্লবের অভিঘাতে বাংলার আর্থিক কাঠামোয় পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আধুনিক আর্থিক পরিচালন সংস্থাগুলি ব্যাঙ্কিং, বীমা, এজেন্সি প্রভৃতি গড়ে ওঠে যেগুলি পরবর্তীকালে বাংলার আর্থিক কর্মকাণ্ডের মেরুদণ্ড হয়। বাংলার অর্থনীতির আধুনিকীকরণ এবং সেইসঙ্গে ঔপনিবেশিক কর্মনীতির সূত্রপাত অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে শুরু হয়েছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতকে বাংলার আর্থিক জীবনধারা দু'ভাগে বিভক্ত। প্রাক্ পলাশী যুগে আর্থিক কাজকর্ম অপেক্ষাকৃত অবাধ, মুক্ত ও স্বাধীন। পলাশী উত্তর কালে বাংলার অর্থনীতি ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকারী বাণিজ্য এবং কোম্পানীর কর্মচারী ও স্বাধীন বণিকদের বেসরকারী বাণিজ্য দ্বারা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত। তাই দ্বিতীয়পর্বে আর্থিক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি বাংলার কৃষক, কারিগর, কারুশিল্পী ও শ্রমিকের পক্ষে তেমন লাভজনক হয় নি। উৎপাদন ব্যবস্থায় সরকারী ও বেসরকারী নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে কায়েম করা হয় যে এদেশীয় কারিগর ও শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দুই বা তিন দশক আগের তুলনায় কম হয়ে যায়। লবণ ও সুতীবস্ত্র, আফিম উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিক ও কারিগরদের বেতনসূচকে এরকম বিপরীত প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েছিল।' [ভূমিকা, বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী): সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়।]

পলাশীর যুদ্ধের অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্পের দ্রুত অবনতির কারণ বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ। পার্লামেন্টে আইন পাশ করে ভারতের শিল্প প্রাধান্য হ্রাস করা হলো, আর ইংলণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হলো। ব্যবসা বাণিজ্য বিচ্যুত অনেকে কৃষিকার্য অবলম্বন করলো; কিন্তু জমির মালিকানা স্বত্ব রায়তের অধিকারে না থাকায় দেশে ভূমিহীন কৃষিসম্প্রদায় ও বৃত্তিহীন শিল্পী-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হলো। ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব অনুষ্ঠিত হওয়ায় যন্ত্রবিজ্ঞানের অভিঘাতে কুটির শিল্প প্রায় ধ্বংসের অভিমুখী হলো। হাতে কাটা দেশী সুতা বিক্রী না হওয়ায় সুতাকাটনীর দল যে নিদারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলো এ কথা সমকালীন সংবাদ-পত্র থেকে জানা যায়। বিদেশী প্রতিযোগিতার ফলে রাজমিস্ত্রী, স্বর্ণকার, দরজী ইত্যাদি সকলেই নিদারুণ আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। রামমোহনের কলকাতায় আগমন থেকে তাঁর তিরোধান পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮১৫—১৮৩৩ পর্যন্ত এই দীর্ঘ কুড়ি বছরের অর্থনৈতিক ইতিহাসের অধোগতির রূপ যেমন প্রকট তেমনি সমকালীন সমাজ জীবনধারা সংস্কৃতির সংকটক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। তখনকার দিনে কলকাতায় ধনী ব্যক্তির মাসিক হাজার টাকা দক্ষিণায় রূপোপজীবিনীকে রাখা; সরস্বতী পূজা

উপলক্ষে বা গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে ভাঁড়ামি ও দিবালোকে কুৎসিত সঙ্ সহ শোভাযাত্রা, দেড়শত টাকায় সুন্দরী কন্যা বিক্রয় ইত্যাদি সামাজিক অধোগতি কলকাতা নগরীর ১৮২০—'২৫ খ্রীস্টাব্দের চিত্র। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে ব্যবসা-ব্যাপারে বাঙালী ও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের মধ্যে কলহ, দুর্গাপূজার চাঁদা আদায় ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি কলকাতা নগরীর অবক্ষয়ী জীবনযাত্রার পরিচয় দেয়। সমকালীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে রামমোহনের ভূমিকা প্রসঙ্গে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন,তা সত্যই প্রণিধানযোগ্য—'রামমোহনের আবির্ভাবকাল হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার তিরোধান পর্যন্ত প্রায় বিশ বৎসরের অর্থনৈতিক ইতিহাস ক্রমেই অধোগতির পথে গিয়াছে। জনসাধারণ ধীরে ধীরে দারিদ্র্যের শেষ স্তরে নামিয়াছে, য়ুরোপ হইতে যন্ত্রবিজ্ঞান আমদানী করা হইয়াছে, বৃত্তিজীবী বাঙালী ক্রমেই আশাভঙ্গের ব্যর্থতার মধ্যে পতিত হইয়াছে। অপরদিকে কলিকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধির জন্য মুৎসুদ্দি শ্রেণীর বাঙালী হঠাৎ ধনাগমে স্ফীতচিত্ত হইয়াছে। আবার সমাজের আর একদিকে কেহ কেহ মাহেশের রথে জুয়ায় হারিয়া স্ত্রী বিক্রয় করিয়াছে। ১৮৩০ সালে নদীয়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র বানরের বিবাহে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া প্রচুর খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। অন্যদিকে জমিদারগণ সুপ্রীম কোর্টের মামলায় নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছিলেন। * * * এই যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, ইহা একদিকে কৃষাণ শ্রেণীকে পীড়িত করিল, অপরদিকে নব্য সামন্ততন্ত্রের ধারক ও বাহকগণের আর্থিক অবস্থাকেও সকলের অলক্ষ্যে অবনতির পথে টানিয়া লইয়া চলিল। রামমোহন এই দারিদ্র্য-পীড়িত বাংলাদেশের হৃদ্‌পদ্ম দলে আবির্ভূত হইয়া এবং বিচিত্র ও বিরোধী জীবন-ধারার সমন্বয় করিয়া ১৯শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই বাঙালীর নবজীবন প্রভাতের মাঙ্গলিক গাহিলেন।'

● সমালোচ্য প্রবন্ধের ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদে লেখক ভবতোষ দত্ত মন্তব্য করেছেন—'যে অর্থনৈতিক পটভূমিকাতে রামমোহনের মতবাদ গঠিত হয়েছিল তার সবচেয়ে বড় দিক ভূমিরাজস্ব ও কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কিত।' এখানে মতবাদ বলতে অর্থনীতিসংক্রান্ত মতবাদকে বলা হয়েছে এবং প্রবন্ধকার মনে করেন যে, রামমোহনের অর্থনৈতিক মতবাদের গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল তৎকালীন ভূমিরাজস্ব ও কৃষিব্যবস্থা। রামমোহনের অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলি ১৮৩১-এর আগস্ট থেকে ১৮৩২-এর জুলাই অর্থাৎ প্রায় এক বছরের মধ্যে লিখিত। তাঁর অর্থনীতিসংক্রান্ত চিন্তার ভিত্তি গঠনে অন্যতম সহায়ক সর্ত ছিল তৎকালীন ভারতের ভূমিরাজস্ব ও কৃষিব্যবস্থা—অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দী ও তার পূর্ববর্তী এবং উনিশ শতকের তিনটি দশকের ভূমি রাজস্ব ও কৃষিব্যবস্থা রামমোহনের অর্থনীতিসংক্রান্ত ভাবনার অন্যতম ভিত্তিভূমি ছিল। লেখক কিন্তু এই ভূমিরাজস্ব ও কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে প্রবন্ধে পৃথক ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা

করেন নি। তিনি সাধারণভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চিত্র উপস্থিত করেছেন। সুতরাং সে আলোচনার জন্য প্রবন্ধ ব্যতীত আরও অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহ প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং তা প্রবন্ধের পরিপূরক রূপে ব্যবহৃত হবে।

যে কোনো দেশের ভূমিরাজস্ব ও কৃষিব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং কোনো অর্থনৈতিক আলোচনাই এ দুটি ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হতে পারে না। সুতরাং রামমোহনের অর্থনীতি সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তার মূলে যে ভূমিরাজস্ব ও কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কিত পটভূমিকা অত্যন্ত ক্রিয়াশীল হবে এ ব্যাপারে আশ্চর্যের কিছু নেই; বরঞ্চ সেটাই সচেতনতার পরিচয় বহন করে। রামমোহন তাঁর সমকালীন যে বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ও কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন তার সীমারেখা বিস্তৃত হতে পারে ১৭০০ থেকে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত—অষ্টাদশ শতক প্রায় সম্পূর্ণ এবং উনিশ শতকের তিনটি দশক। অষ্টাদশ শতকের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব আবার দুটি পর্যায়ে বিন্যস্ত হতে পারে। প্রথম পর্যায় ১৭০০—১৭৬৫ অর্থাৎ মুর্শিদকুলি থেকে দেওয়ানি; দ্বিতীয় পর্যায় ১৭৬৫—১৭৯৩ অর্থাৎ দেওয়ানি থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। তৃতীয় পর্যায় হলো ১৮০০—১৮৩০ পর্যন্ত—কেননা রামমোহন রায় অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন ১৮৩১-এর আগস্ট থেকে ১৮৩২-এর জুলাই পর্যন্ত।

১৭০০ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদকুলি যখন বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হন তখন আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ব্রত এবং আওরঙ্গজেবের টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল ঐ সময়ে। বাংলা তখন মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থায় নানা ত্রুটি ছিল। বাংলার প্রায় সমস্ত খালসা জমি উচ্চরাজকর্মচারীরা জাগির রূপে গ্রহণ করায় জমি থেকে রাষ্ট্রের কোনো আয় ছিল না। রাষ্ট্রীয় আয়ের একমাত্র উৎস ছিল বাণিজ্য শুল্ক; তাছাড়া জিনিষপত্রের দাম ক্রমশ বাড়ছিল, কোষাগারের অর্থ তছরূপ করা হতো। বাংলার দেওয়ানি কর্মভার গ্রহণ করে মুর্শিদকুলি খাঁ প্রথমেই রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধির দিকে নজর দিলেন। সমস্ত জাগির খালসায় পরিণত করে রাষ্ট্রীয় আয় বাড়ালেন। প্রায় দশ লক্ষ একুশ হাজার টাকা তিনি প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস করলেন এবং প্রতিরক্ষা খাতে খরচ কমালেন। বাংলাদেশে জমি জরিপ করে তিনি জমিকে আবাদী, অনাবাদী ও বন্ধ্যা এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করলেন। এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে তিনি ১৭২২ খ্রীস্টাব্দে ভূমিরাজস্বে বন্দোবস্ত করলেন প্রায় ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। মুর্শিদকুলি ব্যয় সংকোচ ও দক্ষতার দিকে লক্ষ্য রেখে ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থার প্রশাসনিক ও কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। বাংলার কৃষি অর্থনীতির উপর মুর্শিদকুলির ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সামগ্রিকভাবে বাংলার আর্থিক জীবনে মুর্শিদকুলি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটিয়ে শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। বাণিজ্য ও উৎপাদন বাড়া সত্ত্বেও টাকার যোগান কম থাকায় জিনিষপত্রের দাম বাড়েনি। কৃষক ও কারিগরের উদ্বৃত্ত উৎপাদন রাজকোষে জমা পড়েছে। তাঁর সময় থেকেই বাংলার আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য

ও উন্নতির সূচনা হয়েছিল। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানি লাভ থেকে ১৭৯০ পর্যন্ত বাংলার ভূমি রাজস্ব ভাগ তিন পর্যায়ে বিন্যস্ত—১. ১৭৬৫-১৭৭২—দ্বৈতশাসন পর্বে আমিনদারি ব্যবস্থা। ২. ১৭৭২—১৭৭৭—ইজারাদার ও জমিদারদের সঙ্গে পাঁচ বছরের জন্য রাজস্বর বন্দোবস্ত। ৩. ১৭৭৭—১৭৯০ পর্যন্ত জমিদারদের সঙ্গে বার্ষিক ভূমিরাজস্বের বন্দোবস্ত। এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভূমি বন্দোবস্ত, ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ, কর সংগ্রহ পদ্ধতি ইত্যাদি ব্যাপারে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। সমস্ত জেলাতে আমিনদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হতো ; এদের সঙ্গে প্রজার কোনো যোগ ছিল না এবং এরা ভূমিরাজস্ব ছাড়াও অনেক কর আদায় করতো। বাংলা জনজীবনে ও অর্থনীতিতে আমিনদারি ব্যবস্থার ফল অত্যন্ত মারাত্মক হয়। ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তে ও সংগ্রহে শঠতা, প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চলে এবং বাংলার প্রধান আয়ের উৎস কৃষি উৎপাদনের অধোগতি হয়। ১৭৯৩-এ গভর্ণর জেনারেল কর্ণওয়ালিশ দশশালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করলেন। এর ফলে জমিতে উত্তরাধিকার সূত্রে জমিদারি ভোগ করার অধিকার স্বীকৃত হলো। মনে হয়েছিল, এর ফলে জমি ও চাষের উন্নতি হবে, কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হবে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটি ধরা পড়লো। জমি থেকে বর্ধিত আয় জমিদাররা ভোগ করার ফলে তা দেশের উন্নয়নমূলক কাজে লাগেনি। আর্থিক প্রয়োজনের নিমিত্ত নতুন কর বসিয়ে রাষ্ট্রকে অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। জমিদার ও রায়তের সম্পর্ক এখানে স্পষ্টভাবে নির্ণীত হয় নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষগুণ সম্পর্কে সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলার আর্থিক ইতিহাস' (অষ্টাদশ শতাব্দী) গ্রন্থে যা বলেছেন তা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য—'জমিদার ও রায়তের সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থায়ী আইনগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় বাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বয়ন শিল্পের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে জমিদার রায়তকে তার জমির নিরাপত্তা বা ন্যায্য রাজস্ব হার থেকে বঞ্চিত করেছিল। নতুন ব্যবস্থায় সরকারি রাজস্ব মকুবের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় জমিদারও দুঃসময়ে রায়তের দেয় খাজনা মকুব করতে পারে নি। জমিদারির নিশ্চিত ও নিরাপদ আয় বাংলার শিল্প ও বাণিজ্য থেকে মূলধন সরিয়ে নিয়ে এল। এ প্রসঙ্গে মার্কস তার 'ক্যাপিটালে'র তৃতীয় খণ্ডে মন্তব্য করেছেন 'ভারতের ইংরাজ শাসনের ইতিহাসই কেবলমাত্র দেখা যায় সে দেশের অর্থব্যবস্থায় অনেকগুলি ব্যর্থ এবং নিতান্ত অবাস্তব ও কুখ্যাত পরীক্ষা চালানো হয়েছে। বাংলাদেশে তারা ব্যাপকভাবে সৃষ্টি করেছে বিলাতী ধরনের বৃহদায়তন জমিদারীর অপকৃষ্ট নকল'। এ ধরনের বহু ত্রুটি সত্ত্বেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার একটি বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর হাতে কিছু বাড়তি টাকার যোগান রেখেছিল যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি আন্দোলন, শিক্ষা, শিল্প, সঙ্গীত ও সংস্কৃতি চর্চায় সহায়ক হয়েছিল। বিদেশী শাসকের হাতে যদি এ উদ্বৃত্ত ভূমি রাজস্ব

যেত তাহলে বাঙালীদের এই প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পন্ন হত কিনা যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতিতে কোনো বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে নি। অধিক উৎপাদনের জন্য বেশি জমি চাষ করা হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার কৃষি জমির অর্ধেকাংশে এক ফসল আর অর্ধাংশে দুই বা তিন ফসল হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার কৃষিজ পণ্য অসংখ্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। এর মধ্যে পাট ও নীলের উৎপাদন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সুরু হয় ইউরোপের শিল্প-বিপ্লবোত্তর কালে। এ যুগে নানাধরনের কৃষিপণ্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে রপ্তানী করা হতো। নতুন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বিকাশ হয়। টাকার জন্য কৃষি উৎপাদন সুরু হয় এবং বাংলার কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ হয়। কৃষি জমির মূল্য ও চাহিদার ফলে জমির উপর অত্যাধিক চাপ সৃষ্টি হয়। বাংলার হস্ত ও কুটির শিল্প নানা অবক্ষয়ের সম্মুখীন হলে জীবিকার জন্য জমির উপর চাপ পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার রায়তরা কর প্রদানের ভিত্তিতে তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে এদের খোদকস্ত ও পাইকস্ত এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়। বৃটিশ কালেক্টররা রায়তদের সম্পন্ন ও সাধারণ এই দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন। জমিদাররা রায়তদের কাছ থেকে ভূমিরাজস্ব আদায় করা ব্যতীত মাঙ্গন, বাট্টা, বাট্টার বাট্টা ইত্যাদি আদায় করতেন। তাছাড়াও জমিদার নজরানা, উৎসব বা পার্বণের খরচ হিসেবে কর নিতেন। রায়তদের উপর অত্যাচার, উৎপীড়নের ফলে এরা মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হতো। কৃষিখাদ্য পণ্যের দাম কম থাকাতে কৃষকদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। কেউ কেউ মনে করেছেন, কৃষকদের অলস, উদ্যমহীন শ্রমবিমুখ বলে তাদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটে নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ও ঊনবিংশ শতাব্দীর তিনটি দশকের ভূমিরাজস্ব ও কৃষিব্যবস্থা যে রামমোহনের অর্থনৈতিক চিন্তার অন্যতম পটভূমি ছিল তা রামমোহনের অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলির বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়।

● ভবতোষ দত্ত লিখিত 'রাজা রামমোহন রায়' প্রবন্ধটির কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হলো রামমোহন রায়ের অর্থনীতি সম্পর্কিত চিন্তা। প্রাবন্ধিক রামমোহন সমকালীন অর্থনৈতিক পটভূমিকার উপর ভিত্তি করে তাঁর অর্থনীতি সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার আলোচনা করেছেন। জাতীয় জীবনের সর্বাত্মক জাগরণের ক্ষেত্রে রামমোহন যেমন পুরোধা, তেমনি ভারতবর্ষের আর্থিক সমস্যার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রবন্ধকার রামমোহনকে অগ্রপথিক রূপে, অবিসম্বাদিত পথিকৃৎ রূপে অভিহিত করেছেন। রামমোহনের অর্থনীতি বিষয়ক চিন্তা যে পরবর্তীকালকেও প্রভাবিত করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় নওরোজী, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাণাডে প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌দের চিন্তায়।

রামমোহন পূর্ববর্তীকালে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার বিশ্লেষণে কেউই অগ্রসর হন নি। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় 'কৃষিকর্মের বৃদ্ধি', 'গৌড়দেশের শ্রীবৃদ্ধি' ইত্যাদি

নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও সেখানে সুসংবদ্ধ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অভাব ছিল। অর্থনীতি সংক্রান্ত আলোচনার বিজ্ঞানসম্মত প্রকাশ রামমোহনের প্রবন্ধে প্রথম লক্ষ্য করা যায় বলে তাঁকে ভারতের অর্থনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে পথিক ও পথিকৃৎ বলা হয়েছে—যিনি তাঁর নিজস্ব একাকিত্বে ছিলেন বিশিষ্ট। রামমোহনের অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলির রচনাকাল ১৮৩১-এর আগস্ট থেকে ১৮৩২-এর জুলাই অর্থাৎ এক বছর। রামমোহনের অর্থনীতি সংক্রান্ত রচনাগুলি ১৮৩২ সালেই প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৪৭-এ ব্রাহ্মসমাজ রামমোহনের ইংরেজি রচনাবলী প্রকাশ করেন। ১৯৬৫ সালে সুশোভন সরকারের সম্পাদনায় সমস্ত অর্থনীতি সংক্রান্ত লেখা একত্রিত করে 'রামমোহন রায় অন ইণ্ডিয়ান ইকনমি' প্রকাশিত হয়। অবশ্য রামমোহনের অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধের সংখ্যা খুব বেশি নয়। 'সিলেক্ট কমিটির' কাছে প্রেরিত প্রশ্নোত্তর ও জমিদারদের লাখেরাজ সম্পত্তি কোম্পানীর দখলে আনার প্রতিবাদে লিখিত প্রতিবাদ পত্রগুলি ব্যতীত রামমোহনের অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধ আর কিছুই নেই।

সেই সময়ে প্রায় কুড়ি বছর অন্তর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ চার্টার অ্যাক্টের সাহায্যে পার্লামেণ্টে পাশ করিয়ে নিতে হতো। ১৮৩৩-এ নতুন চার্টার অ্যাক্ট পাশ করাবার আগে পার্লামেণ্ট থেকে পূর্ববর্তী কুড়ি বছরের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে সনদে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের জন্য সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটিতে সাক্ষ্য দেবার জন্য রামমোহন রায় আমন্ত্রিত হন। সিলেক্ট কমিটির কাছে যে প্রশ্নোত্তর ও মন্তব্য সম্বলিত পরিশিষ্ট রামমোহন কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিল সেগুলি যথাক্রমে—রাজস্ব ও বিচার ব্যবস্থা, আর্থিক অবস্থা, লবণের একচেটিয়া কারবার, ভারতে ইউরোপীয়দের বসবাস ইত্যাদি সম্পর্কিত মন্তব্য। স্বাভাবিকভাবে রামমোহন রাজস্ব ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনাকালে তাঁর স্বীয় মতামত ব্যক্ত করেছিলেন সমকালীন ভারতের অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে।

রামমোহনের কৈশোর থেকে যৌবনে উপনীতির কালে ভূমিরাজস্ব নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। ১৭৬৫—১৭৯০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ পঁচিশ বছরকে সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলার আর্থিক ইতিহাস' (অষ্টাদশ শতাব্দী) গ্রন্থে 'পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। ১৭৭০ সালে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অসংখ্য শিশুমৃত্যুর জন্য পূর্বভারতে পূর্ণবয়স্ক লোকের সংখ্যা কমে গিয়েছিল। ১৭৯৩ সালে কর্ণওয়ালিশ কর্তৃক স্থিরীকৃত জমিদারকে প্রজার দেয় রাজস্বের পরিমাণ ছিল মোট খাজনার দশ ভাগের নয় ভাগ। এর ফলে জমিদারদের প্রাপ্য খাজনা না বেড়ে খাজনা আদায় প্রায় বন্ধ হয়েছিল এবং বাকি রাজস্বের দায়ে জমিদারি বিক্রী হয়ে যাচ্ছিল। ১৭৯৯ সালে আইন করে প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারদের অধিকার বাড়িয়ে দেওয়া হলো। অবশ্য পরবর্তীকালে ১৮১২ এবং ১৮২২-এ আইন করে জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব করা হয় এবং রায়তের খাজনা সরকার কর্তৃক স্থির করে দেওয়ার

সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রামমোহন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভূমিরাজস্ব বিভাগে দীর্ঘদিন কাজ করার ফলে এবং সম্ভবতঃ স্মিথ ও রিকার্ডোর অর্থনীতি সংক্রান্ত রচনার সঙ্গে পরিচিত [প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও করনীতি বা মূলধন সম্পর্কে এবং উত্তর আমেরিকার উন্নতি সম্পর্কিত মন্তব্যে] থাকার ফলে তিনি অর্থনীতি সংক্রান্ত মতবাদে, বিশেষত 'সামাজিক রীতি-নীতি সম্ভূত জনসংখ্যা বৃদ্ধি' এবং সংখ্যাহ্রাস সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন সেখানে মলথসের মতবাদের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। মনে হয়, তিনি ইংলণ্ডের তথ্যানুসন্ধানী কমিটির পঞ্চম রিপোর্টে (১৮১২) প্রদত্ত ভূমিরাজস্ব সম্পর্কিত তথ্যাবলী পড়েছিলেন। ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য থেকে মনে হয় যে, তিনি কোলব্রুকের 'হাজব্যানডি ইন বেঙ্গল' গ্রন্থটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সম্ভবত জেরেমি বেন্থামের সঙ্গে তাঁর আলোচনা ও পত্রালাপ হয়েছিল। ভারতে ইংরেজ ব্যবসায়ী, শিল্প মালিকদের স্থায়ী বসবাস সম্পর্কে রামমোহন দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

রামমোহনের অর্থনৈতিক মতবাদ গড়ে উঠেছিলো তাঁর সমকালীন ভারতের ভূমিরাজস্ব ও কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কিত পরিমণ্ডলে। সেই পরিমণ্ডলটি যথার্থভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে ভবতোষ দত্তের 'অর্থনীতির পথে' গ্রন্থের পটভূমিকায়—'যে সময়ে রামমোহন তাঁর অর্থনীতির প্রবন্ধগুলির রচনা করেন (১৮৩১—'৩২) সেটা প্রধানত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফলের স্বরূপ আবির্ভাবের সময়। নূতন আইন করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল কিছু কিছু নিবারণের চেষ্টা চলছিল, তা থেকে তখনকার সমস্যার আভাস পাওয়া যায়। এদিকে ভারতের বহির্বাণিজ্যে তখন অগ্রগতি হচ্ছে। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার হারালো। নূতন ধরনের বাণিজ্যের দিক তখন খুলে গিয়েছে—নূতন জিনিষ, নূতন আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়, নূতন দেশের সঙ্গে কেনা-বেচাতে বাণিজ্যের রূপ বদলাতে আরম্ভ হয়েছে। কলকাতা সহর দ্রুত গতিতে বড় ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে এবং তার সঙ্গে তৈরী হচ্ছে নূতন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্ক। ভারতে বিদেশীদের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বসবাস করালে কি উপকার হবে তার আলোচনা চলছে। নূতন ইংরেজি লেখাপড়া করে যে তরুণ সমাজ তৈরী হচ্ছেন তাঁরা বিদেশী ধরন-ধারণ এবং সংস্থা দেশে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করছেন। বাণিজ্যের প্রসারে ও বিদেশী করতলগত নূতন উৎপাদন ও আমদানিতে দেশের ছোট শিল্প যা ছিল সেগুলি যে মৃতপ্রায় হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে নজর পড়ছে না।'

রামমোহন সিলেক্ট কমিটির কাছে তাঁর প্রতিবেদনে আমদানি-রপ্তানি, সরকারী ব্যয় ইত্যাদি নানা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করলেও প্রধানত তিনি ভূমি ও কৃষির সমস্যা নিয়েই আলোচনা করেছেন এবং কৃষক-প্রজার অনুকূলে ও জমিদারদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। সিলেক্ট কমিটির কাছে প্রেরিত প্রতিবেদনে তিনি কলকাতার মিস্ত্রীজাতীয় শ্রমিকের ও সাধারণ শ্রমিকের আয়ের উল্লেখ করেছেন।

তাঁর অভিজ্ঞতায় তিনি জানিয়েছিলেন যে, বাংলাদেশের দরিদ্রশ্রেণী ভাত-লবণ ব্যতীত কোনো আহার্য পায় না। তাদের পরিধেয় নামমাত্র এবং বাড়ি মাটি-খড় দিয়ে তৈরী। শিক্ষা ধনিক শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রায়তদের যে দুঃখদুর্গতি হয়েছিল তার চিত্রও রামমোহন রায় আঁকতে ভোলেন নি। রায়ত খাজনা দিতে দেরি করলে জমিদার কিভাবে তার সম্পত্তি দখল করতো, ফসলের অর্ধেক নিয়ে নিতো, চাষীকে কী দুরবস্থায় দিন কাটাতে হতো তাঁর অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদাররা রাজস্বের অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত হলেও এবং কোম্পানি সরকারের রাজস্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হলেও পতিত জমিতে কৃষি-সম্প্রসারণ হয় নি এবং আবাদী জমিরও বিশেষ উন্নতি হয় নি—অথচ যা হওয়ার কথা ছিল। রামমোহন দেখিয়েছিলেন যে, কৃষির সম্প্রসারণ যেটুকু হয়েছিলো তা জমিদারের কৃতিত্বে হয় নি, হয়েছিলো কৃষকের কৃতিত্বে, অথচ সমস্ত লাভ জমিদারের ভোগে এসেছিলো।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি রাজস্ব প্রাপ্তিতে সরকারের অধিকার এবং জমিদারের খাজনা আদায়ের অধিকার স্বীকার করে নিয়েও জমি চাষ করে উৎপন্ন আয়ের পর্যাপ্ত অংশে চাষীর অধিকার স্বীকার করার কথা বলেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কিন্তু চাষীর অধিকারের কথা স্বীকৃত হয় নি। তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে তীব্র ভাষায় বলেছিলেন—'যে অধিকার জমিদারকে দেওয়া হয়েছিল, সে রকম অধিকার প্রজারা কেন পাবে না।' সম্ভবত রামমোহনের প্রেরণাতেই পরবর্তীকালে প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়। জমিচাষকারী সর্বনিম্নস্তরের চাষীকে রামমোহন প্রস্তাবিত স্থায়ী খাজনার সুবিধা দিতে হলে সর্বক্ষেত্রেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার প্রশাসনিক জটিলতার সম্পর্কে তাঁর ধারণা না থাকলেও তিনি যে তাঁর সমকালীন ভূমিব্যবস্থা ও কৃষকদের অবস্থা আমাদের গোচরে এনেছিলেন, সেইখানেই তাঁর কৃতিত্ব নিহিত।

প্রজার দেয় খাজনা বৃদ্ধি বন্ধ করার প্রস্তাবের সঙ্গে রামমোহন জমিদারদের দেয় রাজস্ব কমানোর প্রস্তাব করেছিলেন। এর ফলে কোম্পানির সরকারের আয়-ব্যয়ের ঘাটতি হতে পারে জেনে তিনি বিলাসদ্রব্য ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর কর বসানোর কথা বলেন। ব্যয় কমানোর জন্য ইংরেজ কর্মচারীর পরিবর্তে ভারতীয় কর্মচারী নিয়োগের কথা বলেন। রামমোহন হিসেব করে দেখিয়েছিলেন যে, ইংরেজ কর্মচারীর মাহিনা, পেনসন, ছুটির বেতন, লণ্ডনে ধার করা টাকার সুদ প্রদান, পারিবারিক ব্যয় নির্বাহে টাকা পাঠানো ইত্যাদির ফলে প্রচুর টাকা বাইরে চলে যায় এবং রামমোহন এই আর্থিক বহিঃস্রোতের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।

রামমোহনের চিন্তাধারার মধ্যে সীমাবদ্ধতা থাকলেও, তিনিই প্রথম দেশের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণে তৎপর হয়েছিলেন এবং তৎকালীন ভারতের অর্থনৈতিক দুর্গতির চিত্র তুলে ধরে জনমানসকে সজাগ করতে চেয়েছিলেন। অন্যান্য সমস্ত উদ্যোগের ন্যায়

রামমোহন রায়ের এই উদ্যমী শ্রমশীলতার জন্য ও ভারতের আর্থিক অবস্থার নিপুণ, তীক্ষ্ণ, সমাজমনস্ক, বৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক চিন্তার জন্য প্রাবন্ধিক তাঁকে আর্থিক সমস্যার বিশ্লেষণে 'অবিসম্বাদী পথিকৃৎ' রূপে অভিহিত করেছেন।

● রামমোহন অর্থনীতি সংক্রান্ত চিন্তার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—যা আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রায় প্রসারিত, তা হলো ECONOMIC DRAIN বা আর্থিক নিষ্ক্রমণ। পরবর্তীযুগে অনেকেই, যেমন দাদাভাই নওরোজি এই জাতীয় আর্থিক বহিঃস্রোতের বা আর্থিক নিষ্ক্রমণের বিরোধিতা করেছেন। রামমোহন হিসেব করে দেখিয়েছিলেন যে, কোম্পানীর ভারতীয় রাজস্ব থেকে বছরে প্রায় তিন কোটি টাকা ইংলণ্ডে খরচ হতো। ইংরেজ কর্মচারীর পেন্‌সন্‌ ইত্যাদি আলোচনা করতে গিয়ে রামমোহন এই আর্থিক নিষ্ক্রমণ তত্ত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। রামমোহন তৎকালীন অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট ও অডিটর জেনারেলের মন্তব্য উদ্ধৃত করে দেখান যে, বোর্ড অব কণ্ট্রোল আর ইণ্ডিয়া হাউসের ব্যয় নির্বাহার্থে, ইংরেজ কর্মচারীর ছুটির বেতন, পেনসন ইত্যাদির খরচ মেটাতে, লণ্ডনে ধার করা টাকার সুদ দিতে এবং সরকারের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনতে বছরে তিন কোটি টাকা খরচ হতো। তাছাড়া ভারতে কর্মরত ইংরেজ কর্মচারীরা পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য বছরে ছ'কোটি টাকা দেশে পাঠাতেন। অবশ্য ইংরেজ ব্যবসায়ীরা যে বিরাট লাভের টাকা দেশে পাঠাতেন বা অবসর গ্রহণের সময় যে বিরাট টাকার অংশ দেশে নিয়ে যেতেন, রামমোহন তার কোনো হিসাব দেননি।

'পলাশীর পর থেকে রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণে সম্পদের বহির্গমনের হার বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ থেকে নিয়মিতভাবে এই সম্পদ চলে যাওয়ার ঘটনাকে সমাজ-বিজ্ঞানীরা আর্থিক নিষ্ক্রমণ বা economic drain নামে অভিহিত করেছেন।—একথা বলেছেন সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলার আর্থিক ইতিহাস' (অষ্টাদশ শতাব্দী) গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, কোম্পানীর কর্মচারীদের উদ্দেশ্যই হলো দ্রুত সম্পদ আহরণ করা এবং সেই সম্পদ দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের মন্তব্য থেকে জানা যায় যে, প্রতি বছর প্রায় চল্লিশ লাখ টাকার সোনা রুপো ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হয়। বাংলাদেশ ইউরোপীয় স্বাধীন বণিকরা বাংলার আর্থিক সম্পদ নিষ্ক্রমণের অন্যতম ভাগিদার ছিল। যে মুহূর্তে তাদের সম্পদ অর্জিত হতো অমনি তা দেশে পাঠাতে সুরু করে এবং এইভাবে আর্থিক সম্পদের নিষ্ক্রমণ চলতে থাকে। ১৭৮৩-এর সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট রচনাকালে এডমণ্ড বার্ক বলেছিলেন—কোম্পানী ও তার কর্মচারীরা বাংলাকে লুণ্ঠন করে ধ্বংস করছে। পার্সিভাল স্পীয়ার-এর মতে, বেসরকারী বণিকদের আর্থিক লোভ ও কোম্পানীর সরকারী নীতি বাংলার ধ্বংসের কারণ। পলাশী থেকে ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে নবাবের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানীর কর্মচারীরা মোট পাঁচ কোটি টাকা পেয়েছিল। ১৭৫৭—১৭৭১ পর্যন্ত আভ্যন্তর বাণিজ্য ক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্যের জন্য তারা

বেশ ভালোরকম অর্থোপার্জন করেছিলো। কোম্পানীর কর্মচারী ও স্বাধীন বণিকরা হীরা, জহরত, মণিমুক্তো কিনে ইউরোপে পাঠানোর অধিকার পাওয়াতে প্রচুর সম্পদ নিষ্ক্রমণ ঘটে। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে কোম্পানীর কর্মচারীরা বিল অব এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে দেশে পাঠাতে আরম্ভ করে এবং ১৭৬১—১৭৭১ এই দশ বছরে বাংলা থেকে বিলের মাধ্যমে প্রেরিত আর্থিক পরিমাণ হলো ২৫, ৯৮, ৯৩১ পাউণ্ড। ১৭৬৫ থেকে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত কোম্পানীর রপ্তানী বাণিজ্যের মাধ্যমে সর্বাপেক্ষা বেশি আর্থিক সম্পদ দেশের বাইরে চলে যায়। ১৭৬৬—১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বাংলা থেকে ইংল্যাণ্ডে এক কোটি পাউণ্ড পাঠানো হয়েছিল।

বাংলাদেশের আর্থিক নিষ্ক্রমণের পদ্ধতি নিয়ে অর্থনীতিবিদ্‌ ও সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে তীব্র মতভেদ আছে। কেউ কেউ মনে করেছেন যে, আর্থিক নিষ্ক্রমণের ফলে বাংলার লাভ হয়েছে। যেমন—নতুন ধরনের আর্থ পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, কলকাতায় নব্য ধনী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল, বাংলায় বৈদেশিক বাণিজ্য বেড়ে ওঠায় রপ্তানি পণ্যের চাহিদা বাড়ে ইত্যাদি, কিন্তু এ বক্তব্য যথাযথ নয়। বরঞ্চ বলা চলে—ভারত থেকে সম্পদ আহরণ করে বৃটিশরা নিজেদের আর্থিক উন্নতি জোরদার করেছিল। ভারত থেকে আর্থিক শোষণ পলাশী থেকে সুরু হয়েছিল বলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শোষণ পর্বকে 'plassey plureler, বলা চলে। এদেশ থেকে নিতান্ত অর্থ ইংল্যাণ্ডের বণিক, কর্মচারী, শেয়ার মালিকের হাতে বাড়তি টাকা এনে দেয় আর বাংলা ভারতের আর্থিক সম্পদ কমতে থাকে। রামমোহন আর্থিক নিষ্ক্রমণ তত্ত্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পরবর্তীকালের অনেকেই তাঁর এই তত্ত্বের প্রতি সমর্থন জানিয়ে অধিকতর বিশ্লেষণে রত হয়েছেন এবং এ ব্যাপারে দাদাভাই নওরোজির বিশ্লেষণকে রামমোহনের বিশ্লেষণের পুনরুজ্জীবন বলা চলে। এ প্রসঙ্গে ভবতোষ দত্তের 'দাদাভাই নওরোজী' ('অর্থনীতির পথে' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) প্রবন্ধটির বক্তব্য স্মরণীয়—'যে সুবিখ্যাত ড্রেন থিয়োরী পরে দাদাভাই নওরোজীর হাতে সম্পূর্ণতর হয়ে প্রকাশ পায় তারও প্রথম তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছিলেন রাজা রামমোহন। * * * দারিদ্র্যের আলোচনা থেকে নওরোজী সহজেই তাঁর রপ্তানি-আমদানির ব্যবধান ও ড্রেন থিয়োরিতে চলে আসতে পেরেছিলেন। রাজা রামমোহন যখন ভারত থেকে ইংল্যাণ্ডকে দেয় টাকার হিসাব করছিলেন তখন তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকারের অযথা ব্যয়বাহুল্যের দিকেই নজর দিয়েছিলেন বেশি— * * * নওরোজী এসবই তাঁর হিসাবের মধ্যে নিয়েছিলেন কিন্তু তা ছাড়াও যে প্রশ্ন তুলেছিলেন সেটা আজকাল যাকে বলা হয় 'টার্মস্‌ অব ট্রেড' যা বাণিজ্যিক বিনিময়-হারের এবং ভারতে বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তের প্রকৃতির।'

● ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে রামমোহন রায়কে ভারতপথিক—অবিসম্বাদিত পথিকৃৎ বলা হলেও রামমোহনের অর্থনীতি সম্পর্কিত চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর সীমাবদ্ধতাও আমাদের স্মরণ করতে হয়।

সমাজ সংস্কার, শিক্ষা প্রসার, ভারতীয় দর্শনচর্চা, নানা প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা রূপে রামমোহন রায় তাঁর সামাজিক অন্যান্য কাজকর্মের সঙ্গে ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন কিনা জানা নেই ; তবে রামমোহনের চিন্তা যে ভারতবর্ষের আর্থিক বিশ্লেষণে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রমাণ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। রামমোহনের অর্থনীতি সম্পর্কিত চিন্তার প্রকাশ মূলত লক্ষ্য করা যায় সিলেক্ট কমিটির কাছে প্রেরিত প্রশ্নোত্তর ও মন্তব্যসংবলিত পরিশিষ্টে এবং ১৮২৮-এ লাখেরাজ সম্পত্তিগুলিকে কোম্পানির দখলে আনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পত্রগুলিতে। [লাখেরাজ কথার অর্থ করমুক্ত।] রামমোহন যদিও তাঁর স্বীয় অভিজ্ঞতা ও সমকালীন অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে তাঁর অর্থনীতি সম্পর্কিত মতামত প্রদানে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তবুও তাঁর অর্থনীতিকেন্দ্রিক বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধতা সংলক্ষ্য।

রামমোহন ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকদের দুর্দশার চিত্রাঙ্কন করেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমি চাষ করে উৎপন্ন আয়েব পর্যাপ্ত অংশ লাভে চাষীর অধিকারের কথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু রামমোহনের সময়ে প্রজার সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কিভাবে হতে পারে তার কোনো স্পষ্ট ধারণা তৎকালীন ভারতে ভালোভাবে গড়ে ওঠে নি এবং রামমোহনও সে সম্পর্কে মনে হয় স্পষ্ট ধারণা পোষণ করতেন না। রায়তকে কোনো রকমের স্থায়ী স্বত্ব প্রদান করলে অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে আইন অনুসারে যিনি রায়ত তিনি আবার তার নীচে অন্য রায়ত সৃষ্টি করেছেন। কখনো কখনো এইভাবে ধাপে ধাপে বহু স্তরের প্রজার সৃষ্টি হয়েছে। [যেমন, উনিশ শতকের শেষে বাখরগঞ্জ জেলায় প্রায় পঞ্চাশ ধরনের রায়ত ছিল।] রামমোহন প্রস্তাবিত স্থায়ী খাজনার সুবিধা যদি সর্বনিম্নস্তরের চাষীকে দিতে হয় তবে প্রত্যেক স্তরেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। কিন্তু তা করতে গেলে যে প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হবে, তা সহজেই অনুমেয়। সেই কারণে পরবর্তীকালে ভূমিনীতি নির্ধারকরা প্রতিষ্ঠিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে আরো অনেক ধাপের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যোগ না করে, কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলে দেবার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

রামমোহন রায় ভূমিব্যবস্থা ব্যতীত সরকারি আয়ব্যয়, অযৌক্তিক বিদেশী খরচ ইত্যাদি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণী আলোচনা করার পর ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের বসবাস কববার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে শুধু রামমোহনই নয়, দ্বারকানাথ ঠাকুরও মত প্রকাশ করেছিলেন। রামমোহন তাঁর এ প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজরা স্থায়ীভাবে বসবাস করলে তারা কৃষি-শিল্প ও ব্যবসায়ে উন্নত পন্থা নিয়োগ করবে। তাদের মূলধন ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ভারতে আনীত হবে, সমাজ সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারে সাহায্য করবে, প্রয়োজনমত সরকারকে সামরিক সাহায্য করবে। তিনি মনে করতেন, 'কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের পরিবর্তে ...যদি অধিকসংখ্যক য়ুরোপীয় এসে এদেশের কৃষি-শিল্প বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে

তবেই ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব। তাই তিনি উপনিবেশ, স্থাপন বা কলোনাই-জেসনের একজন প্রবল সমর্থক ছিলেন। [হরফ প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত রামমোহন রচনাবলীর জীবনী অংশ থেকে গৃহীত।]। ভারতে ইউরোপীয়গণের বসবাস সম্পর্কে রামমোহন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন—'যাহারা এদেশে যুরোপীয়গণ কর্তৃক ইংরাজি শিক্ষাবিস্তার বিরোধী এবং যুরোপীয়গণের বসবাস তথা কৃষি-বাণিজ্যে অংশগ্রহণে বিরোধী, তাহারা এই দেশের অধিবাসীদের তথা ভবিষ্যৎ বংশধরদের শত্রু।' [হরফ প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত রামমোহন রচনাবলীর জীবনী অংশ থেকে পুনরুদ্ধৃত।] এমনকি রামমোহন ভেবেছিলেন যে, ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়-দের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শিক্ষিত ও সমৃদ্ধিশালী ভারতীয়রা স্বাধীনতার দাবীও করতে পারে। রামমোহন অন্য অসুবিধাগুলিকে খুব বেশি গুরুত্ব প্রদান করেন নি। রামমোহন সম্ভবত আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এ জাতীয় চিন্তা করেছিলেন।

পরবর্তীকালে ভারতীয় অর্থনীতিবিদরা রামমোহনের 'কলোনাইজেশন' প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। কেননা, তাদের সামনে দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকার ঔপনিবেশিক সমস্যার চিত্র ছিল। উত্তর আমেরিকার অগ্রগতিতে ইংলণ্ডের শ্রমশিল্প ও মূলধনের ইতিবাচক ভূমিকা রামমোহনের স্মরণে থাকলেও, তিনি আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের কথা চিন্তা করেন নি। আফ্রিকার চিত্র রামমোহন সম্ভবত অনুমান করতে পারেন নি। সম্ভবত তিনি মনে করেছিলেন, আমেরিকার আদিম বাসিন্দাদের চেয়ে শিক্ষিত ভারতীয়রা ইংরেজের সহযোগীরূপে কাজ করতে সক্ষম হবে। রামমোহনের চিন্তার সীমাবদ্ধতা এইখানে যে, তিনি ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ইংরেজ কর্তৃক ভারতীয়দের শোষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন নি। নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনীও সম্ভবত তাঁর জানা ছিল। কেননা অষ্টাদশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে জবরদস্তি করে রায়তকে দিয়ে. নীল চাষ করানোর প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়।

রামমোহনের অর্থনীতি সংক্রান্ত চিন্তার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় যে তাঁর লেখনীতেই প্রথম ভারতের অর্থনীতি সংক্রান্ত আলোচনা বৈজ্ঞানিক রূপ পরিগ্রহ করে। তিনিও প্রথম কৃষকের খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা বলেছিলেন। ইংরেজকে তিনি প্রশাসকরূপে নয়, আর্থিক উন্নতির পথপ্রদর্শক রূপে আহ্বান জানিয়ে-ছিলেন। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিই তাঁর একমাত্র কাম্য ছিল। সেইজন্য তাঁর অর্থনীতি সংক্রান্ত চিন্তার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকাকে আমাদের স্মরণ করতে হয়।

৫ সমালোচনা পাঠ

আধুনিক সাহিত্য : গোপাল হালদার

[গোপাল হালদারের 'আধুনিক সাহিত্য' প্রবন্ধটি 'বাংলা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি' (১৩৬৩) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ। 'বাংলা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি' গ্রন্থে মোট এগারোটি প্রবন্ধ আছে। আলোচ্য প্রবন্ধটি উক্ত গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'একালের সমালোচনা সঞ্চয়ন' গ্রন্থে প্রবন্ধটি কোনো পরিমার্জনা ব্যতিরেকে অবিকল গৃহীত হয়েছে।]

● আধুনিক সাহিত্যের মূল প্রকৃতি কী, বাংলা সাহিত্যে তা কিভাবে প্রকাশ লাভ করেছে—এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গোপাল হালদার আলোচ্য প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। প্রবন্ধটিতে তর্ক-বিতর্কের রেশ আছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বক্তব্যের পুনরাবৃত্তিও আছে। নবজাগরণের যুক্তিবাদী জীবনজিজ্ঞাসা, মানবধর্মী বিদ্যাচর্চা ও সমাজমনস্ক কর্মসাধনার যে ঐতিহ্য আধুনিক প্রবন্ধ রচনার অন্যতম ভিত্তিভূমি, গোপাল হালদারের আলোচ্য প্রবন্ধে তা অনুপস্থিত নয়। বিচারশীল মনন ও মানসিকতা গোপাল হালদারের রচনার যে বৈশিষ্ট্য তা সমালোচ্য প্রবন্ধে অনুপস্থিত নয়। মানবতাবাদী, মুক্তবুদ্ধি ও বিচিত্রকর্মা মানুষরূপে গোপাল হালদার সাহিত্যকে যে সামাজিক চেতনায় অধিষ্ঠিত দেখতে চান আলোচ্য প্রবন্ধে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। খণ্ডিত, মানবসত্তারহিত, আত্মসর্বস্ব ব্যক্তিকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে—বর্তমান সাহিত্যের এই লক্ষ্য ঘোষণা করা উচিত। তাঁর প্রবন্ধাবলীতে জীবনের যে বিশেষ দৃষ্টি প্রতিফলিত হয় তা হলো মানবসত্তার আত্মান্বেষণ। তাঁর জীবনদৃষ্টিই তাঁর সৃষ্টিমূলক ও সমালোচনামূলক প্রবন্ধে প্রকাশিত। তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য হলো তাঁর কালের তাঁর দেশের বিশেষ মানব আধারে সকল দেশের জীবন-সত্যের ও মানবসত্যের স্বরূপ সন্ধান। বাঙালীর ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বস্তুবাদী বিশ্লেষক পণ্ডিতরূপেই গোপাল হালদার খ্যাতিমান। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মানুষের প্রতি বিশ্বাসে অবিচলিত থাকার সাধনা গোপাল হালদারের জীবনের মূলমন্ত্র। বাংলা সাহিত্যের আলোচনা ক্ষেত্রে তিনি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। মানবতাবাদ তাঁর জীবনসাধনার অন্যতম মূলমন্ত্র। 'আধুনিক সাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক একটি মেথডলজি প্রদান করেছেন। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিকতার, মানবতার, পরিবর্তিত মূল্যবোধ, ব্যক্তিত্ব, বিপ্লবী নিয়তির স্বীকৃতি ইত্যাদির সম্পর্ক কি তাই লেখক আলোচনা করতে চেয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে মার্কসবাদী রচনায় যে ধারা বক্ষ্যমান শতাব্দীর বিশের দশকে সুরু হয় তা নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যে পূর্ণতা বর্তমানে পেতে চাইছে, গোপাল হালদারের রচনায়

সম্ভবত তার যথাযথ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩৮-৩৯ সালের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন গোপাল হালদারের মতো পরিশীলিত সংস্কৃতিবিদ্ ও সৃজনশীল সাহিত্যিক। মার্কসবাদের সর্বতোভদ্র বিশ্ববীক্ষাই তাঁর জীবন ও সাহিত্যাদর্শকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং সমালোচ্য প্রবন্ধে তা অনুপস্থিত নয়।

● বস্তুসংক্ষেপ :

(ক) আধুনিক সাহিত্য

আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার কালে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে আধুনিক সাহিত্য কি পুরাতন সাহিত্য থেকে স্বতন্ত্র কোনো নতুন বিষয়। প্রায় সমস্ত মানসক্রিয়া মানসজাত নয়; তার পেছনে অন্যান্য কারণ থাকে। সাহিত্যও শুধুমাত্র মানসক্রিয়া নয়। বহির্জগতের অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে সাহিত্যের পার্থক্য এই যে, সাহিত্য মূলত মনের সৃষ্টি বলে তার কোনো মাপকাঠি মানুষের হাতে নেই। সাহিত্যের মূল্য মনের কাছে, অন্তরাবেগের কাছে এবং অংশত যুক্তির কাছে—তাই সাহিত্যের কোনো ব্যবহারিক মূল্য আছে কিনা তা বিতর্কিত। অবশ্য সাহিত্যের কোনো সর্বজনস্বীকৃত মানদণ্ড গড়ে ওঠে না, তা কালে কালে পরিবর্তিত হয়। জীবনদর্শন এক হলেও সাহিত্য বিচারে পৃথক মাপকাঠি অবলম্বিত হয়। সাহিত্যের বাজার দরও ওঠানামা করে। সাহিত্যের আলোচনায় ব্যক্তিমনের প্রভাব পড়তে পারে বলে কোনো বিচারই চরম বিচার বলে পরিগণিত হতে পারে না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে চরম বিচার অপেক্ষা আপেক্ষিক মূল্য নির্বাচনই বড়ো কথা। [১ ৩]

(খ) আলোচনার দৃষ্টিক্ষেত্র

জীবনাদর্শ পরিবর্তিত হয় বলে সাহিত্যাদর্শ পরিবর্তিত হয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সাহিত্যে আর্টের বিচার চালু ছিল, কিন্তু বর্তমানে লোকে ঐতিহাসিক বিচারের পক্ষপাতী। ঐতিহাসিক বিচার বলতে কেউ বোঝেন কালানুক্রমিক; কেউ বোঝেন বাস্তব। তবে ঐতিহাসিক বিচার শুধু জড় বস্তুর কালানুক্রমিক বিচার নয়। ইতিহাসে চেতন-অচেতনের সংঘাত, বিকাশ, জীবনের অভিযান ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্য শুধুমাত্র জীবনের মুকুর নয়, সাহিত্য থেকে জীবন উপাদান, পরিণতি ও বিকাশের প্রেরণাও লাভ করে। সেদিক থেকে সাহিত্যের ব্যবহারিক মূল্য আছে। সাহিত্যকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয় বলে সাহিত্যের বিচার এত ভিন্নমুখী। আধুনিক সাহিত্য আধুনিক কালের সৃষ্টি, আবার নতুনকালের সৃষ্টিরও প্রেরণা। আধুনিক সাহিত্য আধুনিক কালের বললে এবার প্রশ্ন ওঠে আধুনিক কাল কি? তার জন্ম লক্ষণ, জীবন লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য বা কি? [৪—৭]

(গ) জন্মচিহ্ন

আধুনিক ও পুরাতন সাহিত্যের ভেদরেখা একেবারে মিথ্যা নয়। সাহিত্যের

ক্ষেত্রে জন্মচিহ্ন থাকবেই—যাকে যুগধর্ম বলা যেতে পারে। অথবা একে পরিবেশ ধর্মও বলা যেতে পারে। সাহিত্যের এই যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তা কাল থেকে কবির যেমন সংগ্রহ, তেমনি কালকে কবির যোগানও বটে। এ সমস্তই উপলব্ধি করা হয়। ভারতচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল প্রমুখ কবিদের রচনার বিচারে। ভারতচন্দ্রের লিপিকুশলতাই আধুনিকতা নয়; আবার রবীন্দ্রনাথ পড়ে বোঝা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কেউ তা লিখতে পারতেন না। [৮—৯]

(ঘ) বিষয়বস্তু ও রূপ

সাহিত্যের দুটি দিক বিষয়বস্তু ও প্রকাশ বা রূপায়ণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। উভয়ের মণিকাঞ্চন যোগেই সাহিত্য সৃষ্টির সার্থকতা। দুয়ের সঙ্গতিতে সৃষ্টির সার্থকতা আর অসঙ্গতিতে সৃষ্টির অসার্থকতা। বিষয়বস্তু আবার দু'ভাগে বিভক্ত হতে পারে—কথাবস্তু এবং ভাববস্তু। কথাবস্তু এক হলেও প্রকাশ কলা স্বতন্ত্র হয়। ভাববস্তু হলো বাণীর দিক; ভাববস্তু যদি যথাযথভাবে রূপায়িত না হয় তবে তা তত্ত্বমাত্রে পর্যবসিত হয়। সত্য হয় প্রকাশে আর রূপায়ণে; আর সার্থক হয় অর্থ লাভ করলে—এই অর্থেই রচনার প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত। প্রকাশ বা রূপের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে সাহিত্যকে কেউ আর্ট বলতে পারেন। প্রকাশ করাই হলো সৃষ্টির আসল রহস্য। রূপকলাকে বিশ্লেষণ করলে তার নানা দিক চোখে পড়বে—রীতি, আঙ্গিক, অলংকার-ভঙ্গি ইত্যাদি নানা কলাকৌশল। শুধুমাত্র বিশ্লেষণে সাহিত্যের মূল সত্য ধরা পড়ে না। দেহ-মনের বিচিত্র লীলাতে যে জীবন তাই সাহিত্যের বস্তু· আর তাতেই সৌন্দর্য। জীবন শুধু দেহ, বা শুধু মন নয়; সাহিত্যও তেমনি শুধু রূপ বা শুধু ভাব নয়—ভাব ও রূপের সমন্বয়। [১০—১২]

(ঙ) পরিবর্তিত মূল্যবোধ

বিষয়বস্তু ও রূপ কালে কালান্তরে পরিবর্তিত হয়। সাহিত্যের বিষয়বস্তু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রূপায়ণের পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়। আধুনিক সাহিত্যের বিচিত্র প্রকাশ—সভ্যতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবন পরিবর্তিত হয়েছে বলে সহস্রমুখী জীবনকে প্রকাশের জন্য মানুষকে বিচিত্র পথের আশ্রয় নিতে হয়েছে। পুরাতন কলাঙ্গিক সম্পূর্ণ বিদূরিত না হলেও সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর নানা অভিব্যক্তির প্রকাশ সেখানে লক্ষ্য করা যায়। কথাবস্তুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পদ্ধতিও পরিবর্তিত হয়েছে। [১৩]

(চ) মানুষের মূল্য

সাহিত্যের ভাববস্তু বেশ ভালোভাবেই পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান কালে বেদপাঠের জন্য শম্বুকের শিরচ্ছেদ হয় না। হরিজনদের প্রতি অবজ্ঞার জন্য ভূমিকম্প হয় একথা কেউ স্বীকার করেন না। শম্বুকের শিরশ্ছেদে প্রাচীনকালে রাজার সুবিচারের প্রমাণের কথা ভাবলেও, বর্তমানে একে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের, রাজশক্তির উচ্চবর্ণের মূঢ়

অবিচার রূপে ব্যাখ্যা করা হয়। অবশ্য মানুষের মর্যাদা এখনও চরম সত্যে পরিণত হয় নি—কেন না সমাজে এখনও অনেকে অচ্ছুৎ। এ সমস্ত সত্ত্বেও মানুষকে আজ মানুষের মর্যাদা দেওয়া হয়। একালের মূল্যবোধ প্রাচীনকালের মূল্যবোধ থেকে স্বতন্ত্র। পুরাতন মূল্যবোধের মৌলিক পরিবর্তনের ফলে বর্তমান কালের সাহিত্যে দেবদেবী ও ধর্মাধর্মের বোধ সাহিত্যে গৌণ হয়ে গেছে, মানুষ-পৃথিবী-জীবন মুখ্য হয়ে উঠেছে। তাই আধুনিক সাহিত্য মানুষের সাহিত্য—মানবসত্য নিয়েই আধুনিক সাহিত্য।

[১৪—১৭]

(ছ) ব্যক্তিত্বের মূল্য

মানুষের সম্বন্ধে মূল্যবোধ আধুনিক যুগে গভীর ও নিগূঢ় হওয়ায় ব্যক্তিত্বের মূল্য সাহিত্যে ও সমাজ জীবনে ক্রমবর্ধিত। আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেম প্রশংসনীয় হলেও আজ রামচন্দ্রের সীতা নির্বাসন প্রসঙ্গে অনেকেই রামচন্দ্রের কাজ উপযুক্ত হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে ব্যক্তির অধিকার শ্রদ্ধার বস্তু হয়ে ওঠায় রামচন্দ্রের প্রজানুরঞ্জনে অনেকের আর আস্থা নেই। অবশ্য সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির দাবী সমাজ প্রগতির অনুযায়ী কিনা সে সম্পর্কে বিচারের কথাও উঠেছে। বিশ শতকে মানুষ সমাজ সচেতন হয়ে ওঠায় ব্যক্তির দাবী সমাজ প্রগতির অনুযায়ী না হলে সংশয়ান্বিত হয়ে পড়ে। ব্যক্তির মর্যাদা, ব্যক্তিস্বরূপের দাবা আজ বড হয়ে উঠেছে, ব্যক্তির আত্মবিলোপ আজকের দিনে চরম নয়। আধুনিক সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত প্রেম ভালোবাসার মূল্য অনেক বেশি—এই যে পরিমাণগত পরিবর্তন তা মূল্যবোধের মৌলিক পরিবর্তন।

[১৮—১৯]

(জ) বিপ্লবী নিয়তির স্বীকৃতি

আরও অনেক নতুন মূল্যবোধ সাহিত্যে সূচিত হতে চলেছে, যা এখনও সংহত হতে পারে নি। পুরাতন সাহিত্যে মানুষ ছিল ভাগ্যের দাস—কিন্তু ক্রমশ তার সেই ধারণা কমে আসতে থাকার বলে অপ্রাকৃতে অবিশ্বাসের আবির্ভাব হচ্ছিল, যদিও নিজের উপর সম্পূর্ণ আস্থা আসে নি। জ্ঞান বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের ফলেও মানুষের মনে নৈরাশ্যবোধ সঞ্চারিত হয়েছে। বর্তমান সাহিত্যে পুরাতন কালের স্মৃতি বিধিলিপি, পরকাল ইত্যাদির পরিবর্তে বিশ্বলীলা ও বিশ্বরহস্যের ধারণা স্থান লাভ করেছে। মানুষ পূর্বাপেক্ষা অনেক সক্রিয় হয়েছে।

সুদীর্ঘকালের পরিচিত চিন্তা মানবভাগ্য সম্বন্ধে সে বুঝতে পেরেছে যে মানুষ তার ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। প্রকৃতিকে বোঝার জন্য প্রকৃতির দাসত্ব থেকে সে মুক্তি পাচ্ছে। মানবপ্রকৃতিকেও সে পরিবর্তিত, বিকশিত করতে সক্ষম হচ্ছে। মানুষ ক্রমশ উপলব্ধি করছে যে সেও সৃষ্টির অধিকারী। সৃষ্টিশক্তিতে মানুষের বিশ্বাস, তার সম্ভাবনায় আস্থা মানুষকে আজ 'বিপ্লবী নিয়তির' আবিষ্কারে সক্ষম করেছে। আধুনিক

সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই মানুষকে আবিষ্কার।

পুরাতন সাহিত্যে মানুষ নিজের মহিমা উপলব্ধি করতে পারলেও বিংশ শতাব্দীর পূর্বে মানুষ নিজেকে স্রষ্টারূপে বিপ্লবী শক্তির বাহকরূপে ভাবতে পারে নি। নবজাগরণ ও ফরাসী বিপ্লব ও শেলী-টেনিসন-হুইটম্যান-ব্রাউনিং-এর আশাবাদ সেই সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধে বিশ্বব্যাপী অবক্ষয়; বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্যায়ে পুনরায় মানুষ তার বিপ্লবী শক্তির প্রতি আস্থা জানিয়েছে; বিপ্লবী শক্তির স্বীকৃতিও এসেছে। [২০—২২]

(ঝ) মানবতাবাদ

মূল্যবোধের পরিবর্তনের ফলে আধুনিক সাহিত্যে আধুনিকতার আবির্ভাব হয়েছে। মানুষের আজ তিনটি প্রধান মূল্যবোধ—মানুষের মর্যাদাবোধ, ব্যক্তিসত্তার মুক্তি এবং মানুষের বিপ্লবী নিয়তিতে বিশ্বাস। তাছাড়াও সংঘচেতনা, বিশ্বমানবতাবাদ এবং জাতীয় আত্মবাদের আবির্ভাব ঘটেছে। আধুনিক সাহিত্যের প্রধান কথা মানবতাবাদ। [২৩]

(ঞ) প্রাচীন মানবতাবোধ

মানবতাবাদ আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হলেও প্রাচীন সাহিত্যে তা অনুপস্থিত নয়। পশ্চিমী সাহিত্যে গ্রীসীয় শিল্প-সাহিত্যে, লাতিন ও ইতালীয় শিল্প-সাহিত্যে, রেণেসাঁসে, মার্লো ও শেক্সপীয়রের সাহিত্যে মানবতাবোধের উজ্জ্বল প্রকাশ লক্ষ্য-গোচর। প্রাচ্য দেশের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেবতারা পর্যন্ত মানুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ। মধ্যযুগের অন্যতম কবি মানব বন্দনায় জয়গান উচ্চারণ করেছেন। তাহলে প্রশ্ন ওঠে—মানবতাবাদকে আধুনিক সাহিত্যের বাণী কিভাবে বলা যাবে। আসলে, আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হলো তার বাণীতে আর রূপ রচনায়। আধুনিক সাহিত্য হলো জীবন্ত মানুষের কথা, এখানে মানুষের জীবন ছন্দ প্রকাশিত। বাংলা কাব্যের জগতে বিষয়বস্তুতে ও রূপায়ণে বিপ্লব এনেছেন বলেই মাইকেল আধুনিক কবি। নভেল আধুনিক কালের ফসল—সেখানে মানুষের চরিত্র আর ঘটনা প্রধান। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের জগতে সেই আধুনিকতার পথিকৃৎ। প্রাচীন কালের কোনো কোনো সাহিত্যে একালের মানবতাবাদের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। মানবীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ বলেই সে রচনাগুলিকে একালের বলে মনে হয়। [২৪—২৭]

(ট) সহজ মানুষ ও মানবতাবাদ

মানুষ যেদিন থেকে নিজেকে প্রকৃতির থেকে স্বতন্ত্র বলে জেনেছে সেদিনই তার মধ্যে মানবচেতনার প্রকাশ দেখা গেছে। কিন্তু প্রাচীন যুগে মানুষ তার সেই শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারে নি বলে জীবন তার কাছে দেবতার লীলারূপে প্রতিভাত হয়েছে। সে নিজেকে প্রায়ই দেবতার ক্রীড়নকরূপে দেখেছে। ফলে, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত

দেশেই সাহিত্যে মানুষের পরিবর্তে দেবদেবীর কথা, ধর্মের কথা, পরলোকের কথা, অতিপ্রাকৃত শক্তির কথা কীর্তিত হয়েছে। প্রাচীন সাহিত্যের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণত লোপ পায় নি।

রামায়ণ মহাভারতেও দেবলীলাকে মানবভাগ্যের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে। চণ্ডীদাস সবার উপরে যে মানুষের সত্য হওয়ার কথা বলেছিলেন সে মানুষ সমাজ নিরপেক্ষ সুখদুঃখের অতীত মানবীয় সত্তা। সুতরাং একে আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ বলা চলে। কিন্তু আধুনিক মানবতাবাদ তা নয়—এখানে মানুষ শুধু আত্মার প্রতীক নয়; সে তার সমস্ত সুখ-দুঃখ নিয়ে, সমস্ত বাঁধন মেনে এবং সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে সত্য। অর্থাৎ আধুনিক মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ, কিন্তু সমাজ নিরপেক্ষ নয়। মধ্যযুগে মানুষের অধ্যাত্ম সত্তাই ছিল বড়। তাই চণ্ডীদাসের সহজ মানুষের সত্য নতুনভাবে উপলব্ধি করা হচ্ছে। সহজিয়া চণ্ডীদাসের মানবতাবাদকে আজ নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। [২৮ – ২৯]

(ঠ) <u>গ্রীক মানবতাবাদ</u>

প্রাচীন সাহিত্যে মানবতাবাদ থাকলেও, তা ঠিক আধুনিক কালের মত ছিল না। প্রাচীন কালের মানবতাবোধই ক্রমশ মানবতাবাদে পরিণত হয়েছে। সভ্যতার স্তরে প্রথম গ্রীসেই মানবতাবোধের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সেজন্য গ্রীক সাহিত্যকে আধুনিক বলে মনে হয়। প্রাচীন গ্রীসের দাস পরিশ্রমভিত্তিক পৌরসভ্যতা, বহির্বাণিজ্য, গণতন্ত্র ইত্যাদির ফলে জীবনযাত্রা, সামাজিক পরিবেশ ও রাষ্ট্রীয় জীবন বেশ উন্নত হয়েছিল। গ্রীসের জীবনযাত্রা মধ্যযুগে প্রায় অবলুপ্তির পথে; ইউরোপে নবজাগরণের কাল হলো গ্রীসীয় চিন্তাধারার পুনরাবিষ্কার। মধ্যযুগের ভূমিদাসভিত্তি দূর করার জন্য আধুনিক যুগের ধনিক বণিক যুগের বনিয়াদ স্থাপিত হচ্ছিল। সুস্থির সামাজিক বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে সেই সামাজিক রাষ্ট্রীয় বনিয়াদ আরও দৃঢ়তর হলো। নবজাগরণের জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়ে আধুনিক কালের আবির্ভাব হলো। চীন সমাজ পরিবারকেন্দ্রিক ছিল—কিন্তু তারা ঐতিহ্যে অনড় হয়ে থাকায় তার সামাজিক ব্যবস্থা বেশিদূর অগ্রসর হলো না। চীনা সাহিত্যও তাই নতুন পথের পথিক হলো না। ল্যু-স্যুন্ চীনা সাহিত্যে নতুন ভাবধারার জন্মদাতা।

নবজাগরণের চিন্তাজাত মানবতাবাদ প্রাচীন যুগের মানবতাবোধেরই ঐতিহাসিক পরিণতি। কিন্তু এখানে আছে গুণগত পার্থক্য—অর্থাৎ এখানে মানুষই বড়। আমেরিকা ও ইউরোপে মানুষের অধিকার ঘোষিত হওয়ার ফলে মানবতাবাদ নতুন-ভাবে রূপায়িত হলো। ফরাসী বিপ্লবের অনিবার্য ফলশ্রুতি ব্যক্তিসত্তা গণতন্ত্র ইত্যাদির আবির্ভাবের ফলে শোষণতন্ত্রের অবসানের সম্ভাবনা দেখা দিল। ইতিহাসে এর পূর্ণ রূপ লক্ষ্য করা গেল ১৯১৮-এর সোভিয়েত বিপ্লবে। [৩০—৩১]

(ভ) আধুনিক বাংলা সাহিত্য

আধুনিক কালের মানবতার বাণী সর্বদেশকালের সাহিত্যে যে সমানভাবে বিকশিত হয় নি তার কারণ সমস্ত দেশের ইতিহাস সমভাবে বিকশিত হয় নি। সোভিয়েতের মানুষ যখন বিপ্লবী নিয়তি সম্বন্ধে সচেতন, তখন ইউরোপ আমেরিকার মানুষ নিজেদের অসহায় বলে ভাবছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার মানুষ ধনতন্ত্রীয় সংকটে দ্বিধাগ্রস্ত। ভারতের মানুষ সাম্রাজ্যবাদী আওতায়, সামন্ততান্ত্রিক বোঝায় পীড়িত হলেও, সমাজ-তান্ত্রিক চিন্তা চেতনায় আকুল হয়। তাদের কাছে জাতীয় স্বাধীনতা আর ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বতন্ত্র; পরাধীনতা শাসন এবং শাস্ত্রগত অধীনতাই তাদের কাছে জাতীয় ঐতিহ্য। ফলে জাতীয় চিত্ত কখনো উল্লসিত; কখনো নিরাশায় উদ্‌ভ্রান্ত। এই অস্বাভাবিক কারণে বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন সাহিত্যের সুরকে অতিক্রম করে আধুনিকতার সুর এসেছে অতি তীব্র আবেগে। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক সাহিত্যাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে পরমার্থ ছেড়ে ঐহিকতাকে, দেবতা ছেড়ে মানুষকে সাহিত্যে স্থান করে দিলেন। ফরাসী বিপ্লবের মানবিক অধিকারের বোধ আমাদের আবেগ তাড়িত করলেও সাম্রাজ্যবাদের তাড়না সে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সুস্থির অবকাশ দেয় নি।

১৮৬০—১৯৪০ এই সুদীর্ঘ আশি বছরে বাংলা সাহিত্য তীব্র গতিতে ইউরোপের আধুনিক সাহিত্যের চারশো বছরকে অতিক্রম করতে চেয়েছে। অথচ নানা সংস্কারে বাঁধা আমাদের জীবন। পুরাতন ও আধুনিক এই দ্বিচারিতায় জীবন পীড়িত; বাংলা সাহিত্য মানুষের মূল্য ও ব্যক্তিত্বের মূল্যকে তীব্র আকুলতায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। তবে মানুষের বিপ্লবী নিয়তি আমাদের সাহিত্যে এখনো বাণীরূপ লাভ করে নি। ইউরোপীয় সাহিত্যেও তার প্রকাশ অস্পষ্ট। একমাত্র সোভিয়েত সাহিত্যে তার প্রকাশ সংলক্ষ্য, তবে তা যথাযথ নয়। ইউরোপের অনেক জাতি অপেক্ষা বাঙালী জাতির জীবনে বিপ্লবী ব্যাকুলতা উগ্র ও উত্তাল হবার সম্ভাবনা বেশি। অদূর ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্যে মানব সাম্যের ও মানুষের বিপ্লবী নিয়তির বাণী পূর্ণত প্রকাশিত হবে—মানব প্রগতির সমস্ত পথ আলোকিত হবে এক বিপ্লবী জাগরণে। মানুষ ও মানব সত্যই সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করবে। আধুনিক সাহিত্যের মূল বাণী সকলেই উপলব্ধি করতে পেরেছে। ইউরোপীয় নবজাগরণ মানুষের মহিমা বোধের উদ্বোধন ঘটিয়েছে; ফরাসী বিপ্লব মানুষের অধিকারের ব্যক্তিগত ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠাতা; আর সোভিয়েত বিপ্লব ঘটিয়েছে মানুষের বিপ্লবী যাত্রার সূচনা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই ত্রয়ী মহিমার, সত্যের প্রকাশ যতখানি ঘটেছে সেটাই মূল প্রশ্ন।

[৩২—৩৫]

●প্রবন্ধ বিশ্লেষণ:

প্রাবন্ধিক গোপাল হালদার তাঁর 'আধুনিক সাহিত্য' প্রবন্ধে মূলত আধুনিক

সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য জানতে গেলে প্রথমেই জানা উচিত আধুনিকতা কী। আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আলোচনার দৃষ্টিক্ষেত্র ঠিক করেছেন। তারপর আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়কালে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সঙ্গে তার পার্থক্য, মানবতাবাদ ইত্যাদি আলোচনা করে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার স্বরূপলক্ষণ নির্ণয়ে ব্রতী হয়েছেন। 'আধুনিক সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি যে সমস্ত বিষয় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেগুলি যথা-ক্রমে— ১. সাহিত্য ও তার বিচার ২. সাহিত্য আলোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি ৩. সাহিত্যের জন্মচিহ্ন ৪. বিষয়বস্তু ও রূপ—বিচার বিশ্লেষণ ৫. পরিবর্তিত মূল্যবোধ—মানুষেব মূল্য—ব্যক্তিত্বের মূল্য ৬. বিপ্লবী নিয়তিব স্বীকৃতি ৭. মানবতাবাদ—প্রাচীন মানবতাবোধ—সহজ মানুষ ও মানবতাবাদ—গ্রীক্ মানবতাবাদ ৮. আধুনিক বাংলা সাহিত্য।

সমস্ত প্রসঙ্গগুলি পবস্পর বিজড়িত এবং আধুনিক সাহিত্যের চারিত্র্য নির্ণয়ের জন্য প্রবন্ধকার আলোচনার পটভূমিকে বিস্তারিত করেছেন। উল্লিখিত খণ্ড আলোচনাগুলি থেকে প্রবন্ধকার আধুনিক সাহিত্যের স্বরূপ লক্ষণ সম্বন্ধে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছেন।

> ● 'আধুনিক সাহিত্য' প্রবন্ধের সূচনাতে প্রবন্ধকার সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয় ও তার বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে চেয়েছেন। এই আলোচনাটি প্রবন্ধের ভূমিকা মাত্র। মূল বক্তব্যে প্রবেশের পূর্বে সাহিত্য সম্পর্কে প্রবন্ধকার আলোচনা কবতে চেয়েছেন। সাহিত্যকে, প্রবন্ধকার, মানুষের মনের সৃষ্টিরূপে, মানসক্রিয়ারূপে অভিহিত করতে চেয়েছেন। অবশ্য একথাও ঠিক যে কোন মানসক্রিয়াই একমাত্র মানসজাত নয়, মানসক্রিয়ার পটভূমিকায় অন্যান্য অনেক সর্ত ক্রিয়াশীল থাকে। মানসক্রিয়া পদ্ধতির সৃষ্টি হয় সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে। সাহিত্য রচনার পটভূমিকায় সামাজিক দ্বন্দ্বের ক্রিয়াশীলতা বিদ্যমান থাকে। এই কারণেই হার্বাট রিড্ তাঁর 'দি ফিলজফি অব্ মডার্ণ আর্ট" গ্রন্থে বলেছেন—'Art is never transfixed, never stagnant. It is a fountain rising and falling under varying preasure of social conditions.'

সাহিত্য হলো সামাজিক ক্রিয়া। সমাজ-বিন্যাসে অর্থনীতির প্রাধান্য সমধিক বলে বিবেচিত হয়। মানুষের সৃষ্টিক্ষমতা প্রকাশিত হয় বস্তুবিশ্বের সঙ্গে সংস্পর্শে এসে। সাহিত্যে চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক চেতনার প্রতিনিধি হবে, কিন্তু ঘটনা বাধাবন্ধহীন কল্পনার বর্ণে অনুরঞ্জিত হতে পারে। এঙ্গেলসও স্রষ্টার কল্পনা শক্তিকে প্রাধান্য প্রদান করেছেন। বাস্তব অবস্থার দ্বারাই মানুষের কল্পনা ও চৈতন্য নিয়ন্ত্রিত হয়।

ব্যাপকার্থে সাহিত্য মনের ফসল এবং সেইজন্য সাহিত্যের এমন মাপকাঠি পাওয়া সহজ নয় যা সকলেই মেনে নেবে। সাহিত্যের বিচারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মাপকাঠির

প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সাহিত্য শুধুমাত্র মনের জানালা কিনা সে সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বহু তত্ত্বের ও বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে। তবে সাহিত্য যে আভ্যন্তর প্রক্রিয়া এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বহির্জগতের জিনিষপত্রের দাম ঠিক করা অপেক্ষাকৃত সহজ; অবশ্য তারও বাজারদর ওঠানামা করে। তবু বহির্জগতের জিনিষ-পত্রের কেনাবেচায় মানুষ অভ্যস্ত বলে তার একটা ব্যবহারিক হিসাব পাওয়া যায়। যে জিনিষ প্রধানত মনের সৃষ্টি তার বিচারের মাপকাঠি পাওয়া সম্ভব নয়। শিল্পসৃষ্টি বা সাহিত্যসৃষ্টি যে মানসিক ক্রিয়া একথা টলস্টয়ও স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, শিল্পসৃষ্টি হলো মানসিক ক্রিয়া। যে অনুভূতি অথবা চিন্তাধারা অস্পষ্টরূপে অনুভূত হয় তাকে এমন স্বচ্ছ ও গভীরভাবে ব্যক্ত করা হয় যা অপরের মনে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। কোনো প্রয়োজনের তাগিদে তা ব্যক্ত হয় না। টলস্টয় তাঁর 'হোয়াট ইজ্ আর্ট' গ্রন্থে বলেছেন—'It is not envoked by any material need, but supplies to both producer and recipient a special kind of so called artistic satisfaction. ***The artist should be impelled by an inner need to express his feeling.'

সাহিত্যের মূল্য মনের কাছে বলে তার কোনো ব্যবহারিক মূল্য আছে কিনা তা প্রত্যক্ষভাবে বোঝা যায় না। সাহিত্যের মূল্য মুখ্যভাবে অন্তরাবেগের কাছে; তবে যুক্তির কাছেও তার মূল্য অনস্বীকার্য নয় এবং সে মূল্য অবশ্যই গৌণভাবে। সাহিত্য ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল বলে তার কোনো সর্বস্বীকৃত মানদণ্ড গড়ে ওঠে না। একথা ঠিক যে কালে কালে সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড গড়ে উঠেছে। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ভরত, অভিনবগুপ্ত, ধনঞ্জয়, ভামহ, জগন্নাথ, রবীন্দ্রনাথ, প্লেটো, আরিস্ততল, ক্রোচে, লঙ্গাইনস প্রমুখ ব্যক্তিরা সাহিত্য বিচারের নানা মানদণ্ড স্থির করেছেন। কিন্তু কালক্রমে তা আবার পরিবর্তিত হয়েছে। এক এক সমাজে, এক এক শ্রেণীতে সাহিত্য বিচার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। সাধারণভাবে একই দৃষ্টিক্ষেত্র থেকে জীবন আলোচনা করলেও, অর্থাৎ জীবনদর্শন এক হলেও সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে সকলে একমত হতে পারেন না। আবার সাহিত্য বিচারে মনের মিল থাকলেও বিশেষ বিশেষ সৃষ্টির মূল্য সম্বন্ধে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া সাহিত্যের বাজারদরও সর্বদা ওঠানামা করে। তবে দৈনন্দিন বস্তুর বাজারদরের সঙ্গে সাহিত্যের বাজারদরের পার্থক্য আছে। কেননা, ব্যবহার্য পণ্যের বাজারদরের সঙ্গে মূল্যের সাধারণত একটা সম্পর্ক থাকে, দর জিনিষটা সম্পূর্ণত খামখেয়ালি নয়। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব মূল্যবোধ সামাজিক মনের সঙ্গে আদান-প্রদানের দ্বারা একটি স্থিরত্বে উপনীত হয়। সাহিত্য সম্বন্ধে ব্যক্তিমনের গুণাগুণের ছাপ লাগতে পারে বলে সাহিত্য বিচারের কোনো মানদণ্ডকেই চরম বলে গ্রহণ করা চলে না; সবই হচ্ছে আপেক্ষিক মূল্যনির্ধারণ। নানা মনের, নানা ধারার মিশ্রণের ফলে সাহিত্যের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ সূচক মতামত গড়ে ওঠে।

● প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে অর্থাৎ আলোচনার দৃষ্টি ক্ষেত্রে লেখক সাহিত্য আলোচনা ও বিচারের বিভিন্ন পদ্ধতির কথা বলেছেন। সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা নানা দিক থেকে চলে। কিন্তু দেশ-পরিবেশ-সমাজ-কাল-জীবন পরিবর্তিত হলে আলোচনার পদ্ধতিও পরিবর্তিত হয়। আগে সাহিত্য বিচারে 'রসের বিচারকে'ই মুখ্য বলে মনে করা হতো। 'রসের বিচারকে' এক অর্থে 'আর্টের হিসাব' বলা চলে। রসের বিচারকে, আর্টের হিসাবকে যাঁরা মুখ্য বলে মনে করেন তাঁরা শিল্পের জন্য শিল্প মতবাদে বিশ্বাসী। তাঁরা মনে করেন বাস্তব প্রয়োজনহীন সৌন্দর্যসৃষ্টি সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য। সৌন্দর্যচেতনাই হলো এর আনন্দময় আকর্ষণ। সৌন্দর্যবাদী সমালোচককে রূপবাদী সমালোচকও বলা যেতে পারে। তাঁরা সাহিত্যের শিল্পরীতি ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু ক্রমশ সাহিত্যের এই বিচার পদ্ধতি গৌণ হয়ে পড়ে এবং ঐতিহাসিক বিচারের মতবাদ সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে। ঐতিহাসিক বিচার সম্পর্কিত মতবাদ প্রসঙ্গে সকলে আবার একমত নন। ঐতিহাসিক কথাটিকে অনেকে কালানুক্রম বলেন; অনেকে বলেন বাস্তব। আবার ঐতিহাসিক বিচার যে শুধু জড় বস্তুর কালানুক্রমিক হিসাব নয়, তাও সকলের জানা। ঐতিহাসিক সমালোচনায় সমালোচকের দৃষ্টি ইতিহাস ও পটভূমিকার প্রতি নিবদ্ধ থাকে। সাহিত্য বিচারের জন্য প্রথম প্রয়োজন ভূমিবিচার। ইতিহাস, সমাজ ও জীবনের ধারার প্রভাবে সাহিত্যের বিষয়বস্তু, রূপ ও রীতির পরিবর্তন হয়। দেশ ও কালের মধ্যে ঘটনার যে আবর্তন ঘটে, তাকেই ইতিহাস বলা চলে। ইতিহাস বলতে দেশ ও কাল উভয়ের কথাই বোঝায়। সাহিত্য বিচারে ও সাহিত্যের উৎপত্তি রহস্য বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক পটভূমিকা বিশেষভাবে সংলক্ষ্য। সাহিত্য চিত্তলোকের ব্যাপার হলেও তার অবস্থানভূমি হলো ইতিহাস ও সমাজ। অবশ্য একথাও ঠিক যে, ইতিহাস-সমাজ-দেশ-কাল সাহিত্যকে সম্পূর্ণত নিয়ন্ত্রণ করে না। ইতিহাস সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাহিত্য স্বচ্ছন্দে ইতিহাসের প্রভাবকে এড়িয়ে যেতে পারে। ঐতিহাসিক কালপর্যায়ে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর মধ্যে যেগুলি মানবমনে বিস্ময়রস সঞ্চার করে একমাত্র সেগুলি সাহিত্যে স্থান লাভ করে। ইতিহাস-এর সংজ্ঞা প্রদান করতে গেলে বলতে হয়, ইতিহাস হলো চেতন-অচেতনের সংঘাত, বিকাশ, জীবনের অভিযান। সেদিক থেকে সাহিত্য হলো জীবনের বাণী। সাহিত্য শুধুই জীবনের প্রতিবিম্ব নয়; সাহিত্য থেকে জীবনও তার পরিণতির প্রেরণা ও বিকাশের আভাস অর্জন করে। সুতরাং সাহিত্যের ব্যবহারিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। জীবন যেমন সাহিত্য সৃষ্টি করে, সাহিত্যও তেমনি জীবন সৃষ্টি করে।

সাহিত্যকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আলোচনা ভিন্নমুখী হবে। সবক্ষেত্রেই কিন্তু তার একটাই মুখ—যা তার 'দক্ষিণমুখ'—'যে মুখে তার জীবনের বাণী উচ্চারিত হয়, সে মুখ থেকে দেখলেই আমরা পরিত্রাণ পাই।' লেখক এখানে উপনিষদের সেই স্মরণীয় শ্লোকটি স্মরণ করেছেন—'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ধর্ম' নামক প্রবন্ধগ্রন্থে এই প্রসঙ্গেই বলেছেন—

'হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখ কখন দেখি? যখন আমরা ধনের বিলাসে লালিত, মানের মদে মত্ত, খ্যাতির অহংকারে আত্মবিস্মৃত, যখন আমরা নিরাপদ অকর্মণ্যতার মধ্যে সুখসুপ্ত তখন? নহে নহে, কদাচ নহে। যখন আমরা অজ্ঞানের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াই, যখন আমরা ভয়ে ভাবনায় সত্যকে লেশমাত্র অস্বীকার না করি, যখন আমরা দুরূহ ও অপ্রিয় কর্মকেও গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত না হই, যখন আমরা কোনো সুবিধা কোনো শাসনকেই তোমার চেয়ে বড় বলিয়া মান্য না করি—তখনই বধে-বন্ধনে আঘাতে অপমানে দারিদ্র্যে-দুর্যোগে হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখের জ্যোতি জীবনকে মহিমান্বিত করিয়া তুলে। তখন দুঃখ এবং মৃত্যু, বিঘ্ন এবং বিপদ প্রবল সংঘাতের দ্বারা তোমার প্রচণ্ড আনন্দভেরী ধ্বনিত করিয়া আমাদের সমস্ত চিত্তকে জাগরিত করিয়া দেয়।

* * *

দারিদ্র্য ভিক্ষুক না করিয়া যেন আমাদিগকে দুর্গম পথের পথিক করে, এবং দুর্ভিক্ষ ও মারী আমাদিগকে মৃত্যুর মধ্যে নিমজ্জিত না করিয়া সচেষ্টতর জীবনের দিকে আকর্ষণ করে। দুঃখ আমাদের শক্তির কারণ হউক, শোক আমাদের মুক্তির কারণ হউক, এবং লোকভয় রাজভয় ও মৃত্যুভয় আমাদের জয়ের কারণ হউক। বিপদের কঠোর পরীক্ষায় আমাদের মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করিলে তবেই, হে রুদ্র, তোমার দক্ষিণমুখ আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে।'

সাহিত্যের সেই মুখই আমাদের আকাঙ্ক্ষিত যার দ্বারা জীবনে আসবে নবতর সৃষ্টির প্রেরণা, সাহিত্য হয়ে উঠবে জীবনের দর্শন। এইখানেই সাহিত্যের যথার্থ মূল্য নিহিত। আধুনিক সাহিত্য তাই আধুনিক কালের যেমন সৃষ্টি তেমনি এ কালের জীবনদর্শনও বটে; আমার নতুন কালের সৃষ্টির প্রেরণা এবং তার জীবনদর্শনের প্রস্তাবনাও বটে।

● সাহিত্যের মধ্যে নতুন কালের জীবনদর্শনের প্রতিফলনের সম্ভাবনার বাণী উচ্চারণ করে প্রবন্ধকার সাহিত্যের জন্মচিহ্ন অন্বেষণে প্রয়াসী হয়েছেন।

সাহিত্যের শাশ্বত আবেদন থাকলেও কালের বিচারে সাহিত্যকে আধুনিক ও পুরাতন এই দু'ভাগে ভাগ করা যুক্তিহীন নয়। মধ্যযুগের সাহিত্য তার স্বরূপ লক্ষণেই প্রমাণিত। মধ্যযুগের সাহিত্যিক মানসিকতা স্বাভাবিকভাবে আধুনিক যুগে প্রকাশিত হতে পারে না। আবার আধুনিক সাহিত্য পাঠ করলেই বোঝা যায় যে প্রাচীন বা মধ্যযুগে এ সাহিত্য রচনা সম্ভব ছিল না। ভারতচন্দ্র খুব বেশি দিনের কবি না হলেও কলাকুশলতার কবি বলে তিনি এখনো আমাদের মধ্যে গ্রহণীয়। তাঁর কাব্যে যতই লিপিকুশলতা থাক না কেন তাঁকে আধুনিক কাব্যকবিতার স্রষ্টা বলা যাবে না। বড়জোর ভারতচন্দ্রকে যুগসংকটের বা যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা যেতে পারে। ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব কাল মুঘল সাম্রাজ্যে ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের যুগে। ক্ষমতার

অপসৃয়মানতার যুগে মুঘল সম্রাটেরা বিলাসব্যসনের প্রতি অধিক পরিমাণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করায়, সেই প্রভাব সমাজমানসেও ব্যাপ্ত হয়। বাঙালীও সেই অসুস্থ রুচি কিগর্হিত বিলাসী জীবন পরিবেশ থেকে দূরে সরে থাকতে পারেনি। প্রাণ ও মনের দৈন্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাব, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং যৌন ব্যাভিচার অষ্টাদশ শতকের সংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এ যুগ শুধু যুগসন্ধির নয়, যুগসঙ্কটের কালও বটে।

ভারতচন্দ্র যদিও তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যকে 'নূতন মঙ্গল' বলে অভিহিত করেছেন, তবুও তো যুগপ্রাচীন মঙ্গল কাব্যধারার অনুসৃতি। তাঁর কাব্যে দেবখণ্ড, বন্দনাখণ্ড, নরখণ্ডে প্রথানুগ বৃত্তির অনুসরণ। ভক্তিরস তাঁর কাব্যের মূলরস না হলেও ভক্তিচেতনাকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। কবি অবিমিশ্র মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠায় অক্ষম ছিলেন এবং তাঁর মানবতাবাদ দেববাদনির্ভর মানবতাবাদ। দেবতাকে কেন্দ্র করে যুগের ধর্ম অনুযায়ী তাঁর কাব্যে রূপ-রসের আবির্ভাব হয়েছে এবং তাঁর সেই দেব-কেন্দ্রিক কাহিনীগুলি বহুযুগ অবলম্বিত লোকায়ত ধারণার অনুসৃতি।

ভারতচন্দ্র সচেতন শিল্পী হলেও তাঁর সচেতনতা কোন নতুন আঙ্গিকের জন্ম দেয় নি। কাব্য বিষয়ে তাঁর সচেতনতা বিধির মতই নিঃশেষিত এবং তিনি বোধের গভীর স্তরে প্রবেশ করতে সমর্থ হন নি। তাঁর কাব্যে রূপ-সৌন্দর্য, বাগ্-বৈদগ্ধ্য এবং বুদ্ধিবাদের জয় ঘোষণা থাকলেও প্রাণের উত্তাপ অনুপস্থিত। বহুদিন প্রচলিত মঙ্গলকাব্য রচনাধারা ভারতচন্দ্রের প্রতিভার স্পর্শে রূপসাধনার দিক থেকে পূর্ণতা লাভ করে। তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে উপকরণের সঙ্গে যুগধর্ম মিশ্রিত হলেও, নতুন যুগের ইঙ্গিত দুর্লক্ষ্য অর্থাৎ তিনি নিজেই যুগের সৃষ্টি। অষ্টাদশ শতকীয় নগর সভ্যতাকে সামনে রেখে অন্নদামঙ্গল রচিত হওয়ায় নগর জীবনের আচার-আচরণ কাব্যে স্থান পেয়েছে। এদিক থেকে কবি চলমান যুগকে ধরে রেখেছেন, যুগ প্রভাবকে অতিক্রম করে নতুন যুগের ইসারা দিতে পারেন নি। সঙ্কটের অন্ধকার তাঁর কাব্যে যতখানি সার্থকভাবে রূপায়িত, আলোকাভিসার ঠিক ততখানি অনুপস্থিত।

আধুনিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য মননধর্মিতা; প্রথাগত নীতি ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস; আধ্যাত্মিক আকাশ-চারণার পরিবর্তে প্রত্যক্ষতায় বিশ্বাস, ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, আত্মলীনতা, প্রকৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা, জগত-জীবনের মধ্যে অসীমের সন্ধান, অতীন্দ্রিয় প্রেমানুভূতি, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যচেতনা ইত্যাদি। উনিশ শতকের বাংলা কাব্যে আধুনিকতার উল্লিখিত স্বরূপগুলি ভারতচন্দ্রের কাব্যে সম্পূর্ণ ভাবে অনুপস্থিত। তাঁর আঙ্গিকধর্মে নতুনত্ব থাকলেও, আধুনিকতা নেই। আধুনিক বাংলা কাব্যের আঙ্গিকরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শব্দ প্রয়োগে সংযমবোধ, ছন্দের মুক্তি, অর্থালঙ্কারের ব্যবহার ইত্যাদি—ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই আঙ্গিকগত নতুনত্ব প্রায় অনুপস্থিত বলে ভারতচন্দ্রকে 'যুগসন্ধির কবি' বলা যেতে পারে।

মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের পূর্বে যে নজরুল ইসলামের আবির্ভাব সম্ভব ছিল না তা

নজরুলের কবিতা পাঠেই উপলব্ধি করা যায়। প্রত্যেক সৃজনশীল লেখকই তাঁর অঙ্গে যুগের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হন। এই যে যুগগত বৈশিষ্ট্য একেই প্রবন্ধকার জন্মচিহ্ন বলতে চেয়েছেন। বিষয়বস্তু এক থাকলেও ভাবগত বা চরিত্রগত রূপান্তর ঘটে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' সংস্কৃত মহাভারতের আখ্যায়িকা থেকে গৃহীত হলেও চিন্তা-চেতনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে তা প্রাচীন-যুগের মহাভারতের কাহিনী বা মধ্য যুগের কাশীদাসী মহাভারত থেকে ভিন্ন স্বাদ বহন করে আনে। এখানে কর্ণ-কুন্তীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিসত্তার উন্মোচন সমস্তই যেন আধুনিক কালকে, যুগধর্মকে অঙ্গে নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। যুগধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'শিল্পলিপি' গ্রন্থে বলেছেন—'যুগধর্ম তাহা হইলে বলিব কাহাকে? আমাদের সমগ্র সমাজ জীবনের অন্তস্তলে যত শক্তির আলোড়ন-বিলোড়ন রহিয়াছে তাহার ভিতর দিয়া একটা ধর্ম আমাদের সমাজ জীবনে নিরন্তর হইয়া উঠিতেছে। এই ধর্ম শাশ্বত এই অর্থে যে তাহার এই নিরন্তর হইয়া ওঠার ভিতরে একটা একাগ্রতা এবং অখণ্ডতা রহিয়াছে। মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আজ এ কথাটা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তাহার যে প্রবাহ তাহা জড় অন্ধই হোক্, অথবা তাহার পশ্চাতে চৈতন্যের দোলাই থাকুক, তাহা কোথাও খাপছাড়া এলোমেলো নহে; সে যখন যতটুকু হইয়া উঠিয়াছে সেই সবটুকু হওয়াই মিলিয়া-মিশিয়া একটা অখণ্ডতা লাভ করিয়াছে এবং তাহার এই সমগ্র অখণ্ডতা জুড়িয়া রহিয়াছে 'একে'র সাধনা। এই একত্ব এবং অখণ্ডত্বই হইল আমাদের ক্রমবিকশিত ধর্মের শাশ্বতত্ব। কাল-প্রবাহের প্রত্যেক অংশের ভিতর দিয়াই এই ধর্ম একটি বিশেষ পরিণতি লাভ করিতেছে, এই ক্রমপরিণতিটি একটি কাল-সীমানায় আসিয়া যখন বিশেষ হইয়া ওঠে—তখন তাহাকেই আমরা বলিব যুগধর্ম।' এই যুগধর্মকে 'পরিবেশের ধর্ম' বললে আরও যথার্থ বলা হয়। পরিবেশের ধর্মের শুধুমাত্র যুগের একান্ত ছাপ নয়, দেশ-কালের যৌগিক ছাপ, পারিপার্শ্বিকের ছাপ, পরিবারের এবং পরিবেশের গুণাগুণ প্রতিফলিত হয়। প্রত্যেক লেখাতেই এই পরিবেশ বা যুগধর্ম প্রতিফলিত হয়। সৃজনশীল লেখক কাল থেকে যুগধর্ম সংগ্রহ করেন; আবার লেখকও কালকে তা যোগান দেন। অর্থাৎ এদের সম্পর্ক পারস্পরিক আদানপ্রদানের সম্পর্ক। এককে বাদ দিয়ে অন্যের প্রকাশ সম্ভব নয়।

● সাহিত্যের জন্মচিহ্ন থাকে যুগধর্ম বা পরিবেশধর্মরূপে লেখক অভিহিত করেছেন তার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও রূপ, আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। সাহিত্যে কোনটি বড়—বিষয়বস্তু না রূপ এ প্রসঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে নানা বিচার-বিতর্ক চলছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোনো সমাধান হয় নি। বিষয়বস্তুকে content, আর প্রকাশ বা রূপায়ণের দিককে Form বলে। বিষয় ও প্রকাশ পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, একে অন্যের পরিপূরক। ক্রোচের, কাছে শিল্প ছিল 'Form' এবং 'Nothing but form'; টলস্টয়ের ঝোঁক ছিল বিষয়ের দিকে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য—'সাহিত্যে যখন কোন জ্যোতিষ্ক দেখা দেন তখন তিনি নিজের

রচনায় একটি বিশেষ রূপ নিয়ে আসেন। তিনি যে ভাবকে অবলম্বন করে লেখেন তারও বিশেষত্ব থাকতে পারে, কিন্তু সেও গৌণ, সেই ভাবটি যে বিশেষ রূপ অবলম্বন করে প্রকাশ পায় সেটিতেই তার কৌলীন্য। কোনো বিষয়ে অপূর্বতা না থাকতে পারে, সাহিত্যে হাজার বার যার পুনরাবৃত্তি হয়েছে এমন বিষয় হলেও কোনো দোষ নেই। কিন্তু সেই বিষয়টি যে একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করে তাতেই তার অপূর্বতা। * * * রসসাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম। * * * বিষয়ের গৌরব বিজ্ঞানে দর্শনে কিন্তু রূপের গৌরব রসসাহিত্যে'। রূপ ও বিষয়ের দ্বন্দ্ব সাহিত্যের জগতে সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এ প্রসঙ্গে বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য বিবেক' গ্রন্থে বলেছেন—'রূপ ও বিষয়েব দ্বন্দ্ব সাহিত্যের জগতে সুপ্রাচান কাল থেকে চলছে। কি লিখতে হবে শুধু জানলেই চলে না, কেমন কবে লিখতে হবে তা-ও জানতে হয়, একথা অ্যারিষ্টটলের সময় থেকেই স্বীকৃত হয়ে আসছে। প্রথমটিকে যদি বলি বিষয়, দ্বিতীয়টি তাহলে ভঙ্গী। বিষয় ও ভঙ্গীর পারস্পরিক সহযোগিতায় জন্ম নেয় সাহিত্য রূপ বা শিল্পরূপ। সুতরাং সাহিত্যরূপ বলতে অখণ্ড সাহিত্যকর্মকে বুঝতে হবে, পৃথকভাবে বিষয়কে বা রূপকে নয়। অথচ দ্বন্দ্ব চলছেই। একটিকে বলা হচ্ছে বহিরঙ্গ উপাদান (রূপকে) এবং অপবটিকে (ভাব বা বিষয়কে) অন্তরঙ্গ। একটিকে বলা হচ্ছে আধাব, অপরটিকে আধেয়। বিচিত্র উপমার আশ্রয়ে বিষয় ও রূপের অভিন্নতা এবং তাদের পারস্পরিক সহযোগীত্ব বোঝাতে গিয়ে কার্যতঃ কিন্তু তাদের বিচ্ছিন্নতাকেই মেনে নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে কখনও সাহিত্যিকদেব মধ্যে তীব্র রূপসচেতনতা তথা রূপকৈবল্য জন্ম নিচ্ছে, কখনও আবার বিষয়মুখ্যতা গ্রাস করছে শিল্পীর সমগ্র চেতনাকে।' বিষয়বস্তুর নির্বাচন শিল্পীব যোগ্যতানুযায়ী হলে তাকে রূপ নিয়ে ভাবতে হবে না। সুবিন্যস্ত মূর্তিতে পরিচিত শব্দ নতুন ভাবনার ঔজ্জ্বল্যে পাঠককে মোহিত কবতে পারে। কেউ কেউ মনে করেছেন, মূল সমস্যা হলো বিষয়কেন্দ্রিক। শব্দ সাহিত্যের সবকিছু না হলেও তাকে আত্মপ্রকাশের মাধ্যম বলতে হয় এবং সাহিত্যের রূপ প্রকাশিত হয় শব্দের মাধ্যমে। বাক্ এবং অর্থ সম্পর্কান্বিত হলেই সাহিত্য শ্রেষ্ঠত্বে উত্তীর্ণ হবে। পাঠকও বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করে রূপেব মাধ্যমে অর্থাৎ শব্দের সাহায্যে। টলস্টয় বার বার বিষয়বস্তুর দিকে ঝুঁকেছিলেন এবং তিনি মনে করতেন একমাত্র বিষয়বস্তুর সাহায্যেই বহু মানুষ অনুপ্রাণিত হতে পারে। আবার অনেকে মনে করেন, প্রকাশরীতি সাহিত্যের মুখ্য বিষয়। অস্কার ওয়াইল্ডও মনে কবতেন, রূপেই আছে শিল্পের প্রাণ এবং শিল্পে রূপই সর্বস্ব। অবশ্য এখানে রূপ বলতে বহিরঙ্গশোভাবর্ধক অলংকার ছন্দকেই বোঝানো হচ্ছে না, অন্তরঙ্গ রূপকেও বোঝানো হচ্ছে। বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্যেই শিল্প যে শ্রেষ্ঠ একথা ঘোষণা করে টলস্টয় বলেছিলেন, 'I understand excellence in art in relation to its subject matter'. পরবর্তীকালে মার্কসবাদী সমালোচকরাও রূপ বা রীতিকে সর্বস্ব জ্ঞান না করে বিষয়কে

মুখ্য ভূমিকা দিতে বলেছেন। তাঁরা কিন্তু পাওড, এলিয়ট. ইয়েটস্ প্রমুখের কথা মনে রাখেন নি। মার্কসবাদী সমালোচকরা শুধুমাত্র রূপসর্বস্বতায় বিশ্বাসী নন। এ প্রসঙ্গে বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে বলেছেন—'সত্যিকারের শিল্প বিষয়বস্তুর দিক থেকে সম্পূর্ণ নতুন হওয়া উচিত। যদি বিষয় নতুন না হয় তাহলে সেই সৃষ্টির মূল্য নিতান্তই নগণ্য। পূর্বে যা প্রকাশিত হয় নি, শিল্পীর উচিত তাকেই প্রকাশ করা। একই জিনিষের পুনর্নবীকরণে কারুর কৌশল বা দক্ষতা প্রকাশিত হতে পারে, কিন্তু যত সুন্দরই হোক তা সত্ত্বেও তা শিল্প নয়। এই দিক থেকে নতুন বিষয়বস্তুর রূপায়ণে প্রয়োজন হয় নতুন রূপের। সুতরাং মার্কসবাদী নতুন রূপের মূল্য বোঝেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নতুন বিষয়বস্তুর গুরুত্বও প্রতিষ্ঠিত করতে চান। রূপের মোহে বিষয়কে অস্বীকার করতে এই ধরনের রূপসর্বস্বতায় বিশ্বাসী ছিলেন না তাঁরা'। আসলে ভাব ও বিষয়বস্তুর মত রূপকেও সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য উপাদান বলা চলে। সাহিত্যে রূপ বড়ো না বিষয় বড়ো এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যরূপ' প্রবন্ধে বলেছেন 'বিষয়ের গৌরব দর্শন বিজ্ঞানে কিন্তু রূপের গৌরব রস সাহিত্যে'। এখানে রূপ কথাটা অবশ্য বিশিষ্টার্থে প্রযুক্ত হয়েছে। শিল্প যদি ভাবের রূপনির্মিতি হয় তবে শিল্পে রূপকে স্বীকার করতে হয়। রসানুকূল রূপসৃষ্টির প্রতি রবীন্দ্রনাথের যেমন সমর্থন ছিল, তেমনি বিষয়ের গৌরবে সাহিত্যকে যথার্থ মর্যাদা দিতে রবীন্দ্রনাথ বিমুখ ছিলেন না।

সাহিত্যের বিষয়বস্তু দু'ভাবে গড়ে ওঠে—কথাবস্তু ও ভাববস্তু। বিষয়ের কথাবস্তু এক হলেও ভাবের দিক থেকে তার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন – বেদব্যাস, জাতক ইত্যাদি কথাবস্তুকে রবীন্দ্রনাথ নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অনেক সময় কথাবস্তু স্বতন্ত্র হলেও ভাববস্তু এক হতে পারে। আসলে ভাববস্তু হলো লেখকের আইডিয়া বা ভাবের দিক। লেখার প্রকৃত মূল্য নিহিত থাকে তাৎপর্যে।

সাহিত্যে রূপকলা, অনেকের মতে, সৃষ্টির আসল রহস্য। রূপকলাকে বিশ্লেষণ করলে রীতি, আঙ্গিক. অলংকারভঙ্গি ইত্যাদির প্রসঙ্গ আসবে। সংস্কৃতে রস ও অলংকার নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে যে সাহিত্যের মূলতত্ত্ব ধরা পড়বে এমন কোনো কথা নেই। মানুষের শরীর গড়ে ওঠে দেহ-মন-প্রাণ নিয়ে, কিন্তু তার একটিকে জানলে সম্পূর্ণ মানুষকে জানা যায় না; তেমনি সাহিত্যেরও বিষয় বা রীতি কোনটিই বড় নয়—বিষয়, ভাব ও রীতি সব মিলিয়ে তার অস্তিত্ব। জীবনরহস্য বোঝার জন্য যেমন দেহ, মন, প্রাণ সকলকে জানা চাই তেমনি সাহিত্যকে বোঝার জন্য তার বিষয়, তাৎপর্য ও রীতিকে জানতে হবে।

৬ ● সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও রূপরীতি একই রকম থাকে না, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা পরিবর্তিত হয়। সাহিত্যে রূপরীতি ও বিষয়বস্তুর পরিবর্তন আসে সামগ্রিক জীবনে পরিবর্তিত মূল্যবোধ থেকে। মূল্যবোধের পরিবর্তনের ফলে মানুষের মূল্য, ব্যক্তিত্বের মূল্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। বিষয়বস্তু ও রূপরীতি সম্পর্কিত

আলোচনার পর প্রবন্ধকার পরিবর্তিত মূল্যবোধে—মানুষের মূল্য ও ব্যক্তিত্বের মূল্য সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। আধুনিক সাহিত্য ও প্রাচীন সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যাবে যে, বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রূপায়ণের পদ্ধতিও পরিবর্তিত হয়েছে। এটাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। কেননা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ পরিবর্তিত হলে রূপরীতিগত পদ্ধতিরও রূপান্তর ঘটবে। 'সাহিত্য নিয়মের ফল', সেইজন্য এটা অত্যন্ত সঙ্গত বলে মনে হয়। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের বৃত্ত প্রসারিত হওয়ার ফলে আধুনিক সাহিত্য সহস্রমুখী জীবনকে প্রকাশের জন্য বিচিত্র পথ অন্বেষণ করে চলেছে। ফলে, আজ আর শুধুমাত্র মহাকাব্যই জীবনপ্রকাশের একমাত্র ক্ষেত্র নয়, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ব্যতীত গদ্য ও পদ্যের অনেক নতুন ধারা কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, কাব্যনাট্য ইত্যাদি নানা রূপকল্পের আবির্ভাব সমাসন্ন হয়েছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অনুভূতি প্রকাশের জন্য নানা টেক্‌নিকের আবিভাব ঘটেছে। অবশ্য পুরাতন ভাবধারা, ভাবনাচিন্তা যে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে এমন নয়। মানুষ দেবদেবীকে মানলেও বর্তমানকালে যে আর চণ্ডীমঙ্গল লিখবে না—এ বিষয়ে সকলেই সুনিশ্চিত। কালকেতুর কাহিনীগত ভাববস্তু অর্থাৎ মানুষের দুঃখবেদনা দারিদ্র্য ইত্যাদি বিলুপ্ত হয় হয় নি—একথা সত্য, কিন্তু সাহিত্যিক আর মানবজীবনের দুঃখকে প্রকাশের জন্য মঙ্গলকাব্যের আশ্রয় গ্রহণ করবেন না। এমনকি দেবদেবীর আশীর্বাদে যে কাব্য সাহিত্য লিখিত হয় এ বিশ্বাসেও সে আর বিশ্বাসী নয়। অবশ্য প্রকাশ পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটলেও ভাববস্তু যে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়েছে এমন বলা যাবে না। তবে সাহিত্যের ভাববস্তু সম্পূর্ণত পরিবর্তিত না হলেও অংশত, শুধু অংশত নয়, বেশ ব্যাপকতমভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, এ বিশ্বাস করতে হবে। প্রাচীনকালে দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়ার জন্য, অকালে প্রজা মৃত্যুর জন্য প্রজানুরঞ্জক রামচন্দ্র শূদ্র শম্বুককে দায়ী করেছিলেন। কেননা, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের নির্দেশে তাঁর মনে হয়েছিল রাজ্যের সামগ্রিক দুরবস্থার জন্য শূদ্র দায়ী, সে বেদ পাঠ করেছে। ফলে তার শিরশ্ছেদ হলো। এই ঘটনাকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মিলিত ষড়যন্ত্র বলা যেতে পারে—যেখানে উভয়ে উভয়ের সাহায্যে সমাজের মানুষকে জ্ঞানবিদ্যার আলোক থেকে বঞ্চিত করতে চাইছে। কিন্তু মানুষের মর্যাদা বর্তমানে স্বীকৃত বলে কেউ আর উল্লিখিত তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে সাহিত্য রচনা করবে না। হিন্দুরা হরিজনদের প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করে বলে উত্তর বিহারে ভূমিকম্প হয়েছে—একথা গান্ধীজীর মত ব্যক্তি বললেও আধুনিক মানুষ বিশ্বাস করতে চাইবে না। প্রাচীনকালের মানুষ, সাম্প্রতিক অতীতের মানুষ রাম কর্তৃক শম্বুকের শিরশ্ছেদে রাজার সুবিচার লক্ষ্য করেছে; কিন্তু আধুনিক মানুষ এর মধ্যে রাজশক্তির এবং উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মূঢ় অবিচারের প্রমাণ লক্ষ্য করে। অবশ্য মানুষের মূল্য, মানুষের মর্যাদা যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে স্বীকৃত তা ঠিক নয়। তাত্ত্বিক জগতে মানুষের মর্যাদা স্বীকৃত হলেও, প্রয়োগের দিক

থেকে বিচার করলে তা এখনও অসম্পূর্ণ। কেননা, দেশে এখনও অনেক অচ্ছুত রয়েছে। এখনও জাতি-বর্ণ-ধর্ম-সম্প্রদায়ে বিভক্ত মানুষ একে অপরের প্রতি ঘৃণা অনুদারতা পোষণ করে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং অর্থনীতিগতভাবে দেশের বৃহত্তম মানুষ এখনও পশ্চাদপদ শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তো বিরাট পার্থক্য বিরাজিত। তবুও মানুষকে বর্তমানে মানুষ রূপেই মর্যাদা প্রদান করা হয়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বেদ-পাঠক শূদ্রের জন্য রাজদণ্ডের ব্যবস্থা নেই। আধুনিক মূল্যবোধ আমাদের পূর্বপুরুষের মূল্যবোধ থেকে যে অনেক স্বতন্ত্র তা বর্তমানকালের জীবনাচরণেই প্রমাণিত। এই পরিবর্তন কিন্তু শুধুমাত্র সামান্য আচার আচরণগত পরিবর্তন নয়, এই পরিবর্তন জীবনগত বলেই মৌলিক—জীবনাদর্শের ও জীবনদৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক পরিবর্তনের ফলে একালের সাহিত্যে দেবদেবীর ও ধর্মাধর্মের অবস্থান হয়েছে গৌণ; মানুষ হয়েছে মুখ্য। মানুষের সঙ্গে স্থান পেয়েছে তার জীবন আর সুখ-দুঃখে গড়া চির চেনা পৃথিবী।

মানুষের মূল্য পরিবর্তিত হওয়ার ফলে ব্যক্তিত্বের মূল্য পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আধুনিক যুগে মানুষের সম্বন্ধে মূল্যবোধ ক্রমশ গভীর ও নিগূঢ় হচ্ছে। রামায়ণের একটি দৃষ্টান্ত আলোচনা করলেই এ সত্যের উপলব্ধি ঘটবে। রামায়ণের আদর্শ রাজা রামচন্দ্র যে একপত্নী গ্রহণ করে পত্নীপ্রেমের একনিষ্ঠতার প্রমাণ দিয়েছিলেন সে বিষয়ে সংশয় নেই। কেননা সে যুগে বহু পত্নী গ্রহণই সামাজিক নিয়ম ছিল। রামচন্দ্রের পত্নীপ্রেমে একনিষ্ঠতার আদর্শ অপেক্ষা বড় ছিল প্রজানুরঞ্জনের আদর্শ—সেইজন্য তিনি বিনা দোষে সীতাকে নির্বাসন দিয়েছিলেন প্রজানুরঞ্জনের জন্য। নৃপতিরূপে রামচন্দ্র এ ব্যাপারে উপযুক্ত কাজ করেছিলেন এ সত্য মেনে নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে—রামচন্দ্রের এই কাজ কি মানুষের উপযুক্ত কাজ হয়েছিল! ব্যক্তিপ্রেম, সীতার পতিপ্রেম এসমস্ত কী রাজার রাজত্ব এবং রাজকর্তব্যের কাছে তুচ্ছ! ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ভালবাসা—অন্তরের ভালবাসা কি বাইরের সমাজের দাবীর কাছে তুচ্ছ এবং সে দাবী অযৌক্তিক। রামচন্দ্রের প্রজানুরঞ্জনে কিন্তু আধুনিক মানুষের আজ আর আস্থা নেই; ব্যক্তির অধিকারকে আজ সমাজে মান্য করা হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে ব্যক্তির অধিকার সর্বজনস্বীকৃত ও সর্বজনশ্রদ্ধেয়। একথাও অবশ্য ঠিক যে, সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির দাবীর সীমাও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। ব্যক্তির দাবী যদি সামাজিক প্রগতির অনুকূল না হয় তবে তাও সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখা হয়। কেননা এ যুগের মূলমন্ত্র—'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। বিশ শতকে মানুষ আরও বেশি সমাজসচেতন হয়ে উঠেছে বলে ব্যক্তির অন্তরের দাবিকে আর মুখ্য অংশ দেওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য এ ধারণা এখনও পরিচ্ছন্ন নয় বলে সাহিত্যে ব্যক্তিগত দুঃখবেদনাই এখনও মুখ্য ভূমিকা পায়। আধুনিক যুগ এ শিক্ষা দিয়েছে যে ব্যক্তির মর্যাদা, ব্যক্তি স্বরূপের দাবীই আত্যন্তিক সত্য, ব্যক্তির আত্মবিলোপ চরম সত্য নয়। আধুনিক সাহিত্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত প্রেম ভালবাসার মূল্য অনেক বেশি।

সাহিত্যের জগতে এই যে পরিবর্তন এ মূল্যবোধের পরিবর্তন—এ পরিবর্তন মৌলিক এবং আধুনিক সাহিত্য হলো মানবসত্যের সাহিত্য। আধুনিক সাহিত্য হলো মানুষের সাহিত্য।

৬● আধুনিক সাহিত্য মানুষের সাহিত্য হলেও, সেখানে মানবসম্পর্কিত মূল্যবোধের প্রকাশ থাকলেও, অনেক নতুন মূল্যবোধও প্রকাশিত হতে সুরু করেছে। একথা ঠিক যে, সেই নবমূল্যবোধ মানবসম্পর্কিত মূল্যবোধের ন্যায় এখনও পরিপূর্ণ আকারে সংহতভাবে জীবনে বা সাহিত্যে প্রকাশ লাভ করে নি। (মানুষের মূল্য ও ব্যক্তিত্বের মূল্যের মত তা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্বজনস্বীকৃত হয় নি।) পুরাতন সাহিত্যের পর্যালোচনায় দেখা যায় মানুষ সেখানে ভাগ্যের দাস। মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গল কাব্যগুলির আলোচনায় দেখা যায় যে মানুষ সেখানে ভাগ্যের ক্রীড়নক মাত্র; দেবদেবীর উপর—ভাগ্যের উপর—অনৈসর্গিক, অপ্রাকৃতিক শক্তির উপর সে নির্ভরশীল। কিন্তু মধ্যযুগের অস্তিমলগ্নে ও আধুনিক যুগের আবির্ভাবলগ্নে কালান্তরের সন্ধিক্ষণে তার ক্রমশ অতিপ্রাকৃত শক্তিতে অনাস্থা আসছিল, দেবদেবীর শক্তির উপর বিশ্বাস কমে আসছিল—যদিও নিজের শক্তির উপব তখনও সম্পূর্ণ আস্থা আসেনি। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, রামেশ্বরের শিবায়ন এ বক্তব্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। অবশ্য বর্তমান কালেও যে মানুষ নিজের উপর সম্পূর্ণ আস্থাবান এমন বলা যাবে না। পর পর দুটি ভয়াবহ মহাযুদ্ধে জ্ঞানবিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ দেখে মানবভাগ্য সম্বন্ধে মানুষ আরও নিরাশ হয়েছে। পারমাণবিক বোমার ব্যবহার, ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রের প্রয়োগ মানুষকে তার সভ্যতা সম্পর্কে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিচলিত, শঙ্কিত করে তুলেছে। পুরাতনকালের স্বর্গ, পরকাল, বিধিলিপি, প্রাকৃতিক নীতি, অদৃষ্ট, নিয়তিলীলা ইত্যাদির পরিবর্তে মানবজীবনে জড়বিশ্বের রহস্য সম্পর্কে, ঐহিক জীবন সম্পর্কে ধারণার সূত্রপাত হয়েছে। নশ্বর জীবনের প্রতি আস্থা, প্রাকৃতিক নির্বাচন ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণার উদ্ভব হয়েছে। মানুষ তার নিষ্ক্রিয়তার পরিবর্তে সক্রিয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছে; তবে বিশ্বরহস্যের ধারণা এখনও তার কাছে ব্যাখ্যাতীত। ফলে বিশ্বজগতের নিয়ম, তার লীলারহস্য, তার বিপুলতা এখনও সে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় নি।

(সুদীর্ঘকাল পরিচিত 'মানবভাগ্য' সম্পর্কিত চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি চিন্তা তার মনে উদিত হতে শুরু করেছে যে, মানুষ তার ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে কিনা! প্রকৃতির নিয়মাবলী উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্তির চেষ্টাও করছে। মানব প্রকৃতিও যে পরিবর্তিত, বিকশিত ও প্রকাশিত হতে পারে—এমন চিন্তাতেও মানুষ ক্রমশ অভ্যস্ত হচ্ছে। লেখকের মতে, এই হলো 'বিপ্লবী-নিয়তি' এবং এই 'বিপ্লবী-নিয়তি' হলো মানুষের নবতম আবিষ্কার। মানুষ যে সৃষ্টির অধিকারী—এ কথা সে ক্রমশ উপলব্ধি করছে এবং মানবসভ্যতার ইতিহাসে নতুন নতুন বিপ্লব তার সামনে সৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত করেছে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার, সামাজিক শক্তির নব নব সম্ভাবনা মানুষকে তার মূল্যবোধ সম্পর্কে সুস্থির করিয়েছে। মানুষের অমুরন্ত

সৃষ্টিশক্তিতে বিশ্বাস, প্রকৃতির মহারাজ্যে মানুষের অভাবনীয় সম্ভাব্যতায় আস্থা, মানুষের বিপ্লবী ভূমিকায় গুরুত্ব আরোপ—মানবসভ্যতার ইতিহাসে মানুষের সম্পর্কে এই তিনটি মূল্যবোধ সম্পূর্ণ নতুন এবং আধুনিক সাহিত্যে এর প্রকাশ সংলক্ষ্য।

পুরাতন সাহিত্যে, গ্রীক নাটকে বা শেক্সপীয়রের রচনাতেও পূর্বোক্ত 'বিপ্লবী নিয়তির' স্বীকৃতি কী নেই ? গ্রীসীয় সাহিত্য, শেক্সপীয়রের রচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে মানুষ সেইকালেও স্বীয় মহিমা উপলব্ধিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু বিশ শতকের মানুষ যেভাবে নিজেকে বিপ্লবী শক্তির প্রকাশরূপে ভাবতে আরম্ভ করেছে তা সম্ভবত পূর্ববর্তীকালে অনুপস্থিত। মানুষের নিজের মধ্যে অফুরন্ত শক্তির যে অনির্বচনীয় প্রকাশ সেই ভাবনা শুরু হলো ইউরোপীয় নবজাগরণের কাল থেকে—তারপর ফরাসী বিপ্লবী থেকে ব্রাউনিঙ্ পর্যন্ত আশাবাদের প্রোজ্জ্বল বিকাশ—উনিশ শতকে শিল্প বিজ্ঞানের বিজয়োৎসব। নবজাগরণে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিস্ময়ের সূচনা—লেখক যাকে বলেছেন 'রিনাইসেন্স' তার শব্দগত অর্থ 'পুনর্জন্ম, অথবা পুরাতনে ফিরে যাওয়া অথবা পুরাতনকে ফিরে পাওয়া। কিন্তু ভাবগত অর্থ নবজন্ম, মানে মানবমহিমা, তথা বুদ্ধি ও কল্পনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা।' নবজাগরণের ইতিহাস হলো জীবনসূর্যের পুনরোদয়ের ইতিহাস—বুদ্ধি ও কল্পনার জয়যাত্রার ইতিহাস। মধ্যযুগের শেষে নির্যাতিত ক্ষীয়মান মানবাত্মা জগৎ, জীবন, প্রেম, সৌন্দর্য সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল। তাই ক্রমশ জানতে পারল জীবনচর্যাই জীবনের উদ্দেশ্য, প্রেম-সৌন্দর্য কল্পনা-বিচারবুদ্ধির অনুশীলনই জীবনের অনুশীলন। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুগের সূত্রপাত। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের কেন্দ্রগত সত্য হলো—'Man is the measure for everything' তারপর ফরাসী বিপ্লবের তূর্যধ্বনিতে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার অনিঃশেষ জয়গান, বিধ্বস্ত বাস্তিলের কারাকক্ষ থেকে নবজন্মান্তর, প্যারী কমিউনে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার গায়ত্রীমন্ত্রোচ্চারণ। ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত শেলীর কণ্ঠে 'প্রোমিথিউস আনবাউণ্ডের' স্বপ্ন—মানুষের বিপ্লবী চেতনার দীপ্ত বিকাশ। এযুগ স্বপ্নভঙ্গের যুগও বটে। ফরাসী বিপ্লবের রাজনীতিকদের রক্তাক্ত পথ তাঁকে বেদনার্ত করেছে। ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের পর ভিক্টোরীয় যুগ—এ যুগে জড়বাদ প্রকট হয়ে উঠছিল, বহু সাহিত্যিক নিরাশায় নিমজ্জিত, ধর্মবিশ্বাসের বনিয়াদ শিথিল, উপন্যাস-গল্পরচনা ও কাব্যে ধর্মাত্মক সুর ধ্বনিত। ভিক্টোরীয় যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি টেনিসন যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক; তাঁর কাব্যে নিশ্চয়তা আর প্রশান্তি—নেই বিপ্লবের সেই উদ্দাম উতরোল সপ্তস্বরধ্বনি। ম্যাথ্যু আর্নল্ড মূলত সমালোচক—সাহিত্য সমালোচন, নৃতত্ত্বের সমালোচনা, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমালোচনা সর্বক্ষেত্রেই ম্যাথ্যু আর্নল্ড এক প্রতিধ্বনি। আর একদিকে ব্রাউনিঙের আশাবাদ ও হুইটম্যানের জীবনবাদ। টেনিসন ও ব্রাউনিঙ একই যুগে জন্মগ্রহণ করলেও উভয়ের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ পৃথক। ব্রাউনিঙ তাঁর যুগকে অস্বীকার করে রেনেসাঁসের পটভূমিকায় কাব্য রচনা করতে চেয়েছেন। তারপর উনিশ শতকে শিল্প বিজ্ঞানের বিজয়োৎসব—অবশেষে সন্ধ্যা এবং

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে নিশীথ রাত্রি, টি. এস. এলিয়টের 'ওয়েস্টল্যাণ্ডের' বিলাপ—মহাযুদ্ধোত্তর ইউরোপের ধ্বংস ও হতাশার মহাকাব্য। এলিয়টের 'ওয়েস্টল্যাণ্ডের' পশ্চাদপট প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর নৈরাশ্য, সর্বব্যাপী ধ্বংসলীলা, প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে যার প্রারম্ভ তার বিলাপ আজও সমাপ্ত হয় নি। অবশ্য এরই মধ্যে আবার মানুষের বিজয়ে আস্থা পুনরায় অর্জিত হয়েছে। তার বিপ্লবী শক্তির স্বীকৃতিও এসেছে। বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে ১৯১৭-এ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মানবসভ্যতার নতুন দিকে পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

আধুনিক সাহিত্য যে যথার্থই আধুনিক তা উপলব্ধি করা যাবে সাহিত্যে প্রকাশিত মূল্যবোধ থেকে। সাহিত্যের বক্তব্য বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখলে বোঝা যায় যে, অন্তত তিনটি বিষয়ে সাহিত্যে প্রতিফলিত মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষের মর্যাদাবোধ, ব্যক্তিসত্তার মুক্তি আর মানুষের বিপ্লবী নিয়তিতে বিশ্বাস হলো এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য যেখানে সাহিত্যের আধুনিকতা প্রতিফলিত। আলোচ্য তিনটি বিষয় ব্যতীত আরও কয়েকটি নবতম বক্তব্যের উল্লেখ করা চলে। এই নবতম বিষয়গুলি হলো নতুন সমাজসত্তা বা সংঘচেতনা, নতুন বিশ্বমানবতাবাদ, নতুন জাতীয় আত্মবাদ ইত্যাদি। এ সমস্তের মূলকেন্দ্রে বিরাজিত মানুষ—তাই মানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মানবতাবাদই আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মানবতাবাদকে আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম না বলে প্রধানতম বৈশিষ্ট্য বললেও সম্ভবত অত্যুক্তি হয় না।

মানবতাবাদ আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হলেও প্রাচীন শিল্প সাহিত্যে যে মানবতাবাদ ছিল না এমন বলা যাবে না। প্রতীচ্য সাহিত্যে মানবতাবাদের উজ্জ্বল প্রকাশ গ্রীসীয় শিল্প সাহিত্যে। প্রাচীন লাতিন ও ইতালীয়দের প্রসঙ্গেও স্মরণীয়। নবজাগরণের কালে বোকাচিয়ো সহ অন্যান্য লেখকদের কথাও মনে পড়বে। মার্লো আর শেক্সপীয়রের নাটকেও মানবতাবাদের প্রকাশ। প্রাচ্য সভ্যতার ক্ষেত্রে অন্যান্য শিল্প-সাহিত্যের কথা না জানলেও চীনা শিল্প সাহিত্যের আলোচনায় দেখা যাবে সেখানে মানবতাবাদের সুর পার্থিব, সামাজিক বিশেষত পারিবারিক। ভারতীয় শিল্প সাহিত্যের আলোচনাতেও মানবতাবাদের উজ্জ্বল প্রকাশ সংলক্ষ্য। ভারতীয়, বিশেষত বাংলাসাহিত্যে দেবতা হয়েছে প্রিয় আর প্রিয় হয়েছে দেবতা। রামায়ণ মহাকাব্যের শ্রীরামচন্দ্র অবতার হলেও তিনি স্বামী-পুত্র-রাজা রূপে আদরণীয় ও বরণীয়। রবীন্দ্রনাথও রামায়ণকে 'নরচন্দ্রমার কথা' বলেছেন। 'রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে'—এও তো রবীন্দ্রনাথেরই বক্তব্য। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ দেবত্ব সত্ত্বেও মানবীয় সম্পর্ক নিয়ে মানুষ হয়ে ভারতীয় তথা বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে সাহিত্যিকদের কল্পনায় আবির্ভূত হয়েছেন। অর্থাৎ প্রাচ্য সাহিত্যে প্রাগাধুনিক কালেও মানবতাবোধের সীমাহীন প্রাধান্য, বৈষ্ণবের গানও বৈকুণ্ঠের জন্য নয়। মধ্যযুগের বাঙালি কবির কণ্ঠে ধ্বনিত

হয়েছে মানবতাবোধের মহত্তম অভীপ্সিত বাণী—'শুনহ মানুষ ভাই /সবার উপরে মানুষ সত্য / তাহার উপরে নাই'। পৃথিবীর অন্য কোনো সাহিত্যে প্রাগাধুনিক যুগে মানবতা-বোধের এমন দ্ব্যর্থহীন বলিষ্ঠ প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে কিনা তা সন্দেহের। এমনকি আধুনিক সাহিত্যে এত বলিষ্ঠভাবে মানবতাবোধের বাণী এমন স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় নি। সুতরাং এমন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, মানবতাবাদকে আধুনিক সাহিত্যের বিশেষ বাণী বলা হবে কেন এবং প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্যই বা কোথায়? প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে মানবতাবাদের বক্তব্য পরিবেশনায় মৌলিক পার্থক্য হল বাণীতে ও রূপ রচনায়। যার ভাববস্তু ও কথাবস্তু জীবন্ত, যে মানুষের কথা মানুষী ভাষায় বলে এবং যেখানে ছন্দে জীবনের বাণী ধ্বনিত হয় তাই হলো আধুনিক। কবিতার প্রাণ যেখানে দেবদেবীর মাহাত্ম্যের পরিবর্তে সাধারণ মানুষের ভাবভাষায় জীবন্ত মানুষের ছন্দে কথা বলবে তাই হবে আধুনিক। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্রূপের কবিতা আধুনিক হলেও, 'বৃত্রসংহারে'র কবিরূপে ততখানি আধুনিক নন। 'সারদামঙ্গলে'র কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ও 'মহিলা' কাব্যের কবি সুরেন্দ্রনাথ সম্ভবত হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্র সেন অপেক্ষা আধুনিক। বিহারীলালের কবিতার সুস্পষ্ট যুগনির্দেশক বৈশিষ্ট্য হলো আত্মভাবের উদ্বোধন। আধুনিকতার প্রসঙ্গে মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের নাম স্মরণীয়। 'ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টিতে তীব্র আবেগ অনুভূতি উদ্বোধনে, উদাত্ত চরিত্র পরিকল্পনায়, ঘটনার নাটকীয় বিন্যাসে, দৃঢ়পিনদ্ধকায় গঠননৈপুণ্যে, কল্পনার ব্যাপকতায় ও গভীরতায়, আবেগ উচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রণে ও স্বতঃস্ফূর্ত মানবিক রস উৎসারণে' মধুসূদন বাংলা কবিতায় আধুনিকতার প্রথম প্রবক্তা। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে গভীর জীবনবোধ, জীবনজিজ্ঞাসা, ঘনীভূত অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধির সারাৎসার আর সৃজনীকল্পনার সাহায্যে জীবনের রূপ গড়ে তোলা—তাই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা। আধুনিক কালে যখন মানুষ ব্যক্তি হিসাবে গণ্য তখনই উপন্যাসের আবির্ভাব। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে সেই উপন্যাস শিল্পের জন্মদাতা। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার গুণে আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি মানুষের রূপায়ণে উপন্যাসের কারুশিল্প আয়ত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কালে সুরু হয়। মধ্যযুগের মুকুন্দরামও কথাসাহিত্য রচনা করেছেন, চরিত্র সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের বৈচিত্র্য উপলব্ধি করেছেন—কিন্তু উপন্যাসের রূপাবয়ব ও গদ্যভাষা তাঁর অনায়ত্ত ছিল বলে তাঁকে ছন্দোবন্ধনের সাহায্য নিতে হয়েছিল। মানুষকেন্দ্রিক আধুনিকতার স্বাক্ষর প্রাচীন গ্রীসীয় ও লাতিন সাহিত্যে বিরল নয়।

প্রকৃতি থেকে মানুষ যেদিন স্বতন্ত্র হলো তখন থেকেই তার সৃষ্টিতে মানবচেতনার স্বাক্ষর সংলক্ষ্য হলো। কিন্তু প্রাচীনকালে মানুষ নিজের শক্তির বা মর্যাদার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে নি। সে নিজেকে দেবতার ক্রীড়নকরূপে দেখেছে, জীবনের অর্থ তার গোচরে এসেছে দেবতার লীলারূপে। প্রায় সমস্ত দেশেরই প্রাচীন সাহিত্যে মানুষের পরিবর্তে দেবদেবীর, ধর্মের, পরলোকের ও অতিপ্রাকৃত শক্তির কথা; মানুষের

নামেও দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে এবং এটাই সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন সাহিত্যের এই সাধারণ লক্ষণ এখনও বহু সাহিত্যে বিরাজিত।

মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যে অস্ফুট মানবতাবোধের সূক্ষ্মতর প্রকাশ ঘটেছে। চণ্ডীদাস সহজিয়া মতবাদের দৃষ্টিতে সে মানুষকে সবার উপর সত্য বলেছেন, সে মানুষ সমস্ত সুখদুঃখের অতীত মানুষরূপে, সমাজ সম্পর্কের অতীত সত্তারূপে যতখানি সত্য সামাজিক মানুষরূপে ঠিক ততখানি সত্য নয়। অর্থাৎ এখানে মানুষের সুখদুঃখ সমাজনিরপেক্ষ একটি নির্বিকল্প অস্তিত্ব কল্পিত হয়েছে। এ মানুষ পরমাত্মার স্বাক্ষর স্বরূপ মানবাত্মা—নির্গুণ নির্বিশেষ শুদ্ধসত্ব আত্মা। এ মানুষ দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ তুচ্ছতা ইত্যাদির মধ্যে আবদ্ধ সামাজিক মানবসত্তার অস্তিত্বে বিরাজিত নয়। মধ্যযুগের সহজিয়া ও ভক্তিসাধকদের দৃষ্টিতে প্রতিফলিত মানবতাবাদকে আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ বলা যেতে পারে। কিন্তু আধুনিক যুগের মানবতাবাদ আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ নয়। আধুনিক যুগের মানুষ বস্তুজগতের নশ্বর মানুষরূপেই মানুষকে স্বীকার করে নেয়; আত্মার প্রতীকরূপে মানুষকে স্বাকার করে না। মানবীয় সম্পর্কের জন্যই মানুষ সত্য, সে তার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সামাজিক বন্ধন এবং মুক্তি সমস্ত মেনেও সত্য। আধুনিক মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ; কিন্তু সে সামাজিক মানুষ। মধ্যযুগের সাধকদের কাছে মানুষ তার আধ্যাত্মিক সত্তায় সত্য, সামাজিক সত্তায় সত্য নয়। আধুনিক কালে মানুষের মহিমা উপলব্ধির সময়ে চণ্ডীদাসের সহজ মানুষের সত্যকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়।

প্রাচীন সাহিত্য বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, প্রাচীন সাহিত্যে মানবতাবোধ থাকলেও মানবতাবাদের এমন প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় নি। প্রাচীন-কালের মানবতাবোধ ক্রমশ মানবতাবাদে পরিণতি লাভ করেছে এবং সাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বসাহিত্যে সম্ভবত সর্বপ্রথম গ্রীক সাহিত্যে মানবতাবোধের স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় এবং তার ফলেই গ্রীসীয় সাহিত্যকে আধুনিক বলে মনে হয়। গ্রীক সাহিত্যকে আধুনিক মনে হওয়ার অন্যতম কারণ হলো তার সামাজিক-রাষ্ট্রীয় পরিবেশ, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি অত্যন্ত উন্নত ধরনের ছিল। সেখানে ছোট ছোট শহরে পৌরসভ্যতা, বহির্বাণিজ্য, গণতন্ত্র, কাঞ্চন-কৌলীন্য ইত্যাদি ছিল; যদিও এ সমস্তই দাসপরিশ্রমের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ গ্রীসায় সভ্যতা রাষ্ট্রনৈতিক পরিভাষায় ছিল পরশ্রমজীবী সভ্যতা। এদিক থেকে দেখলে গ্রীক সভ্যতার বনিয়াদ আধুনিক সভ্যতার মতই ছিল। ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে গ্রীসীয় সভ্যতার ন্যায় সভ্যতা স্থাপিত না হওয়াতে গ্রীক সাহিত্য-সভ্যতা-শিল্প-সংস্কৃতির চিন্তায় আধুনিকতার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। নবজাগরণের কালে সেই গ্রীক চিন্তাই পুনরাবিষ্কৃত হলো, সভ্যতার ভূমিদান ভিত্তি দূর করবার জন্য আধুনিক বণিক্ ও ধনিক্ সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে সুরু করলো। নবজাগরণের পরবর্তী-কালে বণিক্ ও ধনিক্ সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বনিয়াদ দৃঢ়তাকে

স্থাপিত হলো। বিজ্ঞানের আবিষ্কার আর প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার তাকে আরও সুদৃঢ় করলো। নবজাগরণের জ্ঞানবিজ্ঞানসহ আধুনিক কাল আবির্ভূত হলো। তাই নবজাগরণ বা রেনেসাঁসকে আধুনিককালের প্রথম সোপান বলা হয়েছে। 'ইউরোপে যেখান থেকে আধুনিক যুগের শুরু হল সেই রেনেসাঁসকে বলতে পারি আধুনিকতার প্রথম ধাপ। সেইখান থেকে যাত্রা করে পর পর অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে তবে আমরা আজকের আধুনিকতার ধাপে এসে ঠেকেছি। এই যে আধুনিকতার প্রথম ধাপ, যাকে আমরা বলি রেনেসাঁস, সব দিক থেকে সেটি সংস্কৃতির খুব উজ্জ্বল ধাপ। সৃষ্টিতে মননে-কর্মে নানা দিকে—চিত্রকলায় সাহিত্যে দর্শনে বিজ্ঞানে এই ধাপে একই সঙ্গে আমরা নানামুখী বিকাশের সাক্ষাৎ পাই। এই ধাপেই সাক্ষাৎ পাই যুক্তিবাদ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য মানবমুক্তির আদর্শের; সাক্ষাৎ পাই অভিনব মানবতন্ত্রী জীবনদর্শনের। আধুনিকতার এই প্রথম অর্থাৎ রেনেসাঁসী ধাপে ইউরোপীয় চিত্রকলায় বতিচেলি লিওনার্দো, মিকেলাঞ্জেলো, রাফায়েল। এই রেনেসাঁসের ধাপেই দর্শনে মননে পিকো দে লা, মিরান্দোলা, এরাজমুস, ফ্রান্সিস বেকন। বিজ্ঞানে কোপারনিকাস, কেপ্‌লার, গ্যালিলিও; সাহিত্যে তেমনি এই ধাপেই পেত্রার্ক, রাব্‌লে, সার্ভান্তিস্‌, শেক্সপীয়ার।'

এই প্রসঙ্গে চীনদেশের কথাও উচ্চারিত হয়। কিন্তু চীনদেশের সভ্যতার প্রসঙ্গে বলা চলে যে, কনফুসীয় যুগ থেকে সুস্থ ঐহিক দৃষ্টিতে সমাজবোধ স্থান পেলেও চৈনিক সমাজ পরিবারকেন্দ্রিক হওয়ায় তা বেশি প্রসার লাভ করতে পারে নি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কাগজ ও বারুদ আবিষ্কার ব্যতীত চীনের সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার তেমন প্রসার ঘটে নি। চীনা সমাজ তার স্থবিরতা, সংস্কার ও রক্ষণ-শীলতার জন্য পুরাতন ঐতিহ্যে অনড় হয়ে থাকার ফলে সেখানে মানুষের মূল্যবোধ জাগ্রত হলো না, ব্যক্তিত্ব ও গণতন্ত্রবোধের স্ফুরণ ঘটলো না। চীনা সাহিত্যেও তার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হলো। চৈনিক সাহিত্যক্ষেত্রে ল্যু স্যুন্ সেই অচলায়তন ভেঙে নতুন চীনের জন্ম সম্ভব করলেন।

[ল্যু স্যুন (১৯০১—'৩৬) 'যৌবনে দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরে বিপ্লবী গণতান্ত্রিকের পথ দিয়ে চলতে চলতে এবং শেষে মার্কসবাদীতে পরিণত হওয়ার পথে তিনি প্রকাশ করেন এক অনবদ্য সাহিত্য প্রতিভা আর লিখে যান বহু অন্তর্ভেদী সংগ্রামশীল ও উদ্দীপনাময় রচনা। নিপেষিত চীনা জনগণের মুক্তি আন্দোলনের বিপ্লবী সংগ্রামে এই সব রচনা এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সামন্তবাদী এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর সাহিত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাঝে, সাম্রাজ্যবাদীদের দাসত্বমনোভাব এবং সামন্ততন্ত্রের প্রাচীন ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাঝে লু স্যুন আধুনিক চীনের সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী সাহিত্যের জন্য এক পথ উন্মুক্ত করেন। তিনি চীনের চিরায়ত সাহিত্যের সুন্দর সাহিত্যের একজন উত্তরসাধক আর সেই সঙ্গে এক নতুন সাহিত্যের ভিত্তিস্থাপকও ঘটে'।—লু স্যুন: জীবনী ও সাহিত্য—সেন বালান।]

প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক সাহিত্যে মানবতাবাদের ধারাবাহিক প্রকাশ লক্ষ্য করে বলা যেতে পারে যে, নবজাগরণের কাল থেকে যে, মানবতাবাদের বলিষ্ঠ এবং স্পষ্ট প্রকাশ হলো তা প্রকৃতপক্ষে প্রাচান যুগের মানবতাবোধেরই ক্রমিক সুষ্ঠু পরিণতি –ঐতিহাসিক পরিণতি। তবে আধুনিককালের মানবতাবোধের সঙ্গে প্রাচীনকালের মানবতাবোধের পার্থক্য কালগত এবং গুণগত। মানব সমাজের নতুন স্বপ্নে উদ্বোধিত মানুষ দেখলো মানুষের অপার সৌন্দর্য আর সাহস। আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের পরিবর্তে এলো বস্তুজগৎ কেন্দ্রিক মানবতাবাদ। আমেরিকা ও ইউরোপের ঐতিহাসিক ভূমিকা সেখানে সঞ্চার করলো বিদ্যুৎসঞ্চারী গতি—ঘোষিত হলো মানুষের অধিকার—ফরাসী বিপ্লবে সেই বাণী পূর্ণতর মহিমামণ্ডিত হলো, যদিও তার সূচনা হয়েছিলো ইংলণ্ড আমেরিকায়। ১৭৮৯-এর ঘোষণায় ব্যক্তিস্বাধানতার দাবা স্বাকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রেরও দাবী স্বীকৃত হলো। আধুনিক সাহিত্য নতুন সত্যকে রূপায়িত করলো—মানবতাবাদ, গণতন্ত্র আর ব্যক্তিসত্তা-বোধের প্রশস্ত অঙ্গনে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য উত্তীর্ণ হয়ে আরও একটি নতুন জীবনজিজ্ঞাসার সম্ভাবনায় মানুষ নতুন সত্য ও চেতনার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। সেই নবচেতনা হলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও গণতন্ত্রের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য শোষণতন্ত্রের অবসান। শোষণতন্ত্রের অবসানের বাণী ঘোষিত হয়েছে ১৯১৮ এর সোভিয়েত বিপ্লবে। সেই বিপ্লবের মহত্তী সত্যে প্রতিফলিত হয়েছে ইতিহাসের নবীনতম সত্য -মানুষ বিপ্লবী শক্তির অধিকারী, কারণ সে সৃষ্টিধর্মী—সে নিজের চেষ্টায় নিজের জীবন গঠন করে নিতে পারে। সেই বিপ্লব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য—'এদের এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী। আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে। * * * দুঃখী আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট করে দেখতে পাচ্ছে। * * * আজ অত্যন্ত নিরুপায়ও অন্তত সেই স্বর্গরাজ্য কল্পনা করতে পারছে যে রাজ্যে পীড়িতের পীড়া যায়, অপমানিতের অপমান ঘোচে।'

● প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক সাহিত্যে মানবতাবাদের বিকাশ পর্যালোচনার পর প্রবন্ধকার আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রকাশ কতখানি তা আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনার ভূমিকারূপে আধুনিক সাহিত্য ও প্রসঙ্গত সমকালীন সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত। এবং তারও আগে আধুনিকতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয়ও কর্তব্য হয়ে পড়ে—যা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম। কডওয়েল তাঁর 'ইল্যুশন এ্যাণ্ড রিয়ালিটি' গ্রন্থে বলেছেন—'When we use the world 'modern' in a general sense we use it to describe a whole complex of culture which developed in Europe and spread beyond it from the fifteenth

century to the present day···This complex rest on economic foundation. The complex itself is changeful.'

আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্ণয় অত্যন্ত দুরূহ এবং আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্ণয় করা গেলেই আধুনিক সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্ণয় করা যাবে। মানবসভ্যতার দিক পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনজনিত ক্রান্তিকালীন নির্দেশ আধুনিকতার স্বরূপ নির্ণয় করে, আধুনিক শব্দটি বিষয়গত এবং রূপগত উভয় দিকের প্রতি নির্দেশ করে। শুধুমাত্র বাঁক নেওয়াটাই আধুনিকতা বলে গণ্য হতে পারে না। কেন না, বাঁক নেওয়ার ঝোঁকটাও কোন দিকে তা অবশ্য বিচার্য। আধুনিকতা শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সামগ্রিক অভিধাবাচক, সভ্যতার স্তর পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের প্রকাশগত ও ভাবগত স্তর পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তমানতার চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করাই হল সাহিত্যের আধুনিকতা। সাহিত্যের আধুনিকতা কোন একটি বিশেষ দেশকালের বিষয় নয়, সাময়িককালের তাৎক্ষণিকতাও নয়। যেহেতু সাহিত্য শিল্প-সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়, সেইজন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তমানতা কবিতার অঙ্গে অঙ্গে প্রকাশিত হয়। তবে সমাজ-আর্থ-রাজনীতিক পরিবর্তমানতার ক্রান্তি নির্দেশক বৈশিষ্ট্যগুলি যে অত্যন্ত স্থূলভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত হবে, তা অবশ্যই নয়। আর এখানেই সমকালীনতার সঙ্গে আধুনিকতার পার্থক্য। অবশ্য সমকালীন হলেই সাহিত্য আধুনিক হবে—এমন কোন কথা নেই, তবে আধুনিক সাহিত্য অবশ্যই সমকালীন ইতিহাসের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি। ইংরেজিতে যে অর্থে 'Modern' ও 'Contemporary' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়, বাংলায় ঠিক সেই অর্থে শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয় না।

'আধুনিক শব্দটির সাথে কালগত সম্পর্ক থাকলেও বস্তুতঃ কাব্য বিচারে এর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যই বিচার্য; কারণ কালপরম্পরায় আধুনিকতার এমন কোনো বৈশিষ্ট্য সন্ধান সম্ভব নয়, যা একটি সীমাবদ্ধ সময়-পরিধির মধ্যেই মূর্ত হয়েছে। সুতরাং এক অর্থে সমকালীনতাকে আধুনিকতা বলে ধরে নিলেও এর চারিত্র্য বৈশিষ্ট্যের দাবী খারিজ হয়ে যায় না। উপরন্তু প্রকৃতি ও চরিত্রের দিক থেকে আধুনিক কথাটির ব্যবহার নানা দিক থেকেই অর্থবহ এবং ব্যঞ্জনাধর্মী। সুতরাং যে কোনও রচনাকে কালগত অর্থে আধুনিক বলে চিহ্নিত করলেও চরিত্র লক্ষণের দিক থেকে তা যদি পুরানোগন্ধী হয়, তা হলে শুধুমাত্র কালগত কারণেই তা আধুনিকতার দাবীদার হতে পারে না। কালপরিধির বিচারে আধুনিক রচনা বস্তুতঃ এ কালেরই সৃষ্টি, কিন্তু এর চারিত্র্য লক্ষণ শুধুমাত্র সমকালীন সময়ের পরিচয়ই বহন করে না, উপরন্তু আধুনিকতা এমন কিছু গুণান্বিত হয়ে প্রকাশ পায় যা চারিত্র্য ধর্মের আধুনিক। এই বিশেষ ধর্ম এবং চারিত্র্যই রচনাকে অন্যান্য যুগের বা সময়-পরিধির সৃষ্টি থেকে পৃথক করেছে এবং সমকালীন জীবনের অন্বয়ধর্মী করে তুলেছে। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে অবশ্য আধুনিকতা সময়-কাল নির্ভর, কারণ রচনার মৌল প্রেরণা বা আবেদন সময়ের পরিবর্তনের সাথে

সাথে ভিন্ন রূপ ধারণ না করলেও রচনার আঙ্গিক বিবর্তন সমকালধর্মী। কিন্তু আধুনিকতার বিচারে আঙ্গিক বিবর্তন সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলেও আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যই আধুনিকতার একমাত্র লক্ষণ নয়. এ কারণেই আধুনিক বিষয়বস্তুর পরিবাহক না হয়ে আধুনিকতার আঙ্গিক যদি মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনার বাহক হয় তা হলে তাকে আধুনিক রচনার কোনও মানদণ্ডেই উত্তীর্ণ বলা যাবে না। সুতরাং সাহিত্যে আধুনিকতার প্রশ্নটি এ দৃষ্টিকোণ থেকেই সতর্ক পর্যালোচনার অপেক্ষা রাখে, কারণ আধুনিকতার চারিত্র্য নির্ণয়ের বিভ্রান্তি মূলতঃ আধুনিক রচনার মূল্য নির্ণয়ের প্রশ্নটিকে জটিল করে তুলবে এবং মূল্যবোধকে করবে খণ্ডিত। এ কারণে কোন রচনায় আধুনিকতা নির্ণয়ের প্রশ্নে 'আধুনিক' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সাথে উল্লিখিত রচনার চরিত্রগত সাধর্ম্যের অনুসন্ধানই সম্ভবতঃ প্রকৃষ্ট উপায়। এ অনুসন্ধানের পেছনে আধুনিক চরিত্রের পটভূমি বিশ্লেষণও অত্যাবশ্যক।'

আধুনিক কথাটার স্থির অর্থ আছে, নির্দিষ্ট চারিত্র্য আছে, তাৎপর্যময়তা আছে, না হলে আধুনিক শব্দটা এত গুরুত্ব পেতো না। আধুনিকতার প্রত্যয় হলো সমাজতত্ত্ব বা ইতিহাসেব প্রত্যয়। আসলে আধুনিক শব্দটা বর্তমানে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত। এর মধ্যে ধারাবাহিকতাও যেমন আছে, তেমনি পরিবর্তমানতাও আছে। তবে পরিবর্তমানতা অধিকতর সত্য। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতিতে 'মডার্নিজম' একটা বিশিষ্ট অর্থের পারিভাষিক শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক কথাটার মধ্যে যুগোপযোগী ইঙ্গিত আছে, একটা নতুন দৃষ্টির ইঙ্গিত আছে, একটা নতুন কালের ব্যঞ্জনা আছে। এই খানেই আধুনিকতার সঙ্গে সাম্প্রতিকতার পার্থক্য। এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা' গ্রন্থে বলেছেন—'আধুনিক আর সাম্প্রতিক এই কথা দুটির আক্ষরিক অর্থ বা অভিধানগত অর্থ একই, কিন্তু প্রয়োগগত অর্থ কিছু পৃথক, কথা দুটির ব্যঞ্জনা কিছু ভিন্ন। যা সম্প্রতি কালের, যা অধুনার, এখনকার, তাই সাম্প্রতিক। কিন্তু আধুনিক বললে আরো কিছু বোঝায়। সাম্প্রতিক শুধু কালগত অর্থেই আধুনিক, গভীর কোনো অর্থের ইঙ্গিত সাম্প্রতিক কথাটায় নেই। কিন্তু আধুনিক কথাটার তা আছে। * * * আধুনিক মানেই সাম্প্রতিক, কিন্তু সাম্প্রতিক মানেই আধুনিক নয়। আধুনিকের মেজাজ আলাদা, মর্জি আলাদা। আধুনিক কথাটায় মধ্যে একটা যুগোপযোগিতার ইঙ্গিত আছে, একটা নতুন মূল্যের ব্যঞ্জনা আছে। যে সাম্প্রতিক মেজাজে মর্জিতে আলাদা, যে সাম্প্রতিক একটা নতুন মূল্যবোধ, একটা নতুন মূল্যবান সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, সেই অভিনব সাম্প্রতিকই যথার্থ আধুনিক। * * * নতুন মূল্যবোধ আকাশ থেকে পড়ে না। * * * সেই ইতিহাসের সন্তান। তার জন্ম ভিতরে ভিতরে অনেক প্রস্তুতি চলে। * * * প্রত্যেক আধু-নিকতা একদিকে যেমন একটি যুগান্তের পালা, অন্যদিকে তেমনি একটি নবযুগেরও পালা। * * * বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার জন্ম হয়েছে বাঙালি মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। তার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রসারের মধ্য থেকে। * * * পাশ্চাত্ত্য

রেনেসাঁসের মানবমুক্তির আদর্শ, এই যে জ্ঞানালোকিত জীবনচর্যার টান, বিজ্ঞান নিয়ন্ত্রিত জীবনের আকাঙ্ক্ষা, এই সবের মধ্যে যে সামগ্রিক জীবনাদর্শ ক্রিয়াশীল, আধুনিক সাহিত্যে সেই জীবনদর্শনেরই প্রকাশ ঘটে। যে সাহিত্যে এই আধুনিক জীবনদর্শন অভিব্যক্ত, তাই আধুনিক সাহিত্য।' উল্লিখিত বক্তব্য থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় 'আধুনিক সাহিত্য আধুনিক মানুষের বা আধুনিক মনেরই আত্মপ্রকাশ। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এই আধুনিকতার আত্মপ্রকাশ কতখানি ঘটেছে তা বিচার্য। অবশ্য সবদেশের সাহিত্যেই যে আধুনিক কালের বাণী-মানবতাবাদ, সমাজ চৈতন্য ইত্যাদি সমভাবে বিকশিত হয়েছে এমন বলা যাবে না। সোভিয়েত দেশের মানুষ যখন 'বিপ্লবী-নিয়তি' সম্বন্ধে সচেতন তখন পশ্চিম ইউরোপের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থিত মানুষ নিজেদের অভিশপ্ত ভাবছে। সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদী দেশের সন্মুক্ত মানুষের চেতনা ধনিকতন্ত্রী সংকটে দ্বিধাগ্রস্ত। জাতীয় স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা আমাদের কাছে স্বতন্ত্র, পরাধীনতা, শাসন আর শাস্ত্রাধীনতাকে আমরা জাতীয় ঐতিহ্য মনে করি। ফলত কখনও আমাদের জাতীয় জীবনে উল্লাসের কলরোল, আবার কখনো বা নিরাশার কালিমালাঞ্ছিত বেদনা। এই সমস্ত অস্বাভাবিক কারণে আমাদের সাহিত্যে প্রাচীন সাহিত্যের স্তরকে অতিক্রম করে আধুনিকতার স্পন্দন এসেছে এক অসাধারণ তীব্র আবেগে। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের করস্পর্শে। আধুনিক সাহিত্যাদর্শে বিশ্বাসী মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র দেবতার পরিবর্তে সাহিত্যে ঐহিক মানুষের জয়গান উচ্চারণ করলেন। ফরাসী বিপ্লবের 'মানব অধিকার বোধ' তীব্র আবেগে সাহিত্যকে প্লাবিত করলেও, বস্তুগত জীবনে তার কোনো সুস্থির পরিবেশ রচিত হলো না। সাম্রাজ্যবাদের তাড়না আমাদের সমাজে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করে নি—ফলে সাহিত্যেও সুস্থ বিকাশ ব্যাহত হয়েছে।

১৮৬০—১৯৪০ এই সুদীর্ঘ আশি বছরে বাংলা সাহিত্য তীব্রগতিতে প্রায় চারশ বছরের আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের নানা স্তরকে অতিক্রম করতে চেয়েছে। বাংলা সাহিত্যে নব্যমানবতাবাদ, ব্যক্তিত্বের জাগরণ, ব্যক্তিত্বের মূল্য, ঐহিক জীবনের জয়গান অসাধারণ দ্যুতিময়তায় প্রকাশিত; আধুনিক বাংলা সাহিত্য যে কোনো দেশের আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে সমান্তরালভাবে পাল্লা দিতে পারে বা তার থেকেও প্রাগ্রসর। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, বাস্তব জীবনে কিন্তু সাহিত্যের আদর্শকে স্থাপিত করা সম্ভব হয় নি; এখনও বিশাল জনগোষ্ঠী দরিদ্র সীমার নীচে, অজ্ঞানতা অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত। ইউরোপের বহু সাহিত্যের ন্যায় বাংলা সাহিত্যেও 'বিপ্লবী-নিয়তি' যথাযথ বাণীরূপ লাভ করে নি। সোভিয়েত সাহিত্যেও যে সম্পূর্ণতা প্রকাশিত এমন বলা যাবে না। তবে বাঙালি জীবনে বিপ্লবী ব্যাকুলতা অত্যন্ত উগ্র বলে অদূর ভবিষ্যতে তা উত্তাল হয়ে প্রকাশিত হবে। সাহিত্যে মানবসাম্যের বাণী ও বিপ্লবী নিয়তির বাণী প্রকাশিত হবে। মানব প্রগতির সমগ্র পথ আলোকিত হবে

বিপ্লবী জাগরণে। আধুনিক সাহিত্যের বাণীকে ইতিহাসের তিনটি বড সমুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়—যার দ্বারা আধুনিকতার ক্রমবিকাশও চিহ্নিত হতে পারে। ইতিহাসের এই তিনটি সমুত্থান হলো রেনেসাঁস বা নবজাগরণে মানুষের মহিমা বোধেব উদ্বোধন, ফরাসী বিপ্লবে মানবাধিকারের ব্যক্তিগত ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা আব সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে মানুষের বিপ্লবী জয়যাত্রার অপরিম্লান সূচনা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মানুষের মহান স্বীকৃতি ঘটেছে কিনা, মানবসত্তা ব্যক্তিমহিমা ও জাতীয় স্বাধীনতার বাণী সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে কিনা তাই সংলক্ষ্য। কেননা এদেব যথাযথ রূপায়ণের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতা প্রমাণিত হবে। যুগেব সাধারণ সত্য ও বিশিষ্ট সত্যকে প্রকাশ করাতেই সাহিত্যের আধুনিকতা নিহিত। দুই সত্যই দেশ কাল সমাজ ও ইতিহাসেব সঙ্গে যুক্ত। মানুষের চিরকালীন সত্য আব মানুষের নিজের কালেব সত্য সাহিত্যে রূপায়িত হয়। সাহিত্যে আধুনিকতার সন্ধান হলো নিজের কালেব সত্যেব সন্ধান। সাহিত্য হলো সেই দর্পণ যেখানে দ্রুত ধাবমানকাল পবিবর্তনশীলতার নানা চিত্রকে প্রতিফলিত করে। এ যুগের বাংলা সাহিত্যেব দ্রুতধাবমানকালেব পরিবর্তনশীলতাব চিত্র প্রকাশের উপরে, কালোপযোগী থেকে ভাবাকালেব অভিমুখী হওয়াব উপরেই তাব আধুনিকতা নির্ভরশীল।

রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক : বুদ্ধদেব বসু

[বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮ '৭৪) 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধটি প্রথম লিখিত হয় ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে এবং 'সাহিত্যচর্চা' (১৩৬১) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'প্রবন্ধ সংকলন' (১৯৬৬) গ্রন্থেও প্রবন্ধটি স্থান পায়। বুদ্ধদেব বসুর 'প্রবন্ধ সংকলন' দুই খণ্ডে বিভক্ত—'সমালোচনা' এবং 'রম্যরচনা ও ভ্রমণ'। 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধটি প্রথম খণ্ডের পঞ্চম প্রবন্ধ। আরও পরবর্তীকালে প্রবন্ধটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'একালের সমালোচনা সঞ্চয়ন' (১৯৮০) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রবন্ধটির আদিরূপ বজায় আছে ; কোনো পরিবর্জন, পরিমার্জন বা পরিবর্ধনের চিহ্ন নেই।]

● বুদ্ধদেব বসু মূলত কবি হলেও প্রাবন্ধিক-সমালোচক-ঔপন্যাসিক এবং ছোটগল্পকার রূপেও বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্মরণীয়। বাংলা সাহিত্যে তার বিশেষ অবদান সমালোচক ও সৃষ্টিশীল প্রবন্ধ রচয়িতারূপে। আলোচ্য 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটিতে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় হলো রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধকদের বাংলা কাব্যজগতে অবস্থান নির্ণয় এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের ব্যাপকতায় সমাচ্ছন্ন কবিকুলের ভূমিকা নির্ণয়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভূমিকার আলোচনা, নজরুল ইসলামের কবিতার চারিত্র্য নির্ণয় ইত্যাদি। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর প্রচেষ্টা, আধুনিক কবিকুলের প্রায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত আলোচনা, বাংলা কবিতার রবীন্দ্র-প্রভাবিত নাবালক দশার অবসান ইত্যাদি সমালোচ্য প্রবন্ধটির কেন্দ্রীয় বিষয়। প্রবন্ধটি সমালোচনামূলক হলেও বুদ্ধদেবীয় সৃজনীকল্পনা এখানে অনুপস্থিত নয়। সমালোচনামূলক প্রবন্ধে যে জাতীয় তথ্যভারাক্রান্ততা থাকে তা এখানে অনুপস্থিত। আবার প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ তত্ত্বাশ্রয়ীও নয়। বুদ্ধদেব বসুর অন্যান্য সৃজনশীল প্রবন্ধের ন্যায় আলোচ্য প্রবন্ধটির মূল বৈশিষ্ট্য হলো একটা বেগ, একটা প্রবহমান গতি এবং তার সঙ্গে তাঁর মনোহরণ গদ্য। তাঁর সমালোচনামূলক প্রবন্ধের অন্যতম লক্ষণ যে স্বতঃস্ফূর্ততা তা এখানে বিরাজিত। সমালোচকমূলক প্রবন্ধ বললে যে তথ্য ও তত্ত্ব ভারাক্রান্ততা পাঠককে পীড়িত করে, সমালোচ্য প্রবন্ধটিতে তা নেই ; পরিবর্তে আছে নিজস্ব অনুভূতি, এক রোমান্টিক চেতনার ক্রমনিঃসরণ। তাঁর সমালোচনায় অনুশীলন ও অভিনিবেশ আছে। 'সমালোচক বুদ্ধদেবের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কোন বিশেষ রচনা নয়, শ্রেষ্ঠ কীর্তি কোন বিশেষ লেখককে প্রতিষ্ঠা দেওয়াও নয়, তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি সাহিত্যের মূল্য সম্পর্কে তাঁর সমাজকে সজাগ করা, অনুরাগ সৃষ্টি করা সাহিত্যে, এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যিককেও। আধুনিকতার জন্য লড়েছেন তিনি—বুদ্ধদেব বসু বলেছেন। আসলে লড়েছেন সাহিত্যের জন্য। এ লড়াই দুই রকমে

হয়। এক হয় সাহিত্য সৃষ্টি করে; সাহিত্যের মূল্যের কথা বলে। বুদ্ধদেব বসু উভয় কাজ করেছেন, কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টির চেয়েও সাহিত্যানুরাগ সৃষ্টিই তাঁর অধিকতর উল্লেখযোগ্য কাজ, অধিকতর মনোহরণ। এবং সাহিত্যের উৎকর্ষ আকর্ষ বিচারক্ষমতা না জন্মালে যে সাহিত্যের মূল্যজ্ঞান আসে না, আসতে পারে না কিছুতেই—এই সত্যটি অবিচল থেকেছে সাহিত্যের পক্ষে তাঁর সকল বক্তব্যের অন্তরালে। বিচারের নিরিখ ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু নিরিখের প্রয়োগ যে আবশ্যক এই কথাটা বুদ্ধদেব বসু কখনো ভুলতে দেন না আমাদেরকে। ম্যাথু আর্নল্ডের মতই তিনি শুধু সমালোচক নন, সমালোচনার প্রবক্তাও, সমালোচনা যে আবশ্যক এই মতের প্রচারকও একজন।' [সমালোচক বুদ্ধদেব বসু: সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী / উত্তরাধিকার: নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৭৭।]

- বস্তুসংক্ষেপ

বাংলা কাব্যসাহিত্যে স্বভাবকবি শব্দের প্রথম প্রয়োগ হয় গোবিন্দচন্দ্র দাসকে লক্ষ্য করে এবং এই বিশেষণটি যে তাঁর সম্পর্কেই প্রযোজ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ 'নীরব কবির' অস্তিত্ব উড়িয়ে দিলেও স্বভাবকবি কথাটা যে টিকে গেলো তার কারণ সম্ভবত এই যে কবিমাত্রই স্বভাবকবি এবং সহজাত শক্তি ব্যতীত শিল্প রচনা অসম্ভব। তবে স্বভাবকবি শব্দটি শুধু এই অর্থেই ব্যবহৃত হয় না; স্বভাবকবি বলতে সেই কবিকেই বোঝান হয় যিনি হৃদয়নির্ভর প্রেরণায় বিশ্বাসী হয়ে কবিতা লেখেন এবং মনে করেন হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির সম্পর্ক ভিন্ন শিবিরের। সংযমের শাসনে যদি কবিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করা না যায় তাহলে স্বভাবকবিত্ব শব্দটির প্রয়োগ করতে হবে। স্বভাবকবিত্বের কারণ ঐতিহাসিক এবং ব্যক্তিক দুইই হতে পারে। গোবিন্দ দাসকে স্বভাবকবি বলা হয় এই কারণে যে তাঁর মধ্যে আবেগের প্রাচুর্য থাকলেও শাসনের সংযম ছিল না। তিনি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হলেও রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব অনুভব করেন নি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব অনুভব করলেই যে স্বভাবকবিত্ব বিদূরিত হতো এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। কেননা রাবীন্দ্রিক দীক্ষা পেলেও ঐতিহাসিক কারণে বাংলাকাব্যের ক্ষেত্রে স্বভাবকবিদের আবির্ভাব ঘটেছে এ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে নজরুল ইসলাম পর্যন্ত কবিদের উল্লেখ করা চলে—যাঁদের সংখ্যা কম নয়। [১]

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা মধ্যগগনে থাকার জন্যই বিশ শতকের সূচনাকালে আবির্ভূত কবিকুলের পক্ষে স্বভাবকবিত্ব ইতিহাসগত কারণে অনিবার্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে মসীবর্ণ করে প্রমাণ করবার চেষ্টার অভাব ছিল না; তবুও তরুণ কবিরা রবিচুম্বকে সংলগ্ন হয়েছিলেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ আরামে নিরুদ্বেগে উপভোগ করার কবি ছিলেন না; বাংলাদেশের মানসিকতার তুলনায় ও ক্ষীণপ্রাণ অপরিসর বাংলা সাহিত্যের তুলনায় তিনি বিশাল ব্যাপ্ত সৌরমণ্ডলের অগ্নিবিহঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বাঙালি বিস্মিত মুগ্ধ বিচলিত হলেও তাঁকে সহজে গ্রহণ করতে পারে নি।

রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃষ্টির তুলনায় বাংলাদেশে তাঁর পাঠকসংখ্যা বেশ কম। [২]

রবীন্দ্র-সমকালীন যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান, কিরণধন, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের কাছে বিশ শতকের প্রথম দু'দশক অত্যন্ত সংকটের কাল। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের মধ্য বয়সে উদ্‌গত হয়ে নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের পর কাব্যজগতে যে আর কোনো প্রভাব রাখতে পারলেন না, তার কারণ তাঁদের কবিতাবলী ক্লান্ত, পাণ্ডুর মৃদুল ও সমতল গতিসম্পন্ন। সত্যেন্দ্রনাথও ঐতিহাসিক কারণে বাংলা সাহিত্যে ছন্দোরাজ হয়ে রইলেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করতে চাইলেও, তা সম্ভব ছিল না—কেননা, 'রবীন্দ্রনাথের কাব্যকলা মারাত্মকভাবে প্রতারক', রবীন্দ্রনাথের কাব্যকলার সুরে-স্বপ্নে-মন্ময়তায়-রোমাণ্টিকতায় মুগ্ধ হওয়ায় তাঁদের আত্মচেতনা বিলীন হলো। রবীন্দ্রনাথের ব্রত নিলেও তাঁরা রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শের ধ্যান করলেন না। রবীন্দ্রনাথের আপাত সুন্দর মহৎ সবলতায় মুগ্ধ হলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মানস প্রদেশের গভীর তলদেশে নিত্যমথিত আবর্তের ঘূর্ণাবেগ উপলব্ধিতে তাঁরা অক্ষম হলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণের জন্য তাঁদের কাব্যে দেখা দিল উচ্ছ্বাস, ফেনিলতা, অসহায়তা ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকারীর দল রবি তাপে আত্মাহুতি দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে যে সতর্ক করে গেলেন সেইখানেই তাঁদের ঐতিহাসিকতা। [৩]

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিস্তার ও সৃষ্টির বৈচিত্র্য এত বিস্ময়কর যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব বাংলাদেশে মহৎ ভাগ্যের ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের ফলে কবিতা লেখা বেশ সহজ হয়ে গেছে এখন ভেবেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিসম্প্রদায়। তাঁরা ভেবেছিলেন, কবিতা রচনা করা সীমাহীনভাবে সহজ এবং কবিতায় ছন্দ-মিল-ভাষা-উপমা ইত্যাদি থাকলেই হলো। অনেকে মনে করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে পাঠ করা অনেক সহজ। কেননা, সেখানে দান্তে বা গ্যেটের মতো স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালব্যাপী পরিকল্পনা নেই, শেক্সপীয়রের মতো চরিত্রশালা নেই, নেই মিল্টনের মতো বাক্যবন্ধ। মনে হয়েছিলো, রবীন্দ্রনাথ দুর্গম নন; তাঁর কবিতার অর্থ সাধারণ, চিন্তার ভার নেই, বিস্ময়কর বাহুল্য নেই। চোখে দেখা আবহমান বাংলার প্রকৃতিকে তিনি রূপায়িত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো সবাই লিখতে পারেন, পাণ্ডিত্যের কোনো প্রয়োজন নেই, শুধু ভাব আনার অপেক্ষা—এই মোহে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে তাঁরা সকলে প্রায় রবীন্দ্রনাথেই হারিয়ে গেলেন। [৪]

রবীন্দ্রনাথের কবিতার আপাত স্বচ্ছতার জন্য মনে হয়েছে তাঁর কবিতার অর্থ উপলব্ধি করা অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের পূর্ববর্তী কবিতার আলোচনায় বলেছিলেন, উপাদানের অভাবে নয়, রূপায়ণের অসম্পূর্ণতায় অনেক কবিতাই কবিতা হয় নি। আসলে তাঁর কবিতা ভেতর থেকে হয়ে ওঠে। চোখে-দেখা প্রত্যক্ষ পৃথিবী কেমন করে তাঁকে নাড়া দিয়েছে, প্রতিদিনের সুখদুঃখে তিনি কিভাবে আনন্দে-বেদনায় আন্দোলিত হয়েছেন—ইত্যাদিই তাঁর কবিতা-গানে রূপায়িত। তাঁর কবিতা বিশ্লেষণ বিমুখ; তার সারাংশ বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

সমালোচনার ধারাতেও তাঁর কবিতাকে ধরা যায় না। তাঁর কবিতা তার অস্তিত্বের জন্যই ভালো। [৫]

রবীন্দ্রনাথের কবিতা জীবনের সম্পদ হলেও, সেই কবিতার আদর্শ সামনে থাকা বিপজ্জনক। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সামনে থাকার ফলে যে সমস্যার আবির্ভাব হলো, তার প্রতিফলন সত্যেন্দ্রনাথে লক্ষ্যগোচর। সমকালীন কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের রচনাশক্তির নৈপুণ্য থাকলেও, তিনি যুগের প্রতিভূ হলেও একথা স্বীকার করতে হয় রবীন্দ্রনাথ পড়া থাকলে সত্যেন্দ্রনাথ পড়ার প্রয়োজনীয়তা নেই বললেই হয়। আসলে রবীন্দ্রনাথের বিশাল ব্যাপ্ত প্রতিভার পাশে সত্যেন্দ্রনাথ অতীব ম্লান। সত্যেন্দ্রনাথ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের মতই প্রায় ঋতুরঙ্গ, পল্লীচিত্র, ফুল, পাখি, চাঁদ, মেঘ, শিশির, দেশপ্রেম ইত্যাদি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দের পটভূমিকায় জীবনের যে উত্তাপ থাকে, প্রাণসত্তার প্রবলতার স্পর্শ থাকে সত্যেন্দ্রনাথে তার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের দিব্যদৃষ্টি, বিশ্বসত্তার অনুভূতি ইত্যাদি সত্যেন্দ্রনাথে চপল চটুলতায় পর্যবসিত। রবীন্দ্রনাথের ছন্দোগত মধুরতা, মদিরতা, অন্তর্লীনতা, শিক্ষা, সংযম, রুচির পরিবর্তে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় মিহি সুর, ঠুনকো তাল আর চটপটে তাল—যা যেকোনো পাঠককে মোহিত করে। সত্যেন্দ্রনাথ এই সুযোগে প্রায় সমস্ত পাঠকের কাছে জনপ্রিয় হলেন। সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় সাধারণ পাঠক রবীন্দ্রনাথের অবয়ব যেন খুঁজে পেলো। সত্যেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের অনুগামী কবিকুলের রচনা শেষ পর্যন্ত অন্তঃসারশূন্য অথচ সুশ্রাব্য পদ্যরচনায় পরিণত হয়েছে এবং তার ফলে উত্তরসূরীরা বুঝতে পেরেছে রবীন্দ্র অনুকরণে ব্যর্থতা ব্যতীত গত্যন্তর নেই; অতএব ও পথ বাতিলযোগ্য। [৬]

বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ বা তাঁর সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক ভূমিকার আলোচনায় দেখা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথকে প্রতিফলিত করা ব্যতীত কবিকর্মের কোনো ধারণা তখন ছিলো না। গদ্যের ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী ও অবনীন্দ্রনাথের মতো মৌলিক গদ্য লেখকের সন্ধান পেলেও, কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-কবিব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার মুগ্ধতা অতিক্রম করতেই বেশ কয়েকটি দশক অতিবাহিত হলো। এই সময়েই সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর কবিগোষ্ঠী রবীন্দ্র-প্রতিভার কাছে আত্মসমর্পণ করে পরবর্তীদের সামলে দিলেন। কেন না, রবীন্দ্র-প্রতিভাবলয় অতিক্রম করা তখন সহজ ছিল না। নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল আংশিকভাবে ছিন্ন হলো। [৭]

নজরুল ইসলামকেও ঐতিহাসিক অর্থে স্বভাবকবি বলতে হয়। তাঁর কবিতায় অসংযম আছে, প্রগল্‌ভতা আছে, পরিণতির প্রবণতা নেই; এমনকি দীর্ঘ কাব্য-জীবনকালে তিনি একই রকম—প্রকৌশলগত পরিবর্তন তাঁর প্রতিভায় অনুপস্থিত। সত্যেন্দ্রনাথের অনুকরণও তাঁর কাব্যে সুপ্রচুর। কিন্তু তাঁর সমস্ত দোষ উত্তীর্ণ হয় তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে। নজরুলের কাব্যগত নানা দোষ সত্ত্বেও তাঁকেই রবীন্দ্রনাথের পর

বাংলা ভাষার প্রথম মৌলিক কবি বলতে হয়। রবীন্দ্র-প্রতিভা যখন মধ্যগগনে নজরুল তখন রবীন্দ্র-বন্ধন ছিঁড়ে বার হলেন, অসাধ্য সাধন করলেন। নজরুলের এই অসাধ্য সাধনের পেছনে সাধনার কোনো ইতিহাস নেই। মনে হয়, কতকগুলি অসম্ভব কারণের এটি অনিবার্য ফলশ্রুতি। সত্যেন্দ্রনাথ এবং নজরুল উভয়ের কবিতার আদর্শ প্রায় এক; কিন্তু নজরুলের বৈশিষ্ট্য তাঁর জীবনের পটভূমিকার ভিন্নতার জন্য। তিনি মুসলমান হয়েও হিন্দু সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছিলেন; জীবনের নানা বৃত্তিতে তিনি সংলগ্ন হয়েছিলেন। কোনো রকম সাহিত্যিক প্রস্তুতি না নিয়েই আপন স্বভাবের শক্তিতে তিনি রবীন্দ্র-প্রভাবের ছত্রচ্ছায়া থেকে সরে গিয়ে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নতুন প্রবাহ আনয়ন করলেন। তাঁর নতুন ধরনের প্রবণতা বাংলা কাব্যে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব না ফেললেও তিনি দেখলেন— রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত কাব্য রচনা সম্ভব। তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলাকাব্যে নবীন আকাঙ্ক্ষার যে প্রচেষ্টা লক্ষ্যগোচর হলো তারই ফলশ্রুতিতে কল্লোলগোষ্ঠীর নতুন প্রচেষ্টা—বাংলা সাহিত্যের দিক্ পরিবর্তন সূচিত হলো। [৮]

নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় নতুন যুগ এগিয়ে নিয়ে এলেন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিদ্রোহের দিক থেকে, সাহিত্যিক বিদ্রোহের দিক থেকে নয়। তার নিজের মনে অতৃপ্তি না থাকলেও তিনি সকলের মধ্যে তা সঞ্চারিত করে দিলেন। প্রক্রিয়ার অচেতন স্তর থেকে সচেতন স্তরে উঠে আসার যে প্রক্রিয়া শুরু হলো, তাকে কল্লোল যুগ বলা চলে। তার প্রধান লক্ষণ বিদ্রোহ, আর বিদ্রোহের লক্ষ্য হলো রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে মনে হলো তাঁর লেখায় বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণার চিহ্ন নেই। তার জীবনদর্শনে মানুষের শরীর হয়েছে উপেক্ষিত। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের প্রয়োজন ছিলো বাংলা কবিতার মুক্তির জন্য এবং রবীন্দ্রনাথকে সত্য করে অর্জনের জন্য। [৯]

অবশ্য কল্লোলের এই বিদ্রোহে স্রোতের টানে জঞ্জাল এলেও বিদ্রোহের স্বচ্ছ রূপটি ফুটে উঠলো তখনই যখন স্থিতিলাভের চেষ্টা দেখা দিলো। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' আর 'কবিতা' পত্রিকায় একে একে নবীন কবিদের আবির্ভাব ঘটলো। সুধীন্দ্রনাথের সমালোচনায় বাংলা কবিতা সমৃদ্ধ হলো; বাংলা কবিতায় এলো সংহতি, বিষয় ও শব্দচয়নে ব্রাত্যধর্ম, গদ্য-পদ্যের মিলনসাধনের ইঙ্গিত। আধুনিক কবিদের মধ্যে পারস্পরিক বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও তাঁরা সকলে মিলে একই আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নতুনের স্বাদ আনলেন বাংলা কবিতার জগতে। কেউ রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে গেলেন, যেমন জীবনানন্দ; কেউ বা তাঁকে আত্মস্থ করতে চাইলেন। এই সংগ্রামে পাশ্চাত্ত্য ভাণ্ডার থেকে সাহায্য এসেছিল; আর আধুনিক জীবনের সংশয় ক্লান্তি, বিতৃষ্ণা এসেছিল উপকরণরূপে। বিষ্ণু দে ব্যঙ্গের তির্যক উপায় বেছে নিলেন, সুধীন্দ্রনাথ জীবনের অবক্ষয়ের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথে আশ্রয় গ্রহণ করলেন, অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের জগতের লোক হয়েও প্রকরণগত বৈচিত্র্য আনয়ন করলেন। তাঁরা

রবীন্দ্রনাথকে না ভুলে থেকে ব্যবহার করতে শিখলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বাংলা কবিতার ধারায় সার্থক করলেন। সত্যেন্দ্রনাথ কবিগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথকে না জেনে তাঁরা ব্যবহার করতেন, আর সুভাষ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে ঈষৎ বাঁকিয়ে চুরিয়ে আধুনিক কবিতা লিখলেন। আধুনিক কবিদের কুণ্ঠাহীনতা, সাহস তাঁদের আত্মবিশ্বাস ও স্বাবলম্বিতার প্রমাণ। ভাবীকালে তাঁদের রচনা গৃহীত না হলেও ঐতিহাসিকভাবে তাঁরা শ্রদ্ধেয় এই কারণে যে, তাঁরা বাংলা কবিতাকে সংকট থেকে উদ্ধার করলেন এবং কাব্যকলার ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারকে একমাত্র গ্রহণীয় মনে না ক'রে আপন শ্রমে উপার্জনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলেন। [১০]

নজরুল ইসলাম থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত অবকাশে বাংলা কবিতার রবীন্দ্রাশ্রিত দশার অবসান হলো। অবশ্য নবাগতরা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করলেও জীবনানন্দ বা বিষ্ণু দে'র আবর্তে তারা পাক খাচ্ছেন। একালের কবিরা টেক্‌নিক নিয়ে বড় ব্যস্ত। 'চোরাবালি' বা 'খসড়া' লেখার সময় যে সব কৌশল প্রয়োজনীয় ছিলো, বর্তমানে তার আর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। অবশ্য একথাও ঠিক যে, কবিতার রাজ্যে প্রকরণগত কৃতিত্বেরও প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের প্রসঙ্গ বর্তমানে না তুললেও চলে, কেননা, বাংলা কবিতা তার পরিণতির পথে রবীন্দ্রনাথের ভক্তিবন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ঋণ বাঙালির জীবনে ভাষায় এমন স্বতঃসিদ্ধ যে তাকে এড়িয়ে যাবার সুযোগ নেই। রবীন্দ্রনাথের উপযোগিতা, ব্যবহার্যতা, বিস্তৃত, বিচিত্র হয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রকাশিত হবে। তাঁর কবিপ্রভাব ভিত্তির উপরেই বেড়ে উঠবে আগামী কালের বাঙালি কবির কবিপ্রতিভা। [১১]

● প্রবন্ধ বিশ্লেষণ

কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধটিকে চারটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম পর্যায়ে অনুচ্ছেদ তিনটি, দ্বিতীয় পর্যায়ে অনুচ্ছেদ তিনটি, তৃতীয় পর্যায়ে অনুচ্ছেদ দুটি, চতুর্থ পর্যায়ে অনুচ্ছেদ তিনটি। অর্থাৎ মোট এগারোটি অনুচ্ছেদে প্রবন্ধটি বিন্যস্ত। এই এগারোটি অনুচ্ছেদে তিনি নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন—১. স্বভাবকবির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়, এবং প্রসঙ্গত 'নীরব কবির' উল্লেখ এবং গোবিন্দ দাসের উল্লেখ। ২. বিশ শতকের সূচনায় যাঁরা বাংলার কবিকিশোর স্বভাবকবিত্ব তাঁদের পক্ষে কেন ঐতিহাসিক তার কারণ ও পটভূমিকা নির্ণয়। ৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও সত্যেন্দ্রগোষ্ঠীর প্রতিভার আলোচনা এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা নির্ণয়। ৪. রবীন্দ্রনাথের পর নজরুল ইসলাম, বহু ত্রুটি সত্ত্বেও, বাংলা ভাষার প্রথম মৌলিক কবি। ৫. কল্লোলের আবির্ভাবের পটভূমিকা এবং তার নবতম প্রচেষ্টা। ৬. পরিচয়, কবিতা পত্রিকার প্রকাশ—জীবনানন্দ, অমিয়, সুধীন্দ্র, প্রেমেন্দ্র, বিষ্ণু দে প্রমুখ উত্তরসাধক—বাংলা কবিতার নাবালক দশার অবসান এবং

প্রসঙ্গত একালের কবিদের সমস্যা। ৭. সিদ্ধান্ত : আদিগন্ত ব্যাপ্ত রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার রক্তে মাংসে মিশে আছেন।

● 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধের সূচনাতে প্রাবন্ধিক-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু স্বভাবকবির সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য নির্ণয় প্রসঙ্গে গোবিন্দ দাসের উল্লেখ করেছেন। বাংলা-সাহিত্যে স্বভাবকবি' অভিধাটি প্রথম উচ্চারিত হয় গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫—১৯১৮) প্রসঙ্গে। গোবিন্দচন্দ্র দাসকে কে স্বভাবকবি বলেছিলেন তা অজ্ঞাত, তবে বুদ্ধদেব বসুর মতে, অভিধাটি তাঁর সম্পর্কে যথাযথভাবেই প্রযোজ্য হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নীরব কবির অস্তিত্ব স্বীকার করেননি—'নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস, সাহিত্যে এই দুটো বাজে কথা কোনো কোনো মহলে চলিত আছে। যে কাঠ জ্বলে নাই তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশেরই মতো নীরব হইয়া থাকে তাহাকেও কবি বলা সেইরূপ। 'নীরব কবির' অস্তিত্ব বাতিল হলেও 'স্বভাবকবি' শব্দটি সাহিত্যে টিকে গেলো। স্বভাবকবি শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সহজাত শক্তি ব্যতীত কোনো শিল্প রচনা সম্ভব হয় না বলে কবি মাত্রই স্বভাবকবি। কিন্তু শব্দটি চাই সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে বিশিষ্টার্থে ব্যবহৃত হয়। স্বভাবতই কবি এই অর্থে স্বভাবকবি শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। স্বভাবকবি বলতে তাঁকেই বোঝানো হয় যিনি কবিতা রচনার ক্ষেত্রে হৃদয়নির্ভর প্রেরণায় বিশ্বাসী অর্থাৎ তিনি যখন যেমন প্রাণ চায় লিখে যান, লেখার বিষয়ে চিন্তা করেন না, যাঁর হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির সম্বন্ধ পরস্পর বিপরীত শিবিরের সম্বন্ধ। সুধীন্দ্রনাথ দত্তও বলেছেন—'আত্মপ্রসাদের সাক্ষ্য সংগ্রহ কবির কর্তব্য নয়, তার আরাধ্য মাত্রাজ্ঞান ও তন্ময়তা।' সুতরাং শুধুমাত্র রচনা করলেই কবি হওয়া যায় না ; সেখানে থাকবে আবেগের সংযমশাসন, আবেগের অতিরেক নয় ; সেখানে থাকবে চিন্তা—চেতনার অপরিম্লান মহতী জ্যোতি। অবশ্য একথা সত্য যে আবেগের তাপ না থাকলে কিছুই সম্ভব নয় ; কিন্তু আবেগকে পাঠকের মনে প্রবেশ করাতে হলে আবেগকে নিয়মশাসিত, সংযমনিয়ন্ত্রিত করতে হবে। যদি কোনো কবির এই শাসনের, নিয়ন্ত্রণের শক্তি না থাকে তবে তাঁকে 'স্বভাবকবি' বলতে হয়। স্বভাবকবিত্বের এই বিশিষ্টতা কবিস্বভাবে আসতে পারে ব্যক্তিগত কারণে অথবা ঐতিহাসিক কারণে। স্বভাবধর্মের দিক থেকে কেউ কেউ স্বভাবকবি হতে পারেন অথবা সাহিত্যের পারিপার্শ্বিক অবস্থা কোনো কবিকে স্বভাবকবিতে পর্যবসিত করে। বুদ্ধদেব বসুর মতে, গোবিন্দ দাস যথার্থ অর্থে স্বভাবকবি, স্বভাবতই স্বভাবকবি, তাঁর কবিতায় হৃদয়রসের প্রবলাধিক্য, আবেগের অতিরেক, নিয়ন্ত্রণহীনতা তাঁকে স্বভাবকবির পর্যায়ভুক্ত করেছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হয়েও রবীন্দ্র-নাথের অস্তিত্ব অনুভব করেন নি এবং স্বভাবকবিত্বের বলয় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি—এইখানেই গোবিন্দ দাসের প্রতিভার সীমাবদ্ধতা।

গোবিন্দ দাসকে স্বভাবকবি বলার ব্যাপারে প্রায় সমস্ত সমালোচকই একমত।

তাঁর কবিতার অনন্দনতাত্ত্বিক বক্তব্য, আবেগের অতিরেক, ভাবের সংযমহীনতা ইত্যাদির জন্য তাঁকে স্বভাবকবিরূপে আখ্যাত করা হয়েছে। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে গোবিন্দ দাসের ভূমিকা স্বীকার করেও সমালোচকগণ বলেছেন—

'তাঁর কাব্যে যে প্রচণ্ড 'প্যাশন' যা উন্মত্ত আবেগেব অবাধ উৎসার লক্ষ্য করা যায়, বাংলা সাহিত্যের মার্জিত অঙ্গনে তা যেন একটি অভিনব আগন্তুক বলে মনে হয়। তাঁর কবিতার প্রেম-প্রণয়কে কোনওরূপ সূক্ষ্ম বা অশরীরী প্রত্যয়ীভূত নন্দনতত্ত্বে পর্যবসিত করা হয় নি।*** কবি ব্যক্তিগত দারিদ্র্য দুঃখপীড়নের দ্বারা এতটা আবিভূত হয়েছিলেন যে, স্থূল প্রাকৃত বাস্তবকে সব সময়ে সূক্ষ্ম শিল্পে পরিণত করতে পারেন নি। আধুনিক বিদ্যার দ্বার তার মুখের সামনে প্রায় রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং পাশ্চাত্ত্য গীতি-কবিতার দ্বারা তাঁর মন মার্জিত হতেও পারে নি। অপরদিকে ব্যক্তিগত অশান্তি তাঁকে স্থির হতে দেয় নি। তবু তাঁর 'অশিক্ষিতপটুত্ব' অসাধারণত্বের পর্যায়ে পড়ে বলে তাকে 'স্বভাবকবি' বলা হয়ে থাকে। কথাটা কিছুটা সত্যও বটে। তাঁর কবিত্ব তাঁর স্বভাবের সঙ্গে মিশে আছে, এটা কোন গ্রন্থলব্ধ বা বিদ্যাজনের দ্বারা প্রাপ্ত অর্জিত সংস্কার নয়। তাঁর কবিপ্রেরণা কোন পোষাকী রোমান্টিক আবেগ নয়, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই তা প্রাণের স্বাভাবিক বিকাশ মাত্র। কিন্তু স্বভাবের সঙ্গে আর্টের ততটা মিলন ঘটেনি বলে তাঁর অনন্যসাধারণ কবিপ্রতিভা সব সময়ে সৃষ্টিতে সার্থক হয় নি। [বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত: ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।]

'গোবিন্দ দাসের রচনারীতিতে শিথিলতা ছিল, অসংযম ছিল আরও বেশি। তাঁর মধ্যে বড় কবির কিছু সম্ভাবনা থাকলেও রূপনির্মিতির দুর্বলতায় তা হতে পারে নি। কিন্তু ভাষার অসংযম যেন তাঁর কবিকল্পনার বিশিষ্টতারই বাহন। তাঁর কল্পনায় বলিষ্ঠ ভোগবাদ ও নারীদেহ কামনার তীব্র প্রত্যক্ষতা লক্ষণীয়। [বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস: ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত।]

সমালোচকগণ প্রথাবদ্ধ ধারণায় অভ্যস্ত বলে সাহিত্যের বিচার সম্পর্কিত সেই নতুন মাপকাঠি ব্যবহার করেন না যেখানে আনাতোলি লুনাচার্স্কি বলেছেন—'A work of literature will always reflect, whether conciously or unconciously, the psychology of the class which the writer represents. Either this or, as often happens, it reflects a mixture of elements in which the influence of various classes on the writer is revealed and this must be subjected to a close analysis'.

গোবিন্দচন্দ্র দাসকে যখন 'স্বভাবকবি' অভিধায় চিহ্নিত করা হয় তখন সমালোচক রায়ত-প্রজাদের স্বার্থে কবির আজীবন সংগ্রাম এবং শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর রচিত কবিতাবলী কিভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা বিস্মৃত হন। উনিশ শতকের সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমিতে রায়ত প্রসঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র দাসের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা অবশ্যই স্মরণীয়। 'উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ডিরোজিও বাংলাদেশের সমাজজীবনে যে সামন্ত

বিরোধী গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রবর্তন করেছেন, তারই ধারক বাহক রূপে গোবিন্দ দাস দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছেন। নিবন্ধ তমসাচ্ছন্ন দিনগুলি ভাবী হয়ে উঠেছে অসহায় মানুষের আর্ত ক্রন্দনে। ভূমিস্বার্থে পরশ্রমজীবী সমাজ যখন ভূতের মতো পিছন দিকে হেঁটে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত, প্রজা শোষণ করাকে যখন তারা বিধিদত্ত অধিকার বলে মনে করতেন, তখন গোবিন্দচন্দ্র অবহেলাভরে রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারির চাকরি ত্যাগ করে সামন্ত যন্ত্রে পিষ্ট মানুষগুলিকে বুকে টেনে নিয়েছেন, অথচ অন্যান্যদের ন্যায় তিনি যদি চোখ বুজে থাকতেন, তবে তিনিও প্রতিপত্তিশালী ভূস্বামীরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন এবং প্রতিভাবান কবিরূপে ভূম্যধিকারী সমাজের কাছ থেকে সম্বর্ধনা লাভ করতেন। কিন্তু কৃষক প্রজাদের রক্তে সিক্ত অর্থে তিনি জীবন নির্বাহ করতে চাননি। সামন্ত-শাসিত সমাজে নৃপতি-ভূস্বামীদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে গোবিন্দ দাস লাঞ্ছিত উৎপীড়িত রায়ত কৃষকদের সমর্থন করেছেন, তাদের অন্ধকারময় জীবনের মর্মবেদনাকে বাণীরূপ দিয়েছেন।

কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের আপোষহীন জীবনসংগ্রাম, সামন্ত বিরোধী চেতনায় সমৃদ্ধ ও জীবনরসে সিক্ত কবিতাবলী সাহিত্যেতিহাসের লেখকদের কিংবা সাহিত্য সমালোচকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। তাঁরা একালের পাঠকদের কাছে গোবিন্দ দাসকে দেহবাদী কবিরূপেই উপস্থিত করেছেন, তাঁর কবিতায় তাঁরা কেবলমাত্র 'বলিষ্ঠ দেহানুগতা' লক্ষ্য করেছেন। * * * আমরাও বিস্মৃত হয়েছি আমাদের সংগ্রামী অতীতকে এবং শৃঙ্খলমুক্ত জীবনের স্বপ্নদর্শনকবি গোবিন্দ দাসকে। *** উনিশ শতকের বাংলাদেশ ছিল সামন্ত শোষণে জর্জরিত। পাশ্চাত্য আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই শতকের খ্যাতনামা নায়কেরা সামন্ত-সমাজের আমূল পরিবর্তনের পরিবর্তে কেবলমাত্র সমাজের উপরিভাগ সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। ভূমিনির্ভরতা তাদের চিন্তাধারাকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। সেক্ষেত্রে ভূমিস্বার্থ সম্পর্ক বিরহিত গোবিন্দচন্দ্র সামন্ত শৃংখল ভেঙে ফেলার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর কবিতাবলীতে। * * * গোবিন্দ দাসের স্বাদেশিক চিন্তা ও স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যাবে 'আমরা হরিহর', 'স্বদেশ', 'স্বাধীনতা' ইত্যাদি কবিতায়। 'আমরা হরিহর' কবিতাটি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। * * * গোবিন্দ দাসের সমাজবিষয়ক কবিতায় ব্যঙ্গ বিদ্রূপের শাণিত তরবারির বিদ্যুৎ ঝলকানিতে সমাজ শত্রুদের মুখোস উন্মোচিত হয়েছে। * * * উনিশ বিশ শতকের সংক্রান্তিকালে শ্রেণীচেতনার বিকাশ না ঘটায় গোবিন্দ দাস সামন্ত প্রভুদের শ্রেণীশত্রুরূপে চিহ্নিত করতে পারেননি। সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাবের বিলম্বতার জন্য স্বভাবকবি মধ্যপথে অসমাপ্ত। নৃপতি-ভূস্বামীদের প্রতি আত্যন্তিক ঘৃণার মূলে ছিল কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির তীব্রতা। * * * গোবিন্দ দাসের কাব্যকবিতায় নেতিবাচকতার তুলনায় ইতিবাচকতাই প্রধান। শ্রেণীবিদ্বেষের পরিবর্তে ব্যক্তিগত দ্বেষের প্রকাশ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘটলেও সামগ্রিকভাবে তাঁর রচনায় শৃঙ্খলিত মানবাত্মার মুক্তির আকুতি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত

হয়েছে। অমানিশার অন্ধকারে কবি সূর্যোদয়ের স্বপ্ন দেখেছেন, একাকী ভৈরবী রাগিণীতে নিশাবসানের সঙ্গীত গেয়েছেন।' [উনিশ শতকের নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও কবি গোবিন্দ দাস (ভূমিকাংশ): কুমুদকুমার ভট্টাচার্য।] যে কবির কবিতায় মানুষের মুক্তির মন্ত্র উচ্চারিত সে কবিকে সমাজসচেতন বা অন্য কোনো অভিধায় অভিহিত না করে কবিপ্রতিভার যে অবমূল্যায়ন করা হয় তা যথার্থ সমালোচনার পরিচয় বহন করে না। কারুকৃতি কবিতা বিবেচনার একমাত্র মানদণ্ড নয়, বিষয়ের দিকেও নজর দেওয়া উচিত। সমালোচকগণ কিন্তু গোবিন্দ দাসের কবিতার আঙ্গিকের দিকে যত মনোযোগ প্রদান করেছেন, বিষয়ের দিকে তত মনোযোগ প্রদান করেন নি।

● সমালোচ্য প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসুর দ্বিতীয় মন্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেখানে তিনি বলেছেন, 'বিশ শতকের আরম্ভকালে যাঁরা বাংলার কবিকিশোর ছিলেন, স্বভাবকবিত্ব তাঁদের পক্ষে ঐতিহাসিক ছিলো'। অর্থাৎ বিশ শতকের সূচনায় যাঁরা বাংলার কবিকিশোর, স্বভাবকবিত্ব কেন তাঁদের পক্ষে ঐতিহাসিক সমালোচক বুদ্ধদেব বসু তার কারণ ও ঐতিহাসগত পটভূমিকা নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রাবন্ধিক স্বীকার করেছেন যে তাদের স্বভাবকবিত্বের কারণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সেইকালে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা মধ্যাহ্নগগন স্পর্শকারী, যদিও রবীন্দ্রনাথের বিরোধী সমালোচনারও অভাব ছিল না এবং রবীন্দ্রনাথকে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে নন্দিত করার পরিবর্তে নিন্দিত, বিকৃত ও অপমানিত করার জন্য দেশের মধ্যে অনেকেই অধ্যবসায়ী ছিলেন। তবুও তরুণ কবিরা রবীন্দ্র প্রতিভার চুম্বকে আকৃষ্ট হয়েছেন। কিন্তু একথা তাঁরা মনে রাখেন নি যে, রবীন্দ্রনাথ তেমন কবি নন যাঁকে শুধু আরামে উপভোগ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা আরামরমণীয় পথ পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথের যাত্রী—তার যাত্রার 'পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ, শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ, পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা, পথে পথে গুপ্ত সর্প গূঢ়ফণা। নিন্দা তাঁর যাত্রাপথে দেয় জয়শঙ্খনাদ, তাঁর প্রসাদ হলো রুদ্রের প্রসাদ। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের পক্ষে বিপুল বিশাল প্রতিভাসম্পন্ন কবি, পরিচিত জগত-জীবন ধারণার মানদণ্ডে তাঁর প্রতিভার মহোচ্চতা নির্ণীত হতে পারে না। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তার 'সুখাবর্ত' প্রবন্ধে প্রায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন—'রবীন্দ্রসাহিত্যে যে দেশ ও কালের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাদের সঙ্গে আজকালকার পরিচয় এত অল্প যে উভয়ের যোগফলকে যদি পরীর রাজ্য বলা যায়, তাহলে বিস্ময় প্রকাশ অনুচিত'।

স্বয়ং বুদ্ধদেব বসুও তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ: বিশ্বকবি ও বাঙালি' প্রবন্ধে একই সুরে বললেন—'যেন এক দৈব আবির্ভাব—অপর্যাপ্ত, চেষ্টাহীন, ভাস্বর, পৃথিবীর মহত্তম কবিদের অন্যতম. আমার কাছে আমার মতো আরো অনেকের কাছে, এই হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর তুল্য ক্ষমতা ও উদ্যম ভাষার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, এমন ঘটনা ইতিহাসে বিরল।' অপরিসর ক্ষীণপ্রাণ বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যেন সৌরমণ্ডলের অগ্নিবিহঙ্গ। আলোকের ঝরনাধারায় অগ্নিস্নানই তাঁর স্বভাবধর্ম।

কিন্তু এই অগ্নিবিহঙ্গ সৃষ্টির প্রথম রহস্য থেকে শেষ রহস্যে, আলোকের প্রকাশ থেকে মানবহৃদয়ের মহানভ অঙ্গনে ভালবাসার অমৃতলোকেই তাঁর মুক্তপাখা বিস্তার করে চলেছে। রবীন্দ্র পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করলেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ব্যাপকত্ব আমাদের বিমূঢ়, বিমুগ্ধ ও বিচলিত করে। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে দাশরথি রায়ের চাতুরী, রামপ্রসাদের আকুল করা ভক্তির অনিঃশেষ কাব্যমন্ত্রোচ্চারণ, ঈশ্বর গুপ্তের সাংবাদিকতাধর্মী কবিতা এবং মধুসূদনের বীররসের আবহমণ্ডল পূর্ণ মহাকাব্যের শব্দ-ছন্দের জগতে তূর্যধ্বনি। বাংলা সাহিত্যের এমনই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বাংলা কাব্যসাহিত্যের জগতে যে নব পরিমণ্ডলের সূচনা হলো তার ফলে বিস্মিত, মুগ্ধ, বিচলিত, বিব্রত, অভিভূত হওয়া সহজ হলেও, রবীন্দ্রনাথকে সহ্য করা অনেকের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে সংঘাতের সূচনা করেছিলো। রবীন্দ্রনাথের নিন্দায় সমালোচক মহল ছিলেন মুখর; আর কবিরা প্রতিরোধহীন আত্মবিলোপে রবীন্দ্রনাথের কাছে আত্মসমর্পণ করছিলেন।

বাংলা কবির পক্ষে বিশ শতকের প্রথম দুটি দশক আত্যন্তিক সংকটের কাল। এই অধ্যায়ের কবিরা অর্থাৎ করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় প্রমুখ কবিরা ভাবে ও ভাষায় কতখানি রবীন্দ্রবলয় বহির্ভূত তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, কেননা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁরা সকলেই ছিলেন রবীন্দ্র অনুসারী। সকলেই তাঁরা সচেতন বা অবচেতন ভাবে রবীন্দ্র-বৃত্তে লালিত ও পরিবর্ধিত। রবীন্দ্রানুসারী কবিগোষ্ঠীতে সত্যেন্দ্রনাথকে তাঁদের কুলপ্রদীপ বলতে হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ব্যতীত সকলেরই রচনা এমন সমতলরকম, সদৃশ, আত্মক্লান্ত, পাণ্ডুর এবং কবিতে কবিতে ভেদচিহ্ন এতই কম যে তাঁদের কাউকেই পৃথকভাবে চিনতে পারা যায় না। রবীন্দ্রানুসারী কবিদের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করলে এ বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে—

১. রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ বাংলাদেশের গ্রামজীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং লোকসংস্কৃতি ও পুরাণকাহিনীর ভক্ত।

২. সমকালীন সমাজচেতনা, নগরজীবনের আশাআকাঙ্ক্ষা, হতাশা, বেদনা, ব্যর্থতা, আশাভঙ্গজনিত ক্ষোভ, বাস্তবের সঙ্গে সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত মানবাত্মার দীর্ণ ক্রন্দন এখানে অনুপস্থিত।

৩. রবীন্দ্রকাব্যের অক্ষয় শান্তি সৌন্দর্যের সন্ধানে এই কবিদের যাত্রা, রবীন্দ্রকথিত আস্তিক্যবোধে, সৃষ্টি, কল্যাণে, মঙ্গলে, শান্তিতে কবিচতুষ্টয়ের গভীর আস্থা।

৪. গার্হস্থ্য জীবনচিত্রাঙ্কনে, সুখ-বেদনা-আনন্দ উল্লাস ও মাধুর্যের চিত্রাংকনে এবং দাম্পত্য বাৎসল্য সখ্য মধুর রসের প্রকাশে কবিচতুষ্টয়ের অভ্যস্ততা।

৫. রবীন্দ্রানুসারী কবিচতুষ্টয়ের প্রেমচেতনা রোমান্টিক দৃষ্টিপ্রসূত আদর্শান্বিত প্রেমচেতনা সেখানে আধুনিক প্রেমের বিচিত্র তির্যক প্রকাশ, স্বাধিকার প্রমত্ত প্রেমের

লীলা অথবা প্রেমের জটিলতা অনুদ্‌ঘাটিত।

৬ রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের দেশপ্রেম জ্বলন্ত প্রেরণা ও তীব্র অনুভূতিতে পরিণত না হয়ে পুরাণকাহিনী ও অতীত ইতিহাস প্রীতি রূপে প্রকাশিত।

অবশ্য এঁদের মধ্যে যে কেউ কেউ ভালো কবিতা লেখেন নি, এমন নয়। কিন্তু তাঁদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ অসম্ভব ছিলো, যদিও এটাই ছিলো অনিবার্য। রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত কাছাকাছি থেকেও তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যের স্বরূপ, রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন নি। তারা উপলব্ধি করতে পারেন নি যে, রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যকলা মায়াস্বরূপে প্রতারক' আর 'সেই মোহিনী মায়ার প্রকৃতি না বুঝে শুধু বাঁশি শুনে ঘর ছাড়লে ডুবতে হবে চোরাবালিতে। সোনার তরী, চিত্রা, কথা ও কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা, গীতাঞ্জলি ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের মায়ায় না মজে উপায় ছিলো না এবং সেই কাব্যের সুর মাধুর্যে তাঁদের আত্মচেতনা স্বপ্নের তৃপ্তিতে বিলীন হলো। তাঁরা ঝিনাঝিনি ছন্দকে রবীন্দ্রিক স্পন্দন বলে মনে করলেন, রবীন্দ্রনাথকে ধ্যান করার পরিবর্তে ব্রতরূপে গ্রহণ করলেন। রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ রবীন্দ্র মননের সীমাহীন বিস্তৃতি ও দুরধিগম্য গভীরতাকে উপলব্ধি বা আয়ত্ত করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের মননজাত বিবর্তন ধর্ম সম্পর্কেও তারা সম্ভবত সচেতন ছিলেন না। পরিবর্তমান রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা অনুসরণ করতে চাননি। রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ উপলব্ধি করতে পারেননি—রবীন্দ্রনাথের সরলতা জলধর্মী, অর্থাৎ জলের উপরিস্তর আপাত শান্ত, স্বচ্ছ, সরল, অনুদ্বেগধর্মী, কিন্তু ভেতরে তার গভীরতায় অনিশ্চিত কুটিলতার নিত্য আবর্ত, স্রোতে প্রতিস্রোতে নিত্য মথিত জটিল কুটিল ভয়াবহ ঘূর্ণাবর্ত। মহাকবির জঙ্গমতা গতিময়তা তাঁদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি, তাই তাঁরা রবীন্দ্র সমুদ্রে নোঙর ফেলে নিশ্চিত হলেন, রবীন্দ্রনাথের নিত্য চলমান গতির মন্ত্রে তারা দীক্ষিত হলেন না। ফলে তাঁদের কাব্যে ফেনিলতা, অলংকৃত উচ্ছ্বাস, পুনরাবৃত্তি, শিথিলতা, তন্দ্রালুতা—স্বভাব কবিত্বের সমস্ত লক্ষণ দেখা দিতে লাগলো। অবশ্য তাদের কবিকর্ম এই কারণে শ্রদ্ধেয় যে, তারা কবিতাপে আত্মাহুতি দিয়ে পরবর্তী কবি প্রজন্মকে সাবধান করে গেছেন—আর এইখানেই তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকাটি স্মরণ্য।

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের এই যে মূল্যায়ন তা যথার্থ; কেননা কবিতার ক্ষেত্রে এই অবস্থাটা ছিলো স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের বিশাল-বিপুল ছন্দোস্পন্দিত চিত্রকল্পরঞ্জিত কাব্যসম্ভার পেয়ে প্রায় সকলেই মনে করেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের পর কবিতা লেখা সহজ হয়ে গেলো। তাঁদের কাছে কবিতা মনে হয়েছিলো ছন্দ-মিল-ভাষা-উপমা ইত্যাদিসহ বিচিত্র রকমের স্তবক নির্মাণ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতে তাঁরা পরম রমনীয়ের সন্ধান পেয়ে ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কোনো বাধা নেই; সমস্তই সহজ সুন্দর মধুর। সেখানে নেই দান্তে বা গ্যেটের মতো স্বর্গ-মর্ত্য-নরক ব্যাপ্ত বিশাল পরিকল্পনা; শেক্সপীয়রের ন্যায় মানবচরিত্রের অপরূপ চিত্রশালারা মিল্টনীয়

বাক্যবন্ধের দূরবিস্তারী বিশালতা। তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত সুগম, সুন্দর। তাঁর কবিতার অর্থ উপলব্ধির জন্য অভিধান নিতে হয় না, চিন্তার চাপে ক্লিষ্ট হতে হয় না, তাঁর বিষয়বস্তুতে সেই বিস্ময়কর বাহুল্যবোধ—এই মানেই রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের ভুল হয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় লিখতে পারার ধারণায় নিমজ্জিত হয়ে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করে তরলায়িত পদ্য লিখলেন।

রবীন্দ্র-কবিতার ভাবসম্পদ সাহায্য নিরপেক্ষভাবে বোধ্য এই সহজ ধারণা অত্যন্ত বিপজ্জনক হলো। আসলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বাইরে থেকে সংগ্রহ করা নানা পদার্থের সংযোজন নয়, এ হলো ভিতর থেকে হয়ে-ওঠা—এ কথা উপলব্ধি করা তখন সম্ভব হয় নি। রবীন্দ্রনাথ আপন কাব্যের সমালোচনায় উপাদানের অভাব নয়, রূপায়ণের অসম্পূর্ণতার যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন—তাতেই সম্ভবত কবিতার হয়ে-ওঠার মূল সূত্রটি নিহিত। কিন্তু রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ তা উপলব্ধি করতে পারলেন না এবং এইখানেই তাদের সীমাবদ্ধতা। সমালোচনার মানদণ্ডে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিশ্লেষণীয় নয় রবীন্দ্রনাথের কবিতা আসলে তার অস্তিত্বের জন্যই সার্থক। রবীন্দ্রনাথের কবিতার হয়ে ওঠার প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু যথার্থই বলেছেন—'চারিদিকের প্রত্যক্ষ এই পৃথিবী দিনে দিনে যেমন করে দেখা দিয়েছে তাঁর চোখের সামনে, নাড়া দিয়েছে তাঁর চোখের সামনে, নাড়া দিয়েছে তাঁর মনের মধ্যে, তাই তিনি অফুরন্ত বার বলেছেন; প্রতিদিনের সুখ দুঃখের সাড়া, মুহূর্তের বৃন্তের উপর ফুটে-ওঠা পলাতক এক একটি রঙিন বেদনা—তাই ধরে রেখেছেন তার কবিতায়, আর কবিতার চেয়েও বেশি তাঁর গানে। এইজন্য তাঁর কবিতা এমন দেহহীন, বিশ্লেষণ বিমুখ, তার সারাংশ বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তাকে দেখানো যায় না ভাঁজে ভাঁজে খুলে; যেটা কবিতা আর যেটা পাঠকের মনে তাঁর অভিজ্ঞতা, ও দুয়ে কোনো তফাৎই তাতে নেই যেন; তা আমাদের মনের উপর যা কাজ করবার করে যায়।' রবীন্দ্রনাথের কবিতা জীবনের সম্পদ, কিন্তু তার আদর্শ সদাসর্বদা চোখের সামনে থাকলে অন্য কবিরা কবিতা রচনাকালে বিপদে পড়েন। এর অবশ্য কারণও আছে। সমস্ত মানুষের অনুভূতি ও ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ আছে; যখন দেখা যায় তারই প্রকাশ আশ্চর্যভাবে কবিতা হয়ে ওঠে আয়োজনহীন উপকরণে তখন অন্য কবিরাও সেইভাবে অনুভূতির কাছে, ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চান। ফলে সেই কবির কবিতা হয়ে যায় আবেগের অতিরেকের উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যদি হয় তার ব্যক্তিক অনুভূতি ও উপলব্ধির আয়োজনহীন উপকরণ, তবে রবীন্দ্রানুসারী কবিদের কবিতা ছিল আবেগের কাছে আত্মসমর্পণ। তাঁদের স্বভাব কবিত্বের কারণও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এ প্রসঙ্গে সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর 'কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার' গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়—'বৈষ্ণব ভাবনা, প্রেমচেতনার বিশুদ্ধি, এবং প্রকৃতি প্রীতির অতিরেক, সত্য শিব সুন্দরে অচল বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিকতা রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারা বর্ষণের মধ্য দিয়েই এঁদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছিল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব ভাবনায় সুগভীর

মৌলিকতা ছিল। তার লীলারস সৌন্দর্যের আস্বাদে যেমন তিনি ছিলেন ব্যাকুল তেমনি তাঁর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে মানবরসের অনুসন্ধানেও তাঁর ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু আলোচ্য কবিচতুষ্টয় বৈষ্ণব প্রেমের মাধুর্যের তুলনায় হরিভক্তিরসে চিত্ত সরস করে নিতেই চেয়েছেন। প্রেমকল্পনায় এঁদের মধ্যেও একটা দেহাতীত বিশুদ্ধির সুর অতি স্পষ্ট। রবীন্দ্র-কল্পনার প্রেমতত্ত্বের উপলব্ধি এঁদের মধ্যে না মিললেও বিহারীলাল থেকে সুরু করে প্রেম যেভাবে দেহভাবনা মুক্ত হতে থাকে এবং রবীন্দ্রনাথে যেভাবে তা নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা পায়, তাকেই এঁরা প্রেমবোধের চরম বলে সংশয়াতীতভাবে গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতিচেতনার ক্ষেত্রেও তারা যে ধারার অনুকারী তার সূত্রপাত বিহারীলাল থেকে। রবীন্দ্রনাথে তা জীবনজিজ্ঞাসার মূলের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে আশ্চর্য গভীরতা পায়। সে গভীরতা ও অনির্বচনীয়তায় এরা কোনকালে পৌঁছাতে না পারলেও, রবীন্দ্রকাব্যের কাছ থেকে একটা শিক্ষা লাভ করেছিলেন নগরসভ্যতার কোলাহল থেকে দূরে প্রকৃতির শান্ত কোমল রূপের সাধনাই কাব্যধর্ম। ফলে এ সাধনায় চিত্ত সর্বদাই উদ্বেলিত ও একাগ্র ছিল এরূপ মনে হয় না, কোথাও এই পল্লীপ্রকৃতির প্রতি ভালবাসার 'ফ্যাসান এর ঝোঁক আসে নি একথা জোর করে বলতে পারি না। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের ভাষা-চিত্রকল্প, উপমা ও রূপরচনারীতি, কবিতার দেহগঠন পদ্ধতি ও ছন্দকলা এঁদের প্রায় গ্রাস করে ফেলেছিল বলা চলে।'

অবশ্য একথাও ঠিক যে, রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের শিথিল তরলতা, অকারণ বিশেষণ প্রয়োগ, প্রকৃতি বর্ণনায় অতিরেক, ছন্দমিলের অতি প্রকট চাতুর্য, ভাববিলাসের উজ্জ্বল অজস্র বন্ধনহীন বক্তব্য, পল্লীপ্রীতি, ঐতিহ্যে আনুগত্য, ভক্তিপ্রাণতা মুগ্ধ আত্মরতি, ভাববিলাস, বাক্‌সর্বস্বতা, নবজীবনের প্রতি বিরাগ, রূঢ় বাস্তবের অস্বীকৃতি প্রভৃতিকে বর্জন করে রবীন্দ্রসমকালেই এলেন রবীন্দ্রবিরোধী কবিপঞ্চক প্রমথ চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম। উক্ত কবিপঞ্চকের কালে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে পূর্বতন আশা-ভরসা নির্মূল হয়েছে, তিক্ততা-নিরাশা-হতাশা বেদনায় জীবনগ্রস্ত, স্বপ্নালোকের সমাপ্তিতে সূর্যকরোদ্ভাসিত রূঢ় বাস্তবতার জগৎ, সংস্কার মুক্তি, বিশ্বদীক্ষা, নাগরিকতা, জীবন-জটিলতা প্রভৃতি যুগের সত্যদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

● রবীন্দ্রনাথের সীমাহীন প্রভাব যে কী দুরন্ত দুর্বার হতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেল সত্যেন্দ্রনাথ দত্তে। তিনি তাঁর সমকালীন কবিদের তুলনায় রচনাশক্তিতে শ্রেষ্ঠ, সর্বতোভাবে যুগপ্রতিভূ এবং রবীন্দ্রনাথের পাশে রাখলেও তাঁকে চেনা যায়। সমালোচক বুদ্ধদেব বসু সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিপ্রতিভার আলোচনা করে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকাটি দেখাতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রানুজ বাঙালি কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ এককালে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করে বাংলা কবিতার শীর্ষচূড়ায় আরোহণ করেছিলেন। তাঁর ভাষা, ছন্দ, শব্দ প্রয়োগের উজ্জ্বল অভিনবত্ব বাংলা কবিতার আসরে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তিনি কাব্যরসিক

সমালোচকদের কাছে 'ছন্দের যাদুকর' এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী শব্দ-শিল্পীরূপে অভিনন্দিত হয়েছিলেন। ১৮৮২ থেকে ১৯২২ কবি সত্যেন্দ্রনাথের জীবৎকাল এবং তাঁর কাব্য প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ সুদীর্ঘ বাইশ বৎসরের কাব্য সাধনায় তিনি চৌদ্দটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন এবং ছন্দের নানা পরীক্ষানিরীক্ষায় ও অনুবাদে সফলতা অর্জন করেছেন।

তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের তালিকা যথাক্রমে সবিতা, সন্ধিক্ষণ, বেণু ও বীণা হোমশিখা, তীর্থসলিল, তীর্থরেণু, ফুলের ফসল, কুহু ও কেকা, তুলির লিখন মণিমঞ্জুষা, অভ্র আবীর, হসন্তিকা, বেলা শেষের গান, বিদায়-আরতি। তাছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ 'কাব্যসঞ্চয়ন' নামে প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতার একটি সঙ্কলন করেছিলেন, এবং সত্যেন্দ্রনাথের 'শিশুকবিতা' নামে একটি সংগ্রহে শিশুদের উপযোগী কবিতাবলী স্থান লাভ করেছে। তাঁর উল্লেখিত কাব্য তালিকায় তীর্থসলিল, তীর্থরেণু, মণিমঞ্জুষা অনুবাদ কাব্য।

সত্যেন্দ্রনাথ যে যুগে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ভারতের ইতিহাসে তা যেমন এক ঝড়ের যুগ, ইউরোপের ইতিহাসের তা এক যুগসন্ধির কাল। যদিও তাঁর কবিতায় রবীন্দ্র-প্রভাব বর্তমান, তথাপি যে রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বরতায় 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করেছিলেন, সেই সচেতন প্রাখর্য সত্যেন্দ্রনাথে অনুপস্থিত। যদিও সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার অন্যতম বিষয় স্বাধীনতাবোধ, তবুও তিনি রাজনৈতিক কর্মপ্রবাহ পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের শ্রেয় এবং প্রেয় তপস্যাকেই সত্য বলে মনে করেছেন। তাঁর জীবনে ছিল না কল্লোলের উদ্দামতা, নজরুলের বর্ণবহুল প্রগলভতা। তিনি রবীন্দ্রবৃত্তে থেকে চঞ্চলহীন মসৃণ জীবনকেই বরণ করে নিয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সমকালীন কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রমথ চৌধুরী, করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, কুমুদরঞ্জন, যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, কালিদাস রায় এবং নজরুল ইসলাম। সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রভক্ত কবি হয়েও উল্লিখিত কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর মানসিক মিলন ছিল না, সত্যেন্দ্রনাথের কবিচিত্তের মৌলিক কেন্দ্রবিন্দুর আবিষ্কারের জন্য তাঁর চিত্ত উদ্বোধনের কারণ নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সত্যেন্দ্রনাথ স্বাজাত্যভিমানমূলক ভাব, ঘটনা, ব্যক্তি নিয়ে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। দেশের ভৌগোলিক সৌন্দর্য, ঐতিহাসিক তথ্য ও পুরাণ-ঐতিহ্যের মাহাত্ম্য তাঁর বহু কবিতায় কীর্তিত। লঘু তরল খেয়ালী কল্পনামূলক কবিতা যেমন তিনি লিখেছেন তেমনি আবার প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা রচনাতেও তাঁর আগ্রহের অভাব ছিল না। তিনি সমুদ্র, পর্বত, নদী, ঋতু প্রেম, রাজনীতি প্রভৃতি বহু বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বাংলাদেশে যে যৌবন শক্তিকে জাগ্রত করেছিল সত্যেন্দ্রনাথের বহু কবিতায় তার পরিচয় আছে। তিনি সবুজপত্র পত্রিকা-প্রসঙ্গে রচিত একটি কবিতায় 'যৌবনে দাও রাজটীকা'-বলে আহ্বান জানিয়েছেন—'আমরা সবুজ

অসংকোচে, আমরা তাজা গৌরবে / আমোদ করি সবুজ মোহে উশীর ঘন সৌরভে।'

সত্যেন্দ্রনাথের বহু কবিতায় বৈষ্ণব ভাবালুতা একটা সাধারণ প্রাণধর্ম। বৈষ্ণব ভাব-রসের মধ্যে যে নারীসুলভ পেলবতা আছে সত্যেন্দ্রনাথের যৌবন প্রবুদ্ধ পৌরুষ তাকে বরণ করতে চায় নি। তাঁর ধ্যানের কৃষ্ণ শক্তিরূপেই আবির্ভূত। কঠিন বীর্যে পাপীর বিনাশের জন্যই আবির্ভূত হন। কবির ঈশ্বর চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর পরীক্ষা, সফল অশ্রু, আকিঞ্চন, নমস্কার, দেবদর্শন প্রভৃতি কবিতায়। সত্যেন্দ্রনাথের প্রেম বিষয়ক কবিতাগুলি 'বেণু ও বীণায়' আছে; তবে প্রেমের কবিতায় তিনি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন নি।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর নানা কবিতায় প্রকৃতি চেতনার পরিচয় দিয়েছেন এবং এই প্রকৃতি চেতনা প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন ঋতু বিষয়ক পুষ্প বিষয়ক, সমুদ্র পর্বত ও নদী বিষয়ক কবিতায়। প্রকৃতি চিরকালই কবিতার প্রিয় বিষয়। রোমান্টিক কবিদের হাতে পড়ে প্রকৃতি হয়ে দাঁড়াল মানব জগতের তুলনায় এক উচ্চতর সত্তা।

সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা দেশের ষড় ঋতুর লীলা মহোৎসবে যোগ দিলেও তাঁর কবিতায় বর্ষারই প্রাধান্য। বর্ষা বিষয়ক কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: বর্ষা, ইলশেগুঁড়ি, যক্ষের নিবেদন, প্রাবৃটের গান, মেঘের কাহিনী, মেঘের বারতা, শ্রাবণী, কাজরী ইত্যাদি। বসন্ত ঋতু বিষয়ক কবিতার মধ্যে আছে জ্যোৎস্নামদিরা, নববসন্তে, মধুমাসে, ফাগুনে ইত্যাদি। সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-ঋতু ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর ঋতু বিষয়ক কবিতায় কল্পনা অপেক্ষা বস্তুচিত্রের প্রাধান্য বেশী। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে ফুল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 'ফুলের ফসল' নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ আছে। বিভিন্ন ফুল বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাশফুল, আফিমের ফুল, চম্পা, একটি চামেলীর প্রতি, জবা, ভুঁই চাঁপা, আলোকলতা, গোলাপ, সূর্য-মল্লিকা, লজ্জাবতী, কামিনী, জুঁই, করবী, বকুল, মহুয়া, হাস্নুহানা, পারিজাত কেতকী, কাঞ্চন ইত্যাদি। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে সমুদ্র অধিক ব্যক্তিত্বে প্রতিফলিত। পর্বত তাঁকে বিশেষ আকর্ষণ করে নি। তবুও সত্যেন্দ্রনাথের পর্বত বিষয়ক, মূলতঃ হিমালয় বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিমালয়াষ্টক, কাঞ্চন শৃঙ্গ, মেঘলোকে, হরমুকুট ইত্যাদি। তাঁর সমুদ্র বিষয়ক কবিতাগুলি 'অভ্র আবীরে' সঙ্কলিত হয়েছে। সমুদ্র বিষয়ক অধিকাংশ কবিতার উৎস পুরীর সমুদ্রতীর। কবিতাগুলি যথাক্রমে পুরীর চিঠি, সমুদ্রাষ্টক, পূর্ণিমা রাত্রে, সমুদ্রের প্রতি, সিন্ধুতাণ্ডব, অন্ধকারে সমুদ্রের প্রতি, সমুদ্রপান প্রভৃতি; সত্যেন্দ্রনাথের নদী বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদ্মার প্রতি, গঙ্গার প্রতি, শোণ নদের প্রতি, মুক্তবেণী, মহানদী, রূপনারায়ণ প্রভৃতি। সত্যেন্দ্রনাথের রাজনীতি বিষয়ক কবিতার রূপসাফল্য সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে। ঘটনার সমসাময়িকতা তাকে আলোড়িত করলেও তিনি এ জাতীয় কবিতা রচনায় সবিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে পারেন নি।

সত্যেন্দ্রনাথের লঘু খেয়ালী কল্পনা-সৃষ্ট কবিতাগুলির সাফল্য স্বীকার্য। এই

কবিতাতে শুধু যে পলায়নবাদী মনোবৃত্তি প্রধান হয়ে উঠেছে তাই নয়, এখানে প্রাণোচ্ছলচাঞ্চল্য ও দায়িত্বহীন জয়গানও লক্ষ্য করা যায়। 'সবুজপরী' কবিতায় কবি সবুজকে প্রাণের ধূসরতার উপর অধিকার বিস্তারের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। 'সবুজ পরী, সবুজপরী। সবুজপাখা দুলিয়ে যাও / এই ধরণীর ধূসর পটে সবুজ তুলি বুলিয়ে দাও'। সত্যেন্দ্রনাথের মানবপ্রীতিমূলক কবিতার মধ্যে মেথর, শূদ্র, জাতির পাঁতি কবিতা তিনটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবির স্বাধীনতা প্রীতি বিষয়ক কবিতাগুলি হল: চরকার গান, চরকার আরতি, সন্ধিক্ষণ, জাগৃহী, নির্জলা একাদশী প্রভৃতি। সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ বিষয়ক কবিতাগুলি সঙ্কলিত হয়েছে তার 'তীর্থরেণু', 'তীর্থ সলিল' এবং 'মণিমঞ্জুষা' গ্রন্থে। সত্যেন্দ্রনাথ ফার্সী, ফরাসী এবং ইংরোজী ভাষা ছাড়াও চীন, জাপান, আরব, মিশর, রুশ, তিব্বত, গ্রীস, প্রভৃতি সমস্ত সাহিত্যেরই অনুবাদ করেছেন। তিনি শেক্সপীয়র, ব্লেক, সুইনবার্ন, শেলী, কীটস; এ ছাড়া ফারসী ভাষায় হাফেজের কবিতা এবং সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দের যাদুকর রূপেই খ্যাতিমান হয়ে আছেন। বিভিন্ন সংস্কৃত কাব্যের ছন্দ তিনি বাংলা কাব্যে আনয়ন করেছেন। রবীন্দ্রপ্রতিভার কালে আবির্ভূত হয়ে বিচিত্র বিষয়ের চর্চায় মনোনিবেশ করে তিনি বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগ আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, একথা বলা যেতে পারে।

বাংলা কবিতার বিকাশে সত্যেন্দ্রনাথের ভূমিকা স্মরণীয় হলেও আজ একথা স্বীকার করতে হয় যে রবীন্দ্রনাথ পড়া থাকলে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাপাঠের প্রয়োজনীয়তা নেই। রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যাপ্ত প্রতিভার পর তাঁর স্থান যেন নিতান্তই নিষ্প্রভ। বুদ্ধদেব বসুর ভাষাতেই বলা যায়—'রবীন্দ্রনাথের বিরাট মহাজনী কারবারের পর খুচরো দোকানদার হওয়াতে লজ্জার কিছু নেই, সেটাকে প্রায় অনিবার্য বলা যায়, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের মানপত্রও আপাতদৃষ্টিতে এক বলে বাংলাকাব্যে তাঁর আসন সংশয়াচ্ছন্ন। তিনি ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথেরই সাজ সরঞ্জাম—সেই ঋতুরঙ্গ, পল্লীচিত্র, দেশপ্রেম, কিন্তু ফুল, পাখি, চাঁদ, মেঘ, শিশির এইরকম প্রত্যেকটি শব্দের বা বস্তুর পিছনে রবীন্দ্রনাথে যে আবেগের চাপ পাই, যে বিশ্বাসেব উত্তাপ, * * * সেই প্রাণবন্ত প্রবণতার স্পর্শ সত্যেন্দ্রনাথে পাই না।' সত্যেন্দ্রনাথের অনুভূতি যেন কৃত্রিম, কবিতা লেখার জন্যই তা যেন ফেনিয়ে তোলা। রবীন্দ্রনাথের দিব্যদৃষ্টি সত্যেন্দ্রনাথে দিবাস্বপ্নে পরিণত হয়েছে; বিশ্বসত্তার প্রতীক যে ফুল তা হয়েছে শৌখিন খেলনা; 'ভাবুকতা হয়েছে ভাবালুতা, সাধনা হলো ব্যসন, আর মানসসুন্দরীর পরিণাম হলো লালপরী নীল পরীর আমোদ-প্রমোদে।' রবীন্দ্রনাথের ছন্দের মদিরতা, মধুরতা, অন্তর্লীনতা, শিক্ষা, সংযম, রুচি—এ সমস্তের পরিবর্তে সত্যেন্দ্রীয় ছন্দে এলো মিহিসুর, ঠুনকো আওয়াজ। তাঁর ছন্দের জন্যই যেন ছন্দ লেখা; উদ্দেশ্যহীন কসরৎ। সত্যেন্দ্রনাথ যখন খ্যাতির মধ্য গগনে তখনও অনেক অন্তঃসারশূন্য কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে; অবশ্য কালের সম্মার্জনী ইতিমধ্যে তাদের বিদূরিত করেছে। এসব কথা বলার অর্থ কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের

কবিপ্রতিভার অবমূল্যায়ন নয় ; বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর সঠিক অবস্থান নির্ণয়।

● রবিতাপের বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসা যখন রাজদ্রোহের সামিল তখনই 'বিদ্রোহী' কবিতার নিশান উড়িয়ে নজরুল ইসলামের আবির্ভাব—বিনি বুদ্ধদেবের ভাষায় 'রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম মৌলিক কবি।'

'বাংলা সাহিত্যে কবি হিসাবে কাজী নজরুল ইসলাম একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার উজ্জ্বলতায় বাংলা সাহিত্য গগন যখন উদ্ভাসিত, তাঁর প্রতিভার প্রভাবের বাইরে সাহিত্য সৃষ্টি যখন মানস কল্পনার বহির্ভূত, ঠিক সে সময়ই অগ্নিবীণা হাতে নিয়ে বিদ্রোহী বেশে হাজির হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্র প্রতিভাকে অস্বীকার না করেও আপন সুর ও স্বরের বিশিষ্টতায় তিনি কাব্য-মোদীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কাব্যরীতি, ধ্যানধারণা প্রভৃতি কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, ও যতীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বসূরী হলেও প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বাংলা দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখবেদনা ও বিদ্রোহ বিক্ষোভের ক্ষেত্রে কবি নজরুল ইসলাম যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি তাতে কোন সন্দেহ নাই। বাংলাকাব্যে বিদ্রোহ, পৌরুষ ও যৌবনের ভাষ্যকার তিনিই প্রথম। তাঁর বিদ্রোহমূলক কবিতা পরবর্তীকালে, আধুনিক কবিদের পথের দিশারী হয়ে রয়েছে।'[১]

নজরুল ইসলামের কাব্যগুলি হলো যথাক্রমে—অগ্নিবীণা (১৯২২), দোলনচাঁপা (১৯২৩), বিষের বাঁশী (১৯২৪), ভাঙার গান (১৯২৪), ছায়ানট (১৯২৪), পূবের হাওয়া (১৯২৫), সাম্যবাদী (১৯২৫), চিত্তনামা (১৯২৫), সর্বহারা (১৯২৬), ঝিঙে ফুল (১৯২৬), ফণিমনসা (১৯২৭), সিন্ধু হিন্দোল (১৯২৭), জিঞ্জির (১৯২৮), চক্রবাক (১৯২৯), সন্ধ্যা (১৯২৯), চোখের চাতক (১৯২৯), প্রলয়শিখা (১৯৩০), নির্ঝর (১৯৩৮), নতুন চাঁদ (১৯৪৫), মরু ভাস্বর (১৯৫৭), শেষ সওগাত (১৯৫৮), ঝড় (১৯৬০)।

কবির বিদ্রোহী রূপ, দেশপ্রেম, রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে যে বিক্ষোভ, বেদনা, আশা, নিরাশা তা রূপায়িত হয়েছে অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, সাম্যবাদী, সর্বহারা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থকে কেন্দ্র করে। মানবপ্রেমিক নজরুলের বাৎসল্য রস, প্রকৃতি ভাবনা প্রভৃতির প্রকাশ ঘটেছে তাঁর দোলনচাঁপা, ছায়ানট, সিন্ধু হিন্দোল প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের নানা কবিতায়। নজরুলের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ অগ্নিবীণা অনুভূতির প্রাবল্যে, সীমাহীন প্রাণ প্রাচুর্যে, অদম্য তারুণ্যে অপরিসীম তেজস্বিতায়, সর্বোপরি প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্বে বাংলা সাহিত্যে অনন্য। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নজরুল 'বিদ্রোহী কবি' রূপে অভিহিত হন। 'বিদ্রোহী' কবিতায় ভাবগত তারল্য, বয়নগত শিথিলতা থাকলেও একথা সত্য যে 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি অত্যাচারী মানব-হৃদয়ের নিদারুণ বেদনায় ব্যথিত ও আর্ত অথচ সত্য

সুন্দর মানবজীবন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় ব্যগ্র—

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

'ধূমকেতু' কবিতাটিতে কবিসত্তার স্বরূপ প্রতিফলিত। ধূমকেতু যেন অনেকটা নজরুলের শিল্প ও সাহিত্য জীবনের প্রতীক। 'কামাল পাশা' কবিতাটি তুর্কীর নবসৌভাগ্যের প্রতিষ্ঠাতা কামাল পাশার নামে রচিত। যুদ্ধের জয়বাদ্যের তালে তালে যোদ্ধাদের যে জয়োল্লাস আলোচ্য কবিতাটিতে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যে তা সত্যই অভিনব। নজরুলের 'দোলনচাঁপা' কাব্যগ্রন্থটি প্রেসিডেন্সী জেলে অবস্থানকালে রচিত। বিদ্রোহী কবির যে মানসলোক 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থে অতৃপ্ত প্রেমপিপাসায় ক্রন্দিত ছিল, আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে তা অসামান্য কাব্যপ্রভায় উজ্জ্বল। 'দোলনচাঁপা'তে কবিমনের প্রেমের অস্থিরতা ব্যক্ত। 'পূজারিণী কবিতায় কবি দেহগত প্রেমের অদ্ভুত রহস্য উদ্‌ঘাটনে মগ্ন। পূজারিণী যেন কবির মানসী প্রতিমা। আলোচ্য কবিতায় নজরুলের প্রেমধারার বিশেষ প্রকাশ সংলাপ এবং প্রেমকাব্যের মূল সুরও এখানে ধ্বনিত। 'দোলনচাঁপা' কাব্যগ্রন্থে কবি দলবৃত্ত ছন্দে প্রিয়ার অতুলনীয় রূপ বর্ণনা করেছেন—'হাসির ভান / ব্যথার শ্বাস / চপলা চোখ / আঁখির লাস / নয়ন নীর / অধর ফল / রাতুল তল / রাতুল ভুল / দোদুল দুল / দোদুল দুল।'

নজরুলের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ, 'বিষের বাঁশী' সুর, ভাব ও স্বরে 'অগ্নিবীণা'র সমগোত্রীয়। নিপীড়িতা দেশমাতা আর কবির উপর বিধাতার নিপীড়ন কবিকে আলোচ্য কাব্য রচনায় প্রেরণা জুগিয়েছে। নজরুলের বিদ্রোহের মূলে ছিল অকৃত্রিম মানবপ্রীতি; আর তার ফলেই রোমান্টিক কবিচিত্ত মানুষের নির্যাতন, লাঞ্ছনা, শোষণে নিদারুণভাবে ব্যথিত হয়ে এ সমস্তের উচ্ছেদে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। 'বিষের বাশী'র বিদ্রোহ মূলত স্বদেশের পরাধীনতার বিরুদ্ধে কবির বজ্রোদগীর্ণ কণ্ঠস্বর— / যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামী ভাই করব সেথাই বিদ্রোহ! / ধামা ধরা! জামাধরা। মরণ-ভীতু! চুপ রহো / আমরা জানি সোজা কথা, পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ। / এই দুলালুম বিজয় নিশান মরতে আছি—মরব শেষ'। 'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থেও কবির বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত—

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল, কর রে লোপাট
রক্তজমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ!

'মিলনগান' কবিতায় হিন্দু মুসলিম মৈত্রীর কথা প্রকাশিত—

(তোরা) করলি কেবল অহরহ নীচ কলহের গরল পান। / (আজো) বুঝলি না হায় নাড়ীছেঁড়া মায়ের পেটে ভায়ের টান / (ঐ) বিশ্বছিঁড়ে আনতে পারি, পাই যদি তোদের প্রাণ।/ (তোরা) মেঘবাদলের বজ্র বিষাণ (আর) ঝড় তুফানের লাল নিশান।

'দোলনচাঁপা' কাব্যে যে প্রেমসুরের সূচনা 'ছায়ানটে' তা কল্পনার প্রসারতায়, নিসর্গপ্রীতির গভীরতায় ও মানবিক প্রেমের আন্তরিকতায় আরও হৃদয়গ্রাহী ও পরিণত। আলোচ্য কাব্যের প্রথম কবিতা 'বিজয়িনী'-তেই কবির প্রেমাকাঙ্ক্ষার রূপটি প্রকাশিত। বিদ্রোহরূপ ব্যতীত কবির প্রেমাস্পদার কাছে আত্মসমর্পণকারী রূপটি এখানে ব্যক্ত—

হে মোর রাণি। তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে
আমার বিজয় কেতন লুটায় তোমার চরণ তলে এসে।

'পুবের হাওয়া' কাব্যগ্রন্থে পূর্ববর্তী 'ছায়ানটের' ন্যায় করুণ মধুর প্রেমের ঝংকার। 'চিত্তনামা' কাব্যগ্রন্থখানি চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুতে শোকাকুল নজরুলচিত্তের প্রকাশ। 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত সাম্যবাদী কবিতাসমষ্টি 'সর্বহারা' প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে 'সাম্যবাদী' নামে প্রকাশিত হয়। 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থে নজরুলের সাম্যবাদী ধারণার প্রকাশ লক্ষ্যগোচর—

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান,
যেখানে মিশিছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।

মানবতার জয়গানে মুখর কবি বিশ্বাস করেন—

বন্ধু তোমার বুক ভরা লোভ দু চোখে স্বার্থ ঠুলি,
নতুবা দেখিতে তোমারে সেবিতে দেবতা হয়েছে কুলি।

বারাঙ্গনাও তাঁর কাছে মাতৃরূপে বন্দনীয়া; তাঁর কাছে পুরুষ নারীর কোনো ভেদাভেদ নেই—

১. কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থ তু ও গায়ে?
হয়তো তোমায় স্তন্য দিয়াছে সীতা-সম সতীমায়ে।

২. সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।

'ফণিমনসা' কাব্যগ্রন্থে বিদ্রোহ রূপের প্রকাশের সঙ্গে আছে শ্রমিকজাগরণ সম্পর্কিত চিন্তা। 'সিন্ধু হিন্দোল' নজরুলের প্রেমভাবনার কাব্য। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের 'গোপনপ্রিয়া', 'অনামিকা', 'ফাল্গুনী', 'মাধবী প্রলাপ' প্রভৃতি উল্লেখ্য কবিতা। 'জিঞ্জির' কাব্য গ্রন্থের 'অঘ্রাণের সওগাত' কবিতায় কবি নতুন সোনার ফসলের আগমনে গ্রামজীবনের হাস্যমধুর ঘটনাকে ব্যক্ত করেছেন। 'ঈদমোবারকে' কৃত তাৎপর্য ও ইসলামের সত্যসুন্দর রূপ প্রকাশিত। 'চক্রবাক' কাব্য গ্রন্থের

মূল সুর প্রেম—এ প্রেমে বিরহের সুর ধ্বনিত। পুরাতন স্মৃতি কবিমনকে ব্যথিত করে তুলেছে। 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থে কবির বিদ্রোহ ও সমাজসচেতনতা প্রকাশিত—পরাধীন ভারতের জ্বালায় জর্জরিত কবি দশভুজাকে প্রলয়ংকরী বেশে অবতীর্ণ হতে অনুরোধ করেছেন। 'প্রলয় শিখা' কাব্যগ্রন্থের নামকরণেই তার বক্তব্য প্রকাশিত। প্রলয়ের দেবতা নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যে বিশ্বব্যাপী ধ্বংসের তরঙ্গ উত্থিত হয়েছে—অত্যাচারীর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। 'চিরজনমের প্রিয়া' কবিতাতে 'নতুন চাঁদ' কাব্যগ্রন্থের মূল সুর আভাসিত, কবিতাটি হারানো প্রিয়ার সন্ধানে একটি অশ্রুদীপ্ত রোমান্টিক কবিতা—

> কোন সে অতীতে মহাসিন্ধুর মন্থন শেষে প্রিয়া,
> বেদনাসাগরে চাঁদ হয়ে উঠে তোমারে বক্ষে নিয়া।
> পালাইতে ছিনু সুদূরে শূন্যে। নিঠুর বিধাতা পথে
> তোমারে ছিনিয়া লয়ে গেল হায় আমার বক্ষ হতে।

'শেষ সওগাত' কাব্যগ্রন্থে নজরুলের পুরাতন কাব্যধারার প্রকাশ। 'চিরবিদ্রোহী' কবিতাটি 'বিদ্রোহী' ও 'ধূমকেতু' সমপর্যায়ের কবিতা। বিধাতার প্রতি গভীর অভিমান থেকেই কবির বিদ্রোহমনস্কতা।

নজরুলের কাব্য সাধনায় সংহত ও ভাবগম্ভীর কাব্য সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা না গেলেও, তার কাব্যের নতুনত্ব অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, মৌলিক কবিচরিত্রের দিক থেকে তিনি যতীন্দ্রনাথ বা মোহিতলালের সমধর্মী নন। তিনি ভাষাবিন্যাসে সর্বত্র ধ্রুপদী রীতির উপাসক নন, কবিতার গঠনপ্রকৃতির দিক থেকেও একথা সত্য। নজরুলের ভাষা ও ছন্দের কুশলতা প্রকাশ পেয়েছে অনায়াস কবিধর্মে—সর্বভাবজাত আবেগ ও অনুপ্রেরণাকে আশ্রয় করে। যে প্রাণসম্পদের প্রাচুর্য ও উদ্দাম গতিবেগ নিয়ে তিনি বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাই তাঁর কবিতার ভাবসংহতি ও ঘনবদ্ধতার অন্তরায়। তাঁর বিদ্রোহের লক্ষ্য সামাজিক অত্যাচারের অবসান বলেই তিনি যুগমানসের প্রতিভূ রূপে বিদ্রোহীসত্তার জয়গান করেছেন। ফলে তাঁর কবিতায় রোমান্টিক কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে উচ্চকিত ঘোষণা। 'নজরুলের মানসিকতায় মুক্তিকামী চেতনার তীক্ষ্ণতা গভীর প্রেরণায় সৃষ্টি করেছিল, এবং এ কারণেই যুগসমস্যার উচ্চকণ্ঠ কবিরূপে তিনি স্বদেশের প্রাণসত্তায় ব্যাপক আলোড়ন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। দার্শনিক বিশ্বাসে তাঁর কাব্য দীপ্তিমান না হলেও যুগ চেতনায় তাতে যে সারল্য প্রকাশ পেয়েছে তাই অনাড়ম্বর কারুকলায় প্রকাশিত। যুগচেতনায় এখানেই নজরুলের স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু নজরুল কাব্যের অসংযম ও উচ্ছৃংখলতাকে মূলধন করে তাঁকে সফল কবিকর্মীর প্রাপ্য আসন থেকে বঞ্চিত করা গেলেও নজরুল কাব্যের মৌলিকত্বকে অস্বীকার করা যাবে না। কারণ নজরুল কাব্যে যুগাভিসারী জীবন বোধের যে তীব্রতা আছে আর প্রাণধর্মের সজীবতায় তিনি

যে নতুন রীতির প্রবর্তন করলেন বাংলা কাব্যে তাঁর উৎস সন্ধান প্রায় অসম্ভব।"[২] আর এই কারণেই বুদ্ধদেব বসুর মতে, 'নজরুল ইসলামকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের পরে অন্য একজন কবি—ক্ষুদ্রতর নিশ্চয়ই, কিন্তু নতুন। এই যে নজরুল, রবিতাপের চরম সময়ে রাবীন্দ্রিক বন্ধন ছিঁড়ে বেরোলেন, বলতে গেলে অসাধ্যসাধন করলেন, এটাও খুব সহজেই ঘটেছিলো, এর পিছনে সাধনার কোনো ইতিহাস নেই, কতগুলো আকস্মিক কারণেই সম্ভব হয়েছিলো এটা। কবিতার যে-আদর্শ নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, নজরুলও তা-ই, কিন্তু নজরুল বৈশিষ্ট্য পেয়েছিলেন তাঁর জীবনের পটভূমিকার ভিন্নতায়। মুসলমান তিনি, সেই সঙ্গে হিন্দু মানসও আপন ক'রে নিয়েছিলেন—চেষ্টার দ্বারা নয়, স্বভাবতই। তাঁর বাল্য-কৈশোর কেটেছে—শহরে নয়, মফস্বলে, স্কুল-কলেজে 'ভদ্রলোক' হবার চেষ্টায় নয়, যাত্রাগান লেটো গানের আসরে, বাড়ি থেকে পালিয়ে রুটির দোকানে, তারপর সৈনিক হ'য়ে। এই যেগুলো সামাজিক দিক থেকে তাঁর অসুবিধে ছিলো, এগুলোই সুবিধে হ'য়ে উঠলো যখন তিনি কবিতা লেখায় হাত দিলেন। যেহেতু তাঁর পরিবেশ ছিলো ভিন্ন, এবং একটু অন্য ধরনের আর যেহেতু সেই পরিবেশ তাঁকে পীড়িত না ক'রে উল্টে আরো সবল করেছিলো তাঁর সহজাত বৃত্তিগুলোকে, সেইজন্য, কোনোরকম সাহিত্যিক প্রস্তুতি না-নিয়েও শুধু আপন স্বভাবের জোরেই রবীন্দ্রনাথের মুঠো থেকে পালাতে পারলেন তিনি, বাংলা কবিতায় নতুন রক্ত আনতে পারলেন। তাঁর কবিতায় যে পরিমাণ উত্তেজনা ছিলো সে-পরিমাণ পুষ্টি যদিও ছিলো না, তবু অন্তত নতুনের আকাঙ্ক্ষা তিনি জাগিয়েছিলেন; তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব যদিও বেশি স্থায়ী হ'লো না, কিংবা তেমন কাজেও লাগলো না, তবু অন্তত এটুকু তিনি দেখিয়ে দিলেন যে রবীন্দ্রনাথের পথ ছাড়াও অন্য পথ বাংলা কবিতায় সম্ভব। যে-আকাঙ্ক্ষা তিনি জাগালেন, তার তৃপ্তির জন্য চাঞ্চল্য জেগে উঠলো নানা দিকে, এলেন 'স্বপনপসারীর' সত্যেন্দ্রদত্তীয় মৌতাত কাটিয়ে, পেশীগত শক্তি নিয়ে মোহিতলাল, এলো যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অগভীর—কিন্তু তখনকার মতো ব্যবহারযোগ্য—বিধর্মিতা, আর এই সব পরীক্ষার পরেই দেখা দিলো 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর নতুনতর প্রচেষ্টা, বাংলা সাহিত্যের মোড় ফেরার ঘণ্টা বাজলো।'

রোমান্টিক চেতনা যদি জীবননিবিক্ত না হয় তবে তা নিছক ভাববিলাসে পর্যবসিত হতে বাধ্য। ভাববিলাস তো যথার্থ রোমান্টিকতা নয়, জীবনের নিগূঢ় সত্যের দিকে যার অভিযাত্রা এবং সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত যার প্রকাশ তাকেই সার্থক রোমান্টিকতা বলা উচিত। নজরুলকাব্যে মানবতার যে আদর্শ তা স্বাভাবিকভাবে নির্যাতিতের আত্মপ্রতিষ্ঠা কামনা করেছে; যেখানে তার বেদনাবোধ সমস্ত রকম শিল্পসুলভ রহস্যের অবগুণ্ঠন সরিয়ে বলিষ্ঠভাবে উৎসারিত হয়েছে। তাঁর পটভূমিকাও সমকালীন যুগসমস্যা ও ঐতিহ্যবোধ। ফলে দেখা যায় আধুনিকতার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যই তাঁর কবিতায় প্রকাশিত। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যই তার

কবিতায় আভাসিত।

'আধুনিক বাংলা কবিতার সাধারণ লক্ষণগুলোর মধ্যে অন্ততঃ কয়েকটি ভিত্তিমূল নজরুলের কবিতাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। নজরুলের সাধনার বড় সার্থকতা·এই যে, রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতনভাবে বিদ্রোহী না হয়েও স্বচ্ছন্দে রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে মুক্তি। ভাবধর্মের সঙ্গে শৈলী বা আঙ্গিকের ক্ষেত্রে আধুনিক কবিতায় যে বিবিধ পরিবর্তন দেখা দেয়, তার বিশিষ্ট লক্ষণগুলো অবশ্য নজরুলে স্পষ্ট নয়। তবে প্রবাদ, চলতি শব্দ ও গ্রাম্য শব্দ ও বিদেশী শব্দ ব্যবহারে, ভাষা সম্বন্ধে শুচিবায়পরিহারে নূতন চিত্রকল্প সৃষ্টিতে, বিষয় বৈচিত্র্যে ও ছন্দ স্বাচ্ছন্দে নজরুল তিরিশের আধুনিক কবিদের পূর্বসূরী। ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে নজরুলেব পটভূমি বিস্তৃত, হিন্দু, মুসলমান ও ইরানীয় ঐতিহ্য তাঁর মানসকে অভিষিক্ত করেছে। মুসলমানের সন্তান হলেও তিনি কেবল মুসলিম বা ইসলামী ঐতিহ্যের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি নিজের ধর্মীয় ও সামাজিক ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে গিয়েছেন। বাংলাদেশের অপর একটি প্রধান ধারা হিন্দু ঐতিহ্য থেকেও তিনি সমানভাবে গ্রহণ করেছেন এবং তার সার্থক ব্যবহার কবেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অপর কোন কবি বাংলার দুটি প্রধান ঐতিহ্যের ধারা থেকে নজরুলের মতো নিপুণভাবে উপাদান সংগ্রহ করে তা সাহিত্যে ব্যবহার করতে সক্ষম হননি, সে দিক থেকে তিনি অনন্য।'[৩]

'নজরুল-কবিভাবনা ও মানবতার আদর্শ সংগঠনে গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করেন নি। সাহিত্য শিল্পের 'বিষয় বা প্রকৌশল সম্পর্কে তাঁর কোনো মোহ ছিল না। নজরুলের মানস প্রবণতায় রয়েছে সমকালীন যুগপ্রেরণার প্রেক্ষাপটে মানবীয় সমস্যার বিচার। সমকালীনতা তাঁর কাব্যের 'বিষয় হলেও কবিব্যক্তিত্বের নবস্ফুরিত বিচ্ছুরণে তা সমকালীনতার স্তর উত্তীর্ণ হয়ে মহৎ সম্ভাবনায় বাংলা কবিতাকে সমুত্তীর্ণ করিয়েছে।

নজরূলের কাব্যে প্রবল ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয়েছে, তাই বিমূর্ত জীবন চেতনা বা অপ্রত্যক্ষ সত্তার কাছে আত্মসর্পণের বিরুদ্ধে তাঁর মধ্যে জাগরণ দেখা গিয়েছে। সে কারণেই তাঁর কবিতায় সীমাকে ছাড়িয়ে অসীমে উত্তরণের বা দেহকে ছাড়িয়ে দেহাতীতে যাবার প্রয়াস নেই। তাঁর চিত্রকল্পে বাস্তব ঘটনার চেতনা বা উপস্থিতি প্রখর। কুলি, মজুর, শ্রমিক, জেলে, বারাঙ্গনা, ঝড়, তুফান, সমাধি, শ্মশান, বিদ্রোহ, বিপ্লব, মৃত্যু তাঁর চিত্রকল্পে ভিড় করেছে। প্রকৃতি নজরুলের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রকৃতিকে তিনি নিজের মনের চেহারায় প্রত্যক্ষ করেছেন, প্রকৃতিতে কোন সত্তা আরোপ করেননি। সমাজ সচেতনতা ও সাম্যবাদী চেতনা নজরুলের অন্যতম প্রধান সুর এবং বাংলা কাব্যে এ ধারাকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। ঐসব বৈশিষ্ট্য আধুনিক কবিতার পূর্বাভাস, তবে যতখানি নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী থাকলে যতখানি বুদ্ধি ও মননপ্রধান হলে তিনি আধুনিক কবি হতে পারতেন তা তার মধ্যে নেই। তিনি আবেগ প্রধান, নজরুল নিও ক্লাসিক গুণ আয়ত্ত করেন নি, নানা স্থানে তাঁর

মধ্যে পুরনো কবির স্বভাব প্রবল। মানুষ সম্পর্কে তাঁর ধারণা সাম্যবাদী চেতনার প্রেরণা লাভ করলেও ধর্মকে তিনি নাকচ করেন নি। স্রষ্টার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ রোমান্টিক বিদ্রোহ এবং তা অবিশ্বাস নয় কারণ মানুষ, ঘটনা ও বস্তুকে তিনি ধর্ম দ্বারা গৌরবান্বিত করেছেন, ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর যোগ অবিমিশ্র। সমাজ সচেতনতার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি তার বিশ্বাস একাগ্র নয়, আধুনিক বাংলা কবিতার জন্মলগ্নের কবি নজরুল ইসলাম, কিন্তু তিনি স্বয়ং খাঁটি আধুনিক কবি নন অথচ আধুনিক কবিতার সূত্রপাতে তাঁর ভূমিকা ও অবদান সর্বাপেক্ষা অধিক, কারণ তিনি বাংলা কবিতাকে এক স্থবিরতা ও বন্ধ্যাত্ব থেকে মুক্ত করেছেন।[৪]

● রাবীন্দ্রিক বন্ধন ছিঁড়ে বার হলেও, বাংলা কবিতার স্থবিরত্বে জঙ্গমত্ব সঞ্চার করলেও তাঁর কবিতায় সামাজিক ও রাজনৈতিক বিদ্রোহ যতখানি, কাব্যগত বিদ্রোহ ততখানি নয়। তিনি রবীন্দ্রনাথ বা সত্যেন্দ্রনাথের আদর্শ মেনে তৃপ্ত থাকতে পারলেন না। তার অতৃপ্তি অন্যের মনে সঞ্চারিত করে দিলেন। যে প্রক্রিয়া অচেতনভাবে তাঁর মধ্যে শুরু হলো, তা সচেতন স্তরে উঠে আসতে দেরি হলো না। এই যে সচেতন ভাবে সাহিত্যিক বিদ্রোহের যুগ একেই বলা যেতে পারে কল্লোলের যুগ। কল্লোল গোষ্ঠীর নতুনতর প্রচেষ্টাতেই 'বাংলা সাহিত্যের মোড় ফেরার ঘণ্টা বাজলো'।

তৎকালীন সাহিত্য জগতে রবীন্দ্র-বিরোধিতা ও রবীন্দ্র অনাধুনিকতা প্রমাণের যে আন্দোলন সুরু হয়েছিল সে প্রসঙ্গেই 'কল্লোল'-এর কথা মনে পড়ে। —'কল্লোল একটি 'যুগ' অভিধায় চিহ্নিত হতে পারে কিনা সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও, স্বীকারে দ্বিধাহীন হওয়াই সঙ্গত যে 'কল্লোল গোষ্ঠী' বাংলা সাহিত্যে এক পরিবর্তনের ঝড় তুলেছিল। 'সেই সময়টা বাংলা সাহিত্যে তরুণ নানা-সাহিত্যিকদের উত্থানের যুগ,…এই অভাজনের দল রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে আক্রমণ করে তাদের সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ করে'। সেই কালে 'দেশের বিদ্রোহী নবীন বীরেরা স্থবির রবীন্দ্রনাথের শাসন-নাশনে' উদ্যোগী, তাঁর বিরুদ্ধে তরুণদের অভিযোগ সোচ্চার— তিনি রোমান্টিক, তিনি বিগত কালের শিল্পী।

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবি সাহিত্যিক গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে মুখ্যতঃ দুটি অভিযোগ উপস্থিত করেছিলেন: প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ অনাধুনিক, দ্বিতীয়ত, তাঁর সৃষ্টিতে নাকি পায়ে-চলা মানুষের মিছিল অনুপস্থিত। এ অভিযোগ অবশ্য পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথে আত্মসমর্পণে প্রত্যাহৃত। তাঁদের উপলব্ধ সত্য ছিল—'সৃষ্টিতে সমাপ্তির রেখা টানেন নি রবীন্দ্রনাথ—তখনকার সাহিত্য শুধু তাঁরই বহুকৃত লেখনের হীন অনুকৃতি হলে চলবে না। পত্তন করতে হবে জীবনের আরেক পরিচ্ছেদ।'

'কল্লোল', 'কালি-কলম,' 'প্রগতি,' 'সংহতি,' 'লাঙ্গল', 'গণবাণী', 'গণশক্তি' প্রায় সমকালীন পত্রিকা। একই বছরে বাংলা সাহিত্যের আসরে আবির্ভূত হয়। 'কল্লোল', 'কালি-কলম' ও 'প্রগতি' গোষ্ঠীর লেখকগণ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অনাধুনি-

৪. কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সাহিত্য: রফিকুল ইসলাম।

কতার অভিযোগ এনেছিলেন। 'রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল'। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।' শুধু ভাবেই নয় ভাষায়, কারুকৃতিতে, শিল্পকর্মে 'কল্লোল' রবীন্দ্র-বিরোধিতা শুরু করেছিল। সেদিনকার 'কল্লোলে'র বিদ্রোহ বাণী ঘোষিত হয়েছিল অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উদ্ধত কণ্ঠে—

এ মোর অত্যুক্তি নয়, এ মোর যথার্থ অহংকার,
যদি পাই দীর্ঘ আয়ু, হাতে যদি থাকে এ লেখনী,
কারেও ডরি না কভু; সুকঠোর হউক সংসার
বন্ধুর বিচ্ছেদ তুচ্ছ, তুচ্ছতর বন্ধুর সরণি।
পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্রঠাকুর,
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
যুগ সূর্য ম্লান তার কাছে।

মূলতঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, যুবনাশ্ব, নজরুল ইসলাম, প্রবোধকুমার সান্যাল প্রমুখ মামুলি হবার 'আরামরমণীয়' পথ থেকে সরে এসে নিন্দা খ্যাতির মুকুট পরে শুরু করলেন সহজের পথ ত্যাগ করে স্বকীয়তার পথে যেতে। কিন্তু স্বকীয়তার পথ মানেই বিরোধিতা নয়। এ স্বকীয়তা প্রতিভার, এ স্বকীয়তা পরিপূর্ণতার। ১৯৩০-এর বাংলা প্রাণাবেগে উচ্ছল; রাজনীতিতে, সাহিত্যে, সমাজে নবজাগরণের উল্লাসমুখর জীবন জাহ্নবী। গান্ধীজীর অহিংস মেঘের আড়ালে বিপ্লববাদের বজ্র প্রচ্ছন্ন; ভাব জগতে কেন্দ্রীয় বিপর্যয়। ফলে, 'সত্য ভাষণের তীব্র প্রয়োজন ছিল যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে, তেমনি ছিল অচলপ্রতিষ্ঠ স্থবির সমাজের বিপক্ষে, কিন্তু ভুল হয়েছিল রবীন্দ্র-নাথকে অচলপ্রতিষ্ঠ মনে করায়; রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার পুরোধা রূপে অনুভাবিত লেখক গোষ্ঠিকে জিজ্ঞেস করলেন: কয়লার খনি বা পানওয়ালীদের কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসবে? এই রকমের কোনো একটা ভঙ্গিমার দ্বারা, যুগান্তরকে সৃষ্টি করা যায় এ কথা মানতে পারব না।

কল্লোল কেন্দ্রিক হাওয়া বদলের কালে তারুণ্যের সেই সংঘাতের দিনে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ মেনে নিতে না পারলেও রচনার মধ্যে তাঁরা দেখলেন 'রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক' মূর্তি।' 'অবাক হয়ে দেখলুম রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক মূর্তি'—আমরা আধুনিক বলতে যা ভাবছিলাম ঠিক তা নয়, কিন্তু তারই কোনো সার্থক রূপান্তর যেন আমাদের কল্পিত রবীন্দ্র যুগের সীমানা এক ধাক্কায় অনেক দূরে সরে গেলো; যেটাকে আমরা 'রবীন্দ্র যুগ' আখ্যা দিয়েছিলাম, সেটা যে নিজেই গতিশীল এবং পরিবর্তমান, তা বুঝতে পেরে অনেক ধারণা বদলে গেলো আমাদের।' 'যুদ্ধোত্তর নূতন সাহিত্য' এতদ্দেশীয়

তরুণ সাহিত্যিকদের সম্মুখে নূতন ভাবের জগৎ খুলিয়া দিতেছে। এই সব ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে তরুণ প্রাণে সাহিত্যে ও কলায় নূতন প্রেরণা আসে—নূতন কথা নূতন ভাবে নূতন ভঙ্গীতে প্রকাশ করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে ব্যাকুলতা দেখা দেয়। এই তরুণদের মতে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীনপন্থী, তাঁহার সাহিত্য প্রতিভা অস্তোন্মুখ।...... 'নূতন' সাহিত্য গড়িবার কাজে সেদিন কল্লোল, কালি কলম, লেখা, প্রগতি প্রভৃতির কী উৎকণ্ঠিত প্রয়াস দেখা গিয়াছিল। ঠিক এই সময়ে 'শেষের কবিতা'র আবির্ভাব বাংলার সাহিত্য সমাজকে চকিত করিয়া তুলিল।' 'তাই বিতর্কের সংক্ষুব্ধ কল্লোলিত অধ্যায় পার হয়ে রবীন্দ্র বিরোধিতা প্রণামে পর্যবসিত হল। তাঁর কাছে 'যিনি নবজাত, প্রায় সত্তর বছরে আবার তাঁর এক নূতন জন্ম। আবার হার মানতে হলো তাঁর কাছে, সেই আনন্দে তাঁকে প্রণাম জানালুম।'

বুদ্ধদেব বসু সহ অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম জানালেও একথা ইতিহাসগতভাবে সত্য যে কল্লোলগোষ্ঠির প্রচেষ্টাই বাংলা সাহিত্যে মোড় ফেরার ঘণ্টা বাজিয়ে ছিলো। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে সামগ্রিক জীবনে যে বিপুল পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, কল্লোলের পটভূমিকায় সেই যুদ্ধোত্তর কাল। 'কল্লোল' পত্রিকা বেচেঁছিলো সাত বছর (১৩৩০—১৩৩৬) আর এই সাত বছরেই বাংলা সাহিত্যে নতুন অধ্যায়ের পত্তন তার দ্বারা সম্ভব হয়েছিলো। কল্লোলের মাধ্যমেই তরুণ বাঙালি মন পেয়েছিলো আন্তর্জাতিক সাহিত্যের খবর, বাস্তব ও জনগণতান্ত্রিক চেতনা, যৌবনসংলগ্নতাবোধ, প্রেমের মনস্তাত্বিকতা, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের নতুন মূল্যবোধ, দুঃখাত্মকতা ও বিষাদচেতনা। ফ্লবেয়ার, জোলা, হামসুন, গর্কি, গোগোল, টুর্গেনিভ, দস্তয়ভস্কি টলস্টয়, মেটারলিঙ্ক বাংলা সাহিত্যে এলেন কল্লোলের মাধ্যমে। জীবনচর্যায় ও ও মানসিকতায় প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কাল বাংলাদেশে মোড় ফেরার কাল সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পূর্ববাহিত গ্রামীণ সুরের পরিবর্তে নাগরিক সুর, বিশ্বস্রোত আরও অর্থবহ হয়ে দেখা দিলো। নিশ্চিত স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কল্লোলীয় কবিরা আবির্ভূত হলেন। রবীন্দ্রসুলভ কল্পনার পরিবর্তে তাঁরা তার্কিকতা ও বাস্তববাদীর মনোভঙ্গি আনতে চাইলেন। বাংলাকাব্যে অরাবীন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ ও সুরের ক্রমাভিব্যক্তিতে কল্লোল গোষ্ঠীর অবদান নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। শুধু কবিতাতেই নয়, গল্প উপন্যাসেও শুরু হয়েছিলো বলিষ্ঠ পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রচেষ্টা। 'কল্লোলে'র মূল্যায়ন প্রসঙ্গে জীবেন্দ্র সিংহরায় তাঁর 'কল্লোলের কাল' গ্রন্থে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন 'যৌবনের জয়পতাকা উড়িয়ে কল্লোল গোষ্ঠির সাহসিক আবির্ভাব। যে ভাবগ্রন্থি বা বীজকোষ তাঁদের সাহিত্য চর্চার মূলগত প্রেরণা জুগিয়েছে তা হচ্ছে যৌবনের সজীবতা। তারুণ্যমন্ত্র তাঁদের প্রণবমন্ত্র। প্রাজ্ঞতা ও বিজ্ঞতা নয়, স্থিরবুদ্ধির বিবেচনাও নয়, আবেগতাড়িত যৌবন ধর্মের অবিবেচনাই ছিলো তাঁদের পথচলার পাথেয়। তাই বিচার নয়— সদপে' আত্মপ্রকাশে তাঁদের উজ্জীবিত হতে দেখি।*** গল্পেও দেখি, যৌবনের উদ্বেলিত সিন্ধুতীরে দাঁড়িয়ে নতুন লেখকদের

উদয় সূর্যকে বন্দনা করার চেষ্টা। বিভিন্ন লেখক তাঁদের কাহিনীতে যে চরিত্র মিছিল রচনা করেছেন তাঁদের সুখ-দুখ মিলন-বিরহ ভাঙা-গড়ার ইতিবৃত্তের মধ্যে বার্ধক্যের জরাজীর্ণতা নয়, যৌবনের প্রতিষ্ঠাকামিতার বিচিত্র প্রয়াসই লক্ষণীয়।*** মোহিত-লালের বলিষ্ঠ দেহবাদের রিয়ালিজম্ কল্লোলীয় সাধনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। কল্লোলের পৃষ্ঠায় নানা জাতীয় মানুষের ভিড়—ধনী-নির্ধন-মধ্যবিত্ত-জমিদার ব্যবসায়ী, কুলি-মজুর-চাষী, হিন্দু-মুসলমান-খৃস্চান, ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শূদ্র। এরা সকলেই লেখকদের দৃষ্টি অনুযায়ী স্থান পেয়েছে, তবু সব মিলিয়ে দেখলে মনে হয় ধর্ম-বর্ণ-অর্থগত অন্ত্যজেরাই যেন নতুন অর্থ বহন করে সাহিত্যের অঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছে, নবীন লেখকেরা যেন এই প্রথম শোভাযাত্রা করে জনজীবনের বেনামী বন্দরের দিকে চলেছেন। সেদিক থেকে কল্লোলগোষ্ঠির জনচেতনার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক তাৎপর্য আছে। * * * কল্লোলের লেখকরা উনিশশতকী জীবনভাবনাচক্রে আবর্তিত হতে চাননি—আনন্দসন্ধানী বিশ্বাস ও জীবন্মুক্তিবাদের পোষ্টা ছিলেন না। তাঁরা কতকটা বয়সোচিত কৌতূহল নিয়ে, কতকটা তৎকালবিস্তৃত অভিজ্ঞতার উপকরণের দ্বারা তাড়িত হয়ে জীবনের অপর পৃষ্ঠা দেখতে চেয়েছিলেন। সমাজের যে স্তর থেকে তাঁরা এসেছিলেন তা এ যাবৎ অল্প দেখা সেই অপর পৃষ্ঠাকে দেখার বাস্তব দৃষ্টিও জুগিয়েছিলো। ফলে কল্লোলের গল্প-উপন্যাসে দেখি বর্ণগত ও অর্থগত অন্ত্যজ মানুষের আনাগোনা—তাদের দুঃখ-দারিদ্র্য বিকৃতি, ব্যভিচার, জড়ত্ব ও কুসংস্কার এবং বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার মর্মান্তিক ইতিহাস তাতে রচিত হয়েছে। * * * রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবৃত্তে দুঃখের বিচিত্র ঢেউ উঠেছে বটে, কিন্তু পরিণামে দেখা গেছে তিনি পৌঁছে গেছেন সেই সমে যেখানে এসে বলতে পারা যায় 'তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের বন্ধনে'। কিন্তু কল্লোলীয়রা বয়সোচিত জীবনতৃষ্ণা নিয়েও জলের মতো ঘুরে ঘুরে দুঃখের কথাই কইলেন, কারণ তার মধ্যে তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রেতর সুর—নতুন প্রাণের বাণী সঙ্গীত। * * * সাধারণভাবে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রকরণিক ভিত্তিপ্রস্তর জুগিয়ে এবং বিশেষভাবে কোনো কোনো তরুণ কবির স্বকীয় বাণীবন্ধন কর্মের সূত্রপাত করে কল্লোল এক ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েছে। নজরুলের দ্রোহাত্মক প্রভাষণ কিংবা গজল গানের অন্তরঙ্গ ধ্বনি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের গণচেতনার সংহত স্বরায়ণ, বুদ্ধদেব বসুর প্রবৃত্তি বশ্যতার উদ্দাম উচ্চারণ এবং জীবনানন্দ দাশের 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে' নির্জন সংলাপ—এই সমস্তই যৌগিক বিন্যাসে যেমন এক রবীন্দ্রেতর সামগ্রিক স্বরভঙ্গির জন্ম দিয়েছে, তেমনি পৃথক নিহিতার্থে এক একটি বাচনিক বলয় রচনা করেছে। আজ আমরা কবিতার কারুকর্মে প্রেমেন্দ্রীয় বা জীবনানন্দীয় বা বুদ্ধদেবীয় ঢঙ বলতে যা বুঝি তার অবতারণা কল্লোলের কালে এবং পরবর্তী কালে তার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা। সে-কারণে বাংলা কবিতার আধুনিক পর্যায়ে কল্লোল যে প্রকরণিক মাত্রা নির্দেশ করেছে, তার মর্যাদা অনেক'।

● 'কল্লোল'—এর আবেগতপ্ত ফেনা কেটে যাবার পর বিদ্রোহের স্বচ্ছ রূপটি প্রকাশিত হলো, চিন্তিত স্থিতিলাভের প্রচেষ্টা দেখা দিলো। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' ও বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকা বাংলা কবিতার জগতে নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। উভয় পত্রিকায় নবীনতর প্রতিভার আবির্ভাব পরিলক্ষিত হলো। সুধীন্দ্রনাথের সমালোচনা বাংলা কাব্য সাহিত্যের জগতে মননশীল, বুদ্ধিদীপ্ত পরিবেশের সৃষ্টি করলো। নজরুলের চড়াগলার পরে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের হার্দ্য গুণের পর বাংলা কবিতায় সংহতি, বুদ্ধিঘটিত ঘনত্ব, বিষয় ও শব্দ চয়নে ব্রাত্যধর্ম ও গদ্য-পদ্যের মিলন সাধনের সংকেত লক্ষ্য করা গেলো। আধুনিক কবিদের কাছে রবীন্দ্রনাথ আর প্রধানতম সমস্যা না হলেও পারস্পরিক প্রচুর ও দুস্তর পার্থক্যসহ আবির্ভূত হলেন জীবনানন্দ দাশ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী ও বিষ্ণু দে এবং বাংলা কবিতার নাবালক দশার অবসান ঘটলো।

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিরা কিন্তু সকলে একই পথের পথিক নন; তাঁদের মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্য প্রচুর। জীবনানন্দ যদি দৃশ্যবর্ণগন্ধ স্পর্শময় জগতের কবি, তাহলে সুধীন্দ্রনাথ মননপ্রধান অবক্ষয় চেতন কবি; বুদ্ধদেব যদি হন মূর্ত শরীরী প্রেমের কবি তবে বিষ্ণু দে অন্তর্ভেদী যুগ চেতনায় স্বপ্নসুষমার পথ বর্জনে উৎসুকচিত্ত আর অমিয় চক্রবর্তী 'বৈজ্ঞানিক মরমিয়াবাদের' কবি। তাঁর কবিতায় 'একটি আশ্চর্য বৈদেহিকতা ব্যাপ্ত হয়ে আছে, রক্তমাংসের আক্রমণ যেখানে সবচেয়ে কম; ইন্দ্রিয়চেতনার কবি জীবনানন্দের সঙ্গে তাঁর বৈপরীত্য মেরু প্রমাণ, তেমনি সুধীন্দ্রনাথের দ্বন্দ্বরক্তিম মানসও তাঁর সুদূরবর্তী।'

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় অন্যতম কবিব্যক্তিত্ব জীবনানন্দ দাশের কবিতাবলী জীবনের বিচিত্র লীলারহস্য অনুধাবনে ও উপস্থাপনায় জীবনের যন্ত্রণা ও আনন্দ নিয়ে বাংলা কবিতার আসরে উপস্থিত। তাঁর কবিতায় নিসর্গচেতনা, শিল্পচেতনা, ক্লান্তিচেতনা, প্রেমচেতনা, অস্তিত্বচেতনা, ইতিহাস, কালচেতনা সমস্তই জীবনভাবনায় উদ্দীপ্ত। সৃজনশীল কবির সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত ক্রমপ্রসারিত যে দীর্ঘবলয় থাকে, তাতে কবির অভিজ্ঞতা, অনিশ্চয়তা, সংশয়, তীব্র জীবনাসক্তি, সমাজের প্রতি ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতা সমস্তই প্রকাশিত হয়। জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালকে' সমসাময়িক বিপর্যস্ত নগর জীবনের অসহায়তা যেমন প্রকাশিত, তেমনি রবীন্দ্রবলয় থেকে মুক্তির আকাঙ্খাও ধ্বনিত। জীবনের বীভৎস বাস্তবতা তাঁর কাছে 'বাস্তবের রক্ততট'রূপে দেখা দেয়, তবুও আর এক পৃথিবীর অস্পষ্ট কিন্তু উদ্ভাসিত দিগন্ত আভাসিত হয় তাঁর কবিতায়। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার বিশিষ্টতম কবি ব্যক্তিত্ব জীবনানন্দ তাঁর কবিসত্তার অনন্যসাধারণ স্বতন্ত্রতা, সময়চেতনা, ইতিহাসবোধ, ছন্দ ও রূপকল্পচেতনা, ইন্দ্রিয়ঘনময়তা নিয়ে বাংলা কবিতার আসরে অপর এক নতুন ঐতিহ্যের জগৎ রচনা করলেন, যা একালের কবিতার অনিঃশেষ গঙ্গোত্রী।

আধুনিক কবিকুলের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ পৃথক জগতের অধিবাসী। তাঁর জগত জীবনানন্দের অনুভূতির জগত নয়, বা বুদ্ধদেবের রোমান্টিক প্রেমের জগত নয়। অথবা তিনি অমিয় চক্রবর্তীর মতো আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে অবলম্বন করে কবিতা লেখেন না। আত্মহারা সৌন্দর্যের বিলাসিতায় সময় নষ্ট করার অবসর সুধীন্দ্রনাথের নেই। বাংলা কবিতার জগতে তিনি 'রূপকারী বিবেক'। তাঁর জগত চিন্তার জগত। রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ যখন আত্মানুভবের অভাবকে লুকিয়ে রেখে শিথিল তরল বাক্যবন্ধ রচনায় আপন প্রতিভাকে নিযুক্ত করেছেন, সেই সময় সুধীন্দ্রনাথ কাব্যকে দৃঢ়সংবদ্ধ করতে সচেষ্ট হলেন।

আধুনিক বাংলা কবিতার দুটি ধারা—একটি রবীন্দ্রোত্তরণ, আর একটি আত্মব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য রবীন্দ্র-উত্তরাধিকারকে বাহন করা। অমিয় চক্রবর্তী দীর্ঘকাল রবীন্দ্র সান্নিধ্যে থাকায় রবীন্দ্র জীবনদর্শনের পর্যাপ্ত অংশীদার হয়েছিলেন। তবে একথাও ঠিক যে, রবীন্দ্রভাবনার সংস্পর্শে লালিত হলেও অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় দৃষ্টিভঙ্গির অনন্যতা ও প্রকাশ ভঙ্গির প্রকর্ষণ পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। অমিয় চক্রবর্তী সমস্ত প্রতিভাসহ আধুনিক বাংলা কবিতার আবহাওয়াকে পরিস্ফুট করেছেন এবং বাংলা কবিতার স্বতন্ত্র রূপ সৃষ্টি করেছেন। তিনি রবীন্দ্র-সান্নিধ্য নির্ভর হলেও থাকলেও এবং প্রথম দিকের কবিতায় রবীন্দ্রনির্ভরতা থাকলেও তাঁর স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও অনুপস্থিত নয়। তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে মননকল্পনায় ও প্রকাশ ভঙ্গিতে তিনি আত্মনির্ভরশীল ও আত্মস্থ হতে চান বলেই রবীন্দ্রনাথের ধ্যানকল্পনার জগত থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে চান।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার অন্যতম মূলাধার কবি বিষ্ণু দে লোকায়ত চেতনার গভীরতার সঙ্গে কবিতার নান্দনিক রূপকে মেলাতে আজীবন বিশ্বাসী। তিনি বিশ্বাস করেন যে, রাজনৈতিক দর্শনের উপলব্ধি ব্যতীত শিল্প বা জীবনের মুক্তি নেই। বহু-পচনশীলতা, আবেগ, স্মৃতি-বিস্মৃতির রোমান্টিক ভারাতুরতা, অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের দ্বন্দ্ব-জটিলতা অতিক্রম করে এক প্রত্যয়সিদ্ধ দার্শনিকতায় তাঁর কবিতা সমৃদ্ধ। বিষ্ণু দে কালসচেতন কবি। ফ্যাসিষ্ট বিরোধী আন্দোলনের যুগে, বাংলাদেশের পঞ্চাশের মন্বন্তরে, ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও সারা ভারতবর্ষব্যাপী মুক্তি সংগ্রাম, চল্লিশের দশকের উত্তাল ঘটনাসমূহে তাঁর কবিতা স্পন্দিত, বিষ্ণু দে পঁচিশে বৈশাখের প্রণাম জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে উচ্চারণ করেছেন—'তোমার আকাশ দাও, কবি দাও দীর্ঘ আশি বছরের, আমাদের ক্ষয়মান মানসে ছড়াও সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আশি বছরের আলো'। বিষ্ণু দে র কাছে রবান্দ্রনাথ শুধু স্মৃতি বা উপলক্ষ নন, তিনি 'একনিষ্ঠ দীর্ঘায়ুর প্রগতির ছবি।'

জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে প্রমুখ সকলেই রবীন্দ্রনাথকে আত্মীকরণ করতে চেয়েছেন; রবীন্দ্রনাথে মজে যেতে চাননি। তাঁরা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে যেমন রসদ সংগ্রহ করেছিলেন, জীবনের উপকরণরূপে যেমন পেয়েছিলেন আধুনিক

জীবনের সংশয় ক্লান্তি ও বিতৃষ্ণাকে তেমনি রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধসূত্রেও তাঁরা জড়িত। 'বিষ্ণু দে ব্যাজস্তুতির তির্যক উপায়েই সহ্য করে নিলেন রবীন্দ্রনাথকে।' সুধীন্দ্রনাথ অবক্ষয়ী জীবনের বর্ণনায় রাবীন্দ্রিক বাক্য বিন্যাস প্রকাশ্যে ব্যবহার করলেন। এমনকি তাঁর 'তন্বী' কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে অর্পিত হয়েছে ঋণশোধের জন্য নয়; ঋণ স্বীকারের জন্য। আর অমিয় চক্রবর্তী তো রবীন্দ্রজগতের অধিবাসী হয়েও প্রকরণগত বৈচিত্র্যে স্মরণীয় স্রষ্টা। আসলে এই কবির দল রবীন্দ্রনাথের মোহনরূপে ভুলে না থেকে তাঁকে ব্যবহার করলেন। তাঁকে আত্মস্থ করলেন, কাজে লাগালেন, রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'তে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় না ভুলে তাঁর ঐতিহ্যকে বাংলা কবিতার খাতে বইয়ে দিয়ে তাঁর প্রভাবকে সার্থক করলেন বাংলা কবিতার পরবর্তী ধারায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় যখন 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'বধূ' কবিতার 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল' -এর অনুকরণে লেখেন 'গলির মোড়ে বেলা যে পড়ে এলো', আর 'কলসী লয়ে কাঁখে পথ সে বাঁকার' পরিবর্তে লেখেন 'কলসী কাঁখে চলেছি মৃদু চালে'—তখন 'আক্ষরিক অনুকরণেরই উপায়ে কবিতাটি হয়ে যায় একটি 'উৎকৃষ্ট মৌলিক কবিতা।' এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু 'কালের পুতুল' গ্রন্থেও বলেছেন—'এ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের বধূকে ব্যঙ্গ করা হয় নি, তাকে বিশ শতকী জীবন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। বিষয় এক, নামও এক, রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো বাক্যাংশও ব্যবহৃত হয়েছে, তবু— কিংবা সেইজন্যই এটি সত্যিকার মৌলিক রচনা হতে পেয়েছে।'

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বা ঐ গোষ্ঠীর পক্ষে এই জাতীয় কবিতা লেখা সম্ভব ছিলো না। কেননা, তারা না জেনে রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতিধ্বনি করতেন। আর একালের কবিরা জানেন যে, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাছে কতখানি ঋণী। তাই তাঁরা পাঠককে তা জানাতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। রবীন্দ্রনাথের ছত্র আপন কবিতাতে ব্যবহারেও তাঁরা কুণ্ঠিত বা লজ্জিত নন। [যেমন—বিষ্ণু দে-র 'ক্রেসিডা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'র 'ঝড় হয়ে গেছে কাল রজনীতে রজনীগন্ধা বনে' ছত্রটি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে— 'কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে' রূপে ব্যবহৃত হয়েছে]। এই কুণ্ঠাহীনতাই আধুনিক কবিদের আত্মবিশ্বাস ও স্বাবলম্বিতার প্রমাণ। আধুনিক কবিকুলের কবিতা পরবর্তীকালে সমাদরণীয় না হলেও ইতিহাসে এই কারণে তারা অন্তত শ্রদ্ধেয় ও স্মরণীয় হবেন যে, বাংলা কবিতার সংকটের কালে তাঁরা মৌল সত্যের পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন সত্য-শিব-সুন্দরকে গুরুর হাত থেকে তৈরি অবস্থায় পাওয়া যায় না; তাকে অর্জন করতে হয়; জীবনের বিনিময়ে তার সন্ধান করতে হয়। কাব্যকলা উত্তরাধিকার সূত্রে লভ্য নয়, তাকে মেধা ও শ্রমের সাহায্যে অর্জন করতে হয়। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'সূর্বাবর্ত' প্রবন্ধেও প্রায় একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ধ্বনিত হয়—'রবীন্দ্রনাথ হাল বাংলার সিদ্ধিদাতা গণেশ। তিনি তো আমাদের উৎসব অনুষ্ঠানের সূত্রধার বটেই, এমনকি তাঁর বাণী ব্যতিরেকে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যেও লাভ নেই। কারণ, রবীন্দ্রপ্রতিভা মুখ্যত ভাবয়িত্রী হলেও,

কারয়িত্রী পরিকল্পনাতেও তিনি অদ্বিতীয়; এবং শিল্পের সর্ববিধ বিভাগেই তাঁর সাফল্য যেমন বিস্ময়াবহ, তেমনি বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনেও তাঁর দান সুস্পষ্ট। * * * তাঁর চিত্তবৃত্তির অনুকরণ যদিও আজ আর তেমন প্রশংসা পায় না, তবু অনেকের মতে রাবীন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষাই তরুণ সাহিত্যের মূলধন'।

● নজরুল ইসলাম থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত দুটি মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে বাংলা কবিতার রবীন্দ্রাশ্রিত নাবালক দশার অবসান ঘটলেও, কয়েকটি সমস্যা ইতিমধ্যে বাংলা কবিতার রাজ্যে প্রকট হয়েছে। জীবনানন্দীয় কবিতার বৃত্ত বা বিষ্ণু দে বা অন্য কারোর আবর্ত থেকে বাংলা কবিতা নিজেকে বার করতে পারছে না। রবীন্দ্র-নাথকে অনুসরণের ফাঁড়া পূর্ববর্তী কবিরা কাটিয়ে দিলেও একালে আর এক নতুন সমস্যায় পড়েছেন নবাগত কবিরা। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক; কেননা, পুনরাবৃত্তির অভ্যাসেব চাপে পুরাতন খোসা ফেটে গিয়ে নতুন বীজের আবির্ভাব হয়। একালের কবিতার ক্ষেত্রে 'টেক্‌নিক্‌-সর্বস্বতা' একটি দুরন্ত ব্যাধি। বুদ্ধদেব বসু একদা 'টেক্‌নিক্‌সর্বস্বতাকে' সমর্থন করলেও, পরবর্তীকালে করেননি। সেটাকে কবিতার দুর্লক্ষণ বলে মনে করেছেন। 'চোরাবালি' বা 'খসড়া' কাব্য রচনাকালে বিষ্ণু দে বা অমিয় চক্রবর্তী যে জাতীয় প্রকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তা বর্তমানে গ্রহণীয় নয়। অনেকক্ষেত্রে কলাকৌশল যেন মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছে। কলাকৌশলই যে কবিতার একমাত্র মেরুদণ্ড একথা ভাবা অনুচিত। স্বরব্যঞ্জনের চাতুরী দেখবার জন্য কবিতা লেখা হয় না। বক্তব্য যদি মহৎ, মহোচ্চ হয় তবে প্রকরণসর্বস্বতা কবিতার ক্ষেত্রে মুখ্য হবে না। বক্তব্য যত স্বচ্ছন্দ তার প্রকাশও তত অপ্রাকরণিক—কলা-কৌশল বর্জিত। সমস্ত অলংকার বর্জন করে তার যাত্রা। অবশ্য একথার অর্থ এই নয় যে কবিতা হবে প্রকরণ কৌশল বর্জিত। বাংলা কবিতার রাজ্যে প্রাকরণিক প্রবণতা সমালোচককে উক্ত বক্তব্যে পরিবেষণে প্রাণিত করেছে। সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর মনে হয়েছে, বর্তমানে বাংলা কবিতায় স্বাচ্ছন্দ্য সাধনার সময় এসেছে। আর এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আমাদের সহায় হতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের ভক্তিবন্ধন থেকে বাংলা কবিতা বেরিয়ে আসতে পেরেছে বলেই বাংলা কবিতায় পরিণতির চিহ্ন প্রকাশমান। একালের কবি জানেন, 'রবীন্দ্র-ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে / চিরস্থায়ী জটা-জালে জাহ্নবীকে বাঁধি না, বরং / আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, গানে গানে নেমে / সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দিই রেখা আর রঙ। সদাই নূতন চিত্রে গল্পে কাব্যে হাজার ছন্দের / রুদ্ধ উৎসে খুঁজে পাই খরস্রোত নব আনন্দের।' বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ আদিগন্তব্যাপ্ত; তিনি বাংলা ভাষার রক্তে মাংসে মিশে আছেন। তাঁর ঋণ স্বতঃ-সিদ্ধ। শুধু বর্তমান কালেই নয়, যুগে যুগে বাঙালি লেখকেরা তাঁর কাছে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে ঋণী হয়ে থাকবেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে যাবার ফলে সম্মোহনের আশংকাও নেই। একালের কবির কাছে প্রার্থিত রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ আশি বছরের আকাশ। বাঙালির প্রতিদিন যেন গড়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথেরই ছায়ায়—রবীন্দ্রনাথ

আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত জীবনে, অসুস্থ বৈভবে, জীবনের ভাঙা ধসা ভিতে, মরা ক্ষেতে যেন জীবনের স্বাধীন বিন্যাস। তাই কবির ব্যর্থহীন আকাঙ্ক্ষা—'নিভৃত ছায়ায় চৈত্রে শালবনে / তোমার বসন্ত গানে রক্তরাগে হৃদয় স্পন্দনে / আমাদের দিনের পাশড়িতে, জীবনের ফুলে ফলে। ভ্রমরগুঞ্জনে নব পল্লবমর্মরে / গড়ে তুলি আজ কাল, মাসে মাস, শতবর্ষ পরে। আমাদের প্রতিদিন, কবি।' প্রবন্ধের সমাপ্তিতে কবিসমালোচক বুদ্ধদেব বসুকে তাই সিদ্ধান্ত করতে হয়—আদিগন্ত ব্যাপ্ত রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার রক্তে-মাংসে মিশে আছেন বলে তাঁকে বাদ দিয়ে আমাদের জীবন অভাবনীয়। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহার্যতা, উপযোগিতা এতই বিস্তৃত এবং ক্রমবিস্তার্যমান, রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রতিভার উপর ভিত্তি করে আগামীকালের বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভক্তিতে নিবিষ্ট হয়ে নয়। রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহারের মাধ্যমে, আত্মীকরণের দ্বারা, রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের যথার্থ রূপায়ণের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত মুক্তি হবে। রবীন্দ্রনাথ হলেন সেই লোকোত্তর কৃষক—'কোনো এক লোকোত্তর কৃষকের কথা কোনো এক কবিতায় আমরা পড়েছি। তার অর্থ নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়েছে, কিন্তু আজ দেখছি সে কবিতা উল্টো অর্থে সত্য হলো। যার হাতে ফসল ফললো তাকে নিয়েই সোনার তরী দিগন্তপারে চলে গেলো, পড়ে থাকলো তার রাশি রাশি ধান, সোনার ধান, যতদূর দৃষ্টি যায় যেন শেষ নেই। এখন আমাদের উপর ভার পড়েছে সেই ফসল ঘরে তোলার। বাছতে হবে, গোছাতে হবে, সাজাতে হবে গোলাঘরে থরে থরে। ডেকে বলতে হবে সকলকে এসো, এখানে এসো, এখানে তোমার পুষ্টি, স্বাস্থ্য, কল্যাণ। এখানে তোমার উত্তরপুরুষের আনন্দের সঞ্চয়।'

● কবি সমালোচনা বুদ্ধদেব বসু আধুনিক কবি ও কবিতা বিষয়ক যে সমস্ত প্রবন্ধ রচনা করেছেন তার মধ্যে 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধটি অন্যতম। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর আধুনিক কবিতা সম্পর্কিত বক্তব্য বিশ্লেষণী প্রতিভার পরিচয় দান করে। সমালোচ্য প্রবন্ধটি সম্পর্কে হীরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'শিল্পিত স্ববিরোধ : প্রবন্ধের শিল্পী' [দ্রঃ বুদ্ধদেব বসু, মননে অন্বেষণে : তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত] প্রবন্ধে অত্যন্ত উল্লেখ্যযোগ্যভাবেই বলেছেন—'রবীন্দ্রযুগের যেসব 'মাইনর কবিদের ব্যর্থতা আমরা মনে করি তাঁদের রবীন্দ্র-অনুকরণের মধ্যেই নিহিত' তাঁদের সম্বন্ধে একটি নতুন ও অত্যন্ত সত্য কথা বলেছেন বুদ্ধদেব। তিনি মনে করেন, রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করতে না পারার জন্যই তাঁদের ব্যর্থ হতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই হল তাঁর সৃষ্টির জঙ্গম প্রকৃতি। কোন একটি জায়গায় তিনি স্থির হয়ে থাকতে পারেন না বলেই বিশেষ কোন পর্বের সাহিত্য সাধনায় তাঁকে আবিষ্কার করা যাবে না। অথচ সমকালে তাঁর দীপ্তি এতই প্রবল ছিল ছিল যে সেদিকে আকৃষ্ট না হওয়াও ছিল প্রায় অসম্ভব। তারি সুন্দর করে তিনি বলেছেন, 'তাঁদের পক্ষে অনিবার্য ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ এবং অসম্ভব ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ। ...জন্ম নিলো এই মনোরম মতিভ্রম

যে ঝিনিঝিনি ছন্দ বাজালেই রাবীন্দ্রিক স্পন্দন জাগে, আর জলের মতো তরল হলেই স্রোতস্বিনীর গতি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ব্রত নিলেন তাঁরা, কিন্তু তাঁকে ধ্যান করলেন না।' এই কথার মধ্যে প্রায় সব কথাই বলা হয়ে গিয়েছে বলে আমাদের মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রসাধনকলা তাঁদের আকৃষ্ট করেছিল, তাঁর অর্জিত সাম্রাজ্যে অনায়াসে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন সমকালীন কবিরা। পুনরার্জনে তাকে স্বকীয় করে তুলতে পারেন নি। অন্যদিকে যাঁদের আমরা রবীন্দ্র-বিরোধী বলে চিহ্নিত করে থাকি, রবীন্দ্রনাথকে অর্জন করতে চেয়েছেন তাঁরাই বেশি। তিনি বলেছেন, 'লক্ষ্য করতে হবে, এই আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন সেই সব তরুণ লেখক, যাঁরা সবচেয়ে বেশি রবীন্দ্রনামে আপ্লুত।' রবীন্দ্রনাথকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেই প্রতিরোধের শক্তি তাঁরা পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে বুঝবার পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের ঐশ্বর্য মিথ্যা হয়ে যায়, যদি রবীন্দ্রেতর হবার মতো প্রেরণা পরবর্তীকালে না জন্মায়—একথা তরুণ লেখকসমাজ বুঝতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভগ্নাংশ হওয়া নয়, রবীন্দ্রেতর হওয়ার এই সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করাতেই আধুনিক কাব্য আন্দোলন গঠিত হওয়ার সুযোগ ঘটেছে। প্রাথমিকভাবে স্রোতের টানে যে বেশ কিছু জঞ্জাল ভেসে এসেছে, সেকথা বুদ্ধদেব স্বীকার করেন। কিন্তু একটি মৌলিক সত্য এঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন—'কাব্যকলাও উত্তরাধিকার সূত্রে লভ্য নয়, আপন শ্রমে উপার্জনীয়।' রবীন্দ্রনাথের দান এবং তাঁর কাছে আমাদের ঋণ কতখানি, সেকথা জানা ছিল বলেই তরুণ কবিসমাজ তা থেকে উত্তরণের পথ সন্ধান করতে পেরেছিলেন এবং যেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রশংসাযোগ্য সেখানে তার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানাতেও কুণ্ঠিত হননি।

আধুনিক কাব্যসৃষ্টির যাঁরা প্রধান উদ্গাতা, তাঁদের অনেকের কাব্যকৃতির পরিচয় দিয়েছেন বুদ্ধদেব—সেটা তার আবশ্যিক কর্তব্যের মধ্যেও ছিল। পরবর্তী কবিদের কথাও বলেছেন। কাব্যিক দায়িত্ব পালনের জন্য কিছু প্রিয় ভাষণ করতে হয়, সর্বদা সত্য নয় জেনেও। সেই জাতীয় ভাষণ এঁর মধ্যে একেবারেই নেই, এমন কথা বলা যাবে না। অনেক সময় বিশেষ কবির ক্ষেত্রে তাঁর মন্তব্য সূত্রের মতো সংক্ষিপ্তও হয়ে পড়েছে—কিন্তু মোটের উপর তিনি আধুনিক কবিদের মানসিকতা স্পষ্টভাবেই উন্মোচন করেছেন। সমালোচক হিসাবে তাঁর ক্ষমতা ও অন্তর্দৃষ্টির কথা আমাদের স্বীকার করতে হবে, যখন আমরা মনে করব জীবনানন্দ দাশের আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা তাঁর নিরলস পরিশ্রমেই সম্ভব হয়েছিল। সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র যথোচিত প্রশংসা করেও উত্তরদানে তাঁদের সৃষ্টির সীমা সম্বন্ধেও তিনি অবহিত করে দিয়েছেন—অন্তত শেষোক্ত কবির। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের আধুনিক কবি, এমনকি তাঁর সময়ের সাম্প্রতিক কবিদের আলোচনাও তিনি করেছেন। এর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিস্তারিত পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই, কারণ

এই সব রচনা আমাদের অপরিচিত নয় এবং বিতর্কিতও নয়। শুধু ভাল লাগে এই জন্যে যে, তিনি চরম সত্য কথাটি গোপন করার চেষ্টা করেননি, নিঃসঙ্কোচে মন্তব্য করেছেন—'রবীন্দ্রনাথের উপযোগিতা, ব্যবহার্যতা ক্রমশই বিস্তৃত হ'য়ে, বিচিত্র হ'য়ে প্রকাশ পাবে বাংলা সাহিত্যে। তাঁরই ভিত্তির উপর বেড়ে উঠতে হবে আগামীকালের বাঙালি কবিকে, বাংলা কবিতার বিবর্তনের পরবর্তী ধাপেরও ইঙ্গিত আছে এইখানে।"